# হিন্দুর শত্রু হিন্দু

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

# হিন্দুর শত্রু হিন্দু

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

প্রকাশক ঃ প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
পি-৪৭, এল. আই. সি. টাউনসিপ
পো ঃ মধ্যমগ্রাম (পিন-৭৪৩২৭৫)
জিলা ঃ উঃ চব্বিশ পরগনা

**"Hindur Satru Hindu"**

*By*

Priya Ranjan Kundu

প্রথম প্রকাশ ঃ ১১ই শ্রাবন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
(28th July, 1999)



মুদ্রাকর ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

মূল্য ঃ ৬০·০০

# উৎসর্গ

যিনি আমার কৈশোরে
দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন
এবং
অন্যায়ের বিরুদ্ধে
মেরুদণ্ড সোজা রেখে
প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন,
সেই সর্বত্যাগী সন্যাসী
বিপ্লবী জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদারের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
এই পুস্তকটি
নিবেদন করলাম।

—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

# কোন্ পৃষ্ঠায় কি আছে

| বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|

## প্রথম অধ্যায়



## দ্বিতীয় অধ্যায়

## তৃতীয় অধ্যায়



## চতুর্থ অধ্যায়

# আপনি কি জানেন?

☞ বিগত পঞ্চাশ (৫০) বছর ধরে খণ্ডিত ভারতবর্ষকে আবার খণ্ড খণ্ড করার ষড়যন্ত্র চলছে এবং তাতে মদত জোগাচ্ছে ভারতেরই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক এবং বিদেশী অর্থে পুষ্ট একশ্রেণীর সংবাদপত্র!

☞ সেকুলারবাদের (Secularism) নামে হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতাকে ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে এক শ্রেণীর হিন্দুরই পৃষ্ঠপোষকতায়!

☞ জাতপাতকে উস্কে দিয়ে আগামী দশ বছরের মধ্যেই হিন্দুস্থানের হিন্দুদের শতধা বিভক্তের ষড়যন্ত্র চল্‌ছে যাতে তারা কোনদিন আর সংঘবদ্ধ হতে না পারে!

☞ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই হিন্দুস্থানের মাটি থেকে হিন্দুর অস্তিত্ব চিরদিনের মতো লোপ পেতে বসেছে!

☞ তখন বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গুরুগ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক প্রভৃতি পড়তে এবং জানতে আপনাকে যেতে হবে লণ্ডন, বার্লিন, মস্কো, ওয়াসিংটন, টোকিও কিংবা বেইজিং-এ!

## না। আপনি জানেন না!

## যদি জানতেন, তবে

☞ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে অখণ্ড হিন্দুস্থানকে খণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে দেশদ্রোহীতার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এবং

☞ বিগত পঞ্চাশ (৫০) বছর ধরে হিন্দুর কৃষ্টি-সভ্যতা এবং তাদের ধনপ্রাণ ধ্বংস করার জন্যে যে গভীর ষড়যন্ত্র চল্‌ছে (ঘরে এবং বাইরে), তার বিরুদ্ধে

## সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতেন!

☞ এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। সময় থাকতে এখনই প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে পরে নিঃসন্দেহে পস্তাতে হবে!

# পুস্তকটির শিরনাম "হিন্দুর শত্রু হিন্দু" কেন দিলাম?

১। হিন্দু হয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দুরা যদি মুসলমান লুণ্ঠনকারীদের সাথে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হতো এবং তাদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য না করতো তবে কখনই তাদের পক্ষে এই দেশের মাটিতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না।

২। ঠিক একইভাবে নেতাজী-নির্দেশিত পথে, ১৯৪৫ সালে হিন্দুস্থানের সামরিক এবং অসমারিক জনতা যখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন যদি দেশের হিন্দু নেতৃত্ব তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সেই বিদ্রোহকে বিপথগামী না করতেন তবে কখনই শাসকগোষ্ঠীর যড়যন্ত্র সফল হতো না।

৩। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানকে খণ্ড খণ্ড করে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা উঠলো, তখন যদি একই হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজের দেশ-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত না হতেন তবে দেশও ভাগ হতো না, ভারতবর্ষকে অখণ্ড রেখেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো। (এব্যাপারে পুস্তকের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না)।

৪। অতঃপর, ঐ সনেরই ১৫ই আগষ্ট হিন্দুস্থান বিভক্ত হলো। তাদের এক অংশের নাম হলো পাকিস্তান ও অপর অংশের নাম হলো "ইণ্ডিয়া দেট্ ইজ ভারত" (India i.e. Bharat) —ভারতবর্ষ কিংবা হিন্দুস্থান নয়। ইণ্ডিয়া দেট্ ইজ ভারতের অধীশ্বর হলেন হিন্দু, আর পাকিস্তানের অধীশ্বর হলেন মুসলমান।

৫। এবং সেই দিন থেকে ভারতের শাসকগোষ্ঠী হিন্দু হয়েও, একমাত্র মুসলিম ও খৃষ্টান ভোটব্যাংককে সুনিশ্চিত করার জন্যে, একদিকে খণ্ডিত ভারতভূমি থেকে হিন্দুর ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং ক্রমান্বয়ে মুছে ফেলার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন, অপরদিকে মুসলমান ও খৃষ্টানদের সর্বদিক দিয়ে শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়ে চল্লেন। ফলশ্রুতি এই দাঁড়ালো ঃ মুসলমান ও খৃষ্টান শাসককুল তাদের সম্মিলিত হাজার বছরের রাজত্বে হিন্দুদের আত্মীকভাবে যতো না ক্ষতিসাধন করতে পেরেছে খণ্ডিত ভারতবর্ষের হিন্দু শাসককুল তাদের মাত্র পঞ্চাশ (৫০) বছরের রাজত্বকালে তার চেয়ে বহুগুণ ক্ষতি করেছে এবং অদ্যাবধি করে চলেছে।

# প্রারম্ভিক কিছু কথা

আজ আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। যে-কোন মুহূর্তে আমার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হতে পারে। তার জন্যে আমি সদা প্রস্তুত। তবে যাবার আগে দেশবাসীর কাছে, দেশ ও জাতির প্রতি যারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তাদের বংশধরেরা বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে, কিছু কথা বলে যেতে চাই। যে-অর্থে ঐতিহাসিক বলা হয় সে-অর্থে আমি কোনভাবেই তার যোগ্য নই। তবু-ও যেহেতু ১৯৩৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক ঘটনারই সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছি, পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা হয়ে আজ-ও মুছে যাইনি, এবং একসময় গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে প্রতারিত হয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামে সামিল হতে পারিনি তাই স্বদেশের মাটি থেকে চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে, যে-সব কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি বা বলার সাহস পায়নি তার কিছু কথা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে লিপিবদ্ধ করে যাবো। সে-সব কথার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তার বিচারের ভার ভাবীকালের সৎ এবং নির্ভীক ঐতিহাসিকদের উপরই ছেড়ে দিলাম। সাথে সাথে তাঁদের কাছে আরও একটি আবেদন রেখে যাবো, তাঁরা যেন দয়া করে নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজী ও নেহেরুজীর ভূমিকা, বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব-বাদের ইতিহাস এবং নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। দেশভাগ হবার পরও বর্তমান ভারতে বসবাসকারী মুসলমান ও খৃষ্টানদের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড মোটেই সুস্থ নয়। তাই এই পুস্তকের একাধিক স্থানে এদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু কঠোর মন্তব্য করতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। তবে পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে এবং আজও যে-সব মুসলমান ভারতভূমিকে নিজেদের দেশ বলে মনে করেন এবং ভারতের সব মানুষকেই আপনজন বলে জানেন বা গণ্য করেন, তাদের নিকট আমার আবেদন, তাঁরা যেন দয়া করে বিভেদপন্থী মুসলমানদের সাথে নিজেদের সামিল না করেন। তাঁদের প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, যেমন শ্রদ্ধাশীল অন্যান্য ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি।

প্রথমে মুসলমানদের কথাই ধরা যাক। দেশ-বিভাগের পূর্বে তাদের দাবী ছিল, "যেহেতু তাদের ধর্মে অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব করা কিংবা সহাবস্থানের কোন বিধান নেই, তাই তাদের জন্যে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সেই রাষ্ট্র গঠিত হবে ভারতের যে-সব প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ

সে-সব প্রদেশ নিয়ে এবং তার নাম হবে পাকিস্তান।" ভাল কথা। তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠী ইংরেজের পক্ষপাতিত্বের ফলে মুসলমানরা যখন তাদের ঈপ্সিত পাকিস্তান পেলেন, তখন যুক্তি ও নৈতিকতার বিচারে, খণ্ডিত ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের এদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যাওয়া এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী অমুসলমানদের এদেশে চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হলো না। কেন হলো না, সে-আলোচনা এ-পুস্তকের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বাস্তবে দেখা গেলো, মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমি পাকিস্তান থেকে অমুলসমানদের বিতারিত করলো, কিংবা জোরপূর্বক ইসলামের উপাসনাপদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য করলো; পক্ষান্তরে, খণ্ডিত ভারতবর্য থেকে খুব কম সংখ্যক মুসলমানই পাকিস্তানে গেলো। আর ভারতবর্ষের হিন্দুদের তরফ থেকে একটি মুসলমানকেও দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হলো না। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ দেশভাগের পূর্বে যে-সব মুসলমান অমুসলমানদের সাথে সহাবস্থানে রাজি ছিলেন না বর্তমানে তারা অমুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সাথে সহাবস্থান করছেন কী করে এবং কোন্ যুক্তি বলে? এখন তাদের ধর্মীয় বাধানিষেধ কোথায় গেলো? প্রত্যুৎ, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্বের ফলে বিগত ৫০ বৎসর ধরে তারা শুধু বহাল তবিয়তেই খণ্ডিত ভারতে বসবাস করছেন না, সরকারী মদত ও অর্থানুকুল্যে তাদের উপাসনা-পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারণের কাজ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন এবং দেশের পরিবার পরিকল্পনায় নিজেদের সামিল না করে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে চলেছেন। শুধু তাই নয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সামনে রেখে, দেশের বিভীষণদের সহায়তায়, বিদেশীদের বিশেষ করে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার পুরো চলচিত্রটাই পাল্টিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য ঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই খণ্ডিত ভারতবর্ষকে আবার খণ্ড খণ্ড করে ক্রমান্বয়ে বহু অঘোষিত পাকিস্তান সৃষ্টি করবেন এবং অনতিবিলম্বেই এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত দেশটাকেই দার-উল ইসলামে (Islamic State) পরিণত করবেন।

এবার আসা যাক খৃষ্টানদের কথায়। মুসলমান এবং খৃষ্টানরা যখনই যে-দেশ অধিকার করেছে সে-দেশেই তারা সাথে করে নিয়ে গেছে উপাসনা-পদ্ধতির ধর্মযাজকদের, স্থানীয় অধিবাসীদের স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার জন্যে। তাই ইংরেজরা যখন ভারতে তাদের শাসন বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, তখন তার সাথে সাথে খৃষ্টান যাজকরাও দেশের অধিবাসীদের খৃষ্টীয় উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারত থেকে যখন ইংরেজরা চলে যায় তখন এদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা যতো ছিল বিগত ৫০ বৎসরে তার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে বহুগুণ। এ অবস্থা সম্ভব হয়েছে একমাত্র দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষকতায়। মুসলমানদের ভোটব্যাংক নিশ্চিত করার জন্যে যেমন তাদেরকে নানা প্রকার বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তদ্রুপ খৃষ্টানদের ভোটব্যাংক নিশ্চিত করার জন্যে তাদেরকেও অবাধে খৃষ্টান উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার কাজে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, আসাম ও ত্রিপুরা বাদে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে যে ক'টি রাজ্য আছে তাদের সব ক'টিই খৃষ্টান অধ্যুষিত, এমন কি কোন কোন রাজ্যে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। একদিন মুসলমানরা যেমন ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হিন্দু নেতৃত্বের অপদার্থতার সুযোগে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছিল তদ্রুপ কেথোলিক চার্চের সক্রিয় মদতে এবং হিন্দু শাসক-গোষ্ঠীর ক্লীবতার সুযোগ নিয়ে সর্বাগ্রে নাগাল্যাণ্ডের প্রতিবাদী গোষ্ঠী নিজেদের একটি ভিন্ন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহ করেছে এবং দিল্লীর সাথে বর্তমানে Cease Fire অবস্থা চলছে। এবং শেষ পর্যন্ত নাগাল্যাণ্ডের ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের বাইরের কোন সহর বা নগরে, ভারতের রাজধানী দিল্লীতে নয়; কারণ, দিল্লী তাদের প্রতিপক্ষ। অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আশা করি, পাঠক মহোদয় তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

একদিকে খণ্ডিত ভারতকে পুনরায় খণ্ড খণ্ড করার মুসলমানদের নিখুঁত পরিকল্পনা, অপরদিকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদ যেভাবে দিনের পর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রশ্ন ঃ নতুন দিল্লী এ-অবস্থা আর কতোদিন সহ্য করবে? আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন রাখবো ঃ নতুন দিল্লী কি আজ নতুন দিল্লীতে আছে, না ইতিমধ্যেই বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে? এ-সব প্রশ্নের যদি উত্তর পেতে চান, তবে সবার আগে দেশদ্রোহীদের এবং বিদেশী দালালদের চিহ্নিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিন। ঘরে শত্রু রেখে বাইরের শত্রুর সাথে মোকাবিলা করা যায় না, যাবে না। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না করলে, ভারতবর্ষ নামক ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশটি অনতিবিলম্বেই বিলুপ্তির গহ্বরে ডুবে যাবে এবং ঐ একই ইতিহাসের পাতায় কালো অক্ষরে লেখা থাকবে ঃ হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এক ভূখণ্ড ছিল। তার নাম আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষ এবং সেখানে যারা বাস করতো তারা হিন্দু নামে পরিচিত ছিল।

এগারো শ্রাবণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
মধ্যমগ্রাম (২৮.৭.৯৯ ইং) —গ্রন্থকার

# গান্ধীজী ও নেহেরুজী ঃ ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে দুই নষ্টচন্দ্র

কালের এক আবর্তে (১৭৫৭ খৃঃ) পলাশীর প্রান্তরে নবাবী সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হলো; অন্য এক আবর্তে (১৯৪৭ খৃঃ) নতুন দিল্লীর বড়লাট ভবনে কুচক্রীদের চক্রান্তে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তাদের হৃতরাজ্য ফিরে পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। একদিন হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানরা ভারতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, আর একদিন মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হলো। আবার কালচক্রের আবর্তে যখন ভারতের হিন্দুরা তাদের দেশ পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেলো, তখন হিন্দুরই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সে সুযোগ হাতের বাইরে চলে গেলো। একেই বলে, অদৃষ্টের পরিহাস! তাই তথাকথিত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর পরেও যদি দেশ এগিয়ে না গিয়ে বিলুপ্তির পথে চলতে থাকে তবে তার জন্যে অপরকে দায়ী করে কোন লাভ নেই! এতে আত্মপ্রবঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণাকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে। "হিন্দুই যে হিন্দুর প্রধান শত্রু" তার প্রমান দিতে হিন্দুকে আর কত মূল্য দিতে হবে?

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অগণিত নরনারী সামিল হয়েছিলেন এবং সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেছেন। আর অসংখ্য বিপ্লবী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন দেশমাতৃকার বেদীমূলে। এই বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দুটি নষ্টচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। এদের একজন হলেন স্বর্গীয় মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী ও অপরজন হলেন স্বর্গীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। প্রথমজন প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন একজন অহিংসার অবতার হিসেবে। তাই তিনি একসঙ্গে সবাইকে খুশী করতে চেয়েছিলেন, যেমন (১) বৃটিশের মন পরিবর্তন, (২) মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক দাবীদাওয়াকে সমর্থন করে তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সামিল করা এবং (৩) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে অহিংসপথে জনগনকে প্রস্তুত করা। কিন্তু কার্যতঃ তিনি এর কোনটিতেই সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। শুধু সাফল্য অর্জন করতে পারেননি তাই নয়, তাঁর এই বহুমুখী প্রচেষ্টা দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা দুরের কথা, তাঁর প্রতি পদক্ষেপ দেশের বিপদ ডেকে এনেছে। তবে তিনি একটি কাজ অতি কৌশলে সম্পাদন করেছিলেন। সেটি হলো ছল এবং চাতুরীর দ্বারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এবং সবাইকে

বুরবক্ বানিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগঠনের সর্বেসর্বা ছিলেন। ১৯২০ সালে মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু গান্ধীজীর কংগ্রেস দখলের কাজটি আরও মসৃণ ও ত্বারান্বিত করেছিল। তিলকের মৃত্যুর পর দেশবন্ধু ও মতিলাল ব্যতীত (১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ১৯৩১ সালে মতিলাল নেহেরুর মৃত্যু ঘটে) সক্রিয়ভাবে বাধা দেবার মত কেউ ছিলেন না। এক এক করে কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবৃন্দকেই তাঁর পাতা জালে আবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পারেননি শুধু একজনকে তাঁর জালে ফেলতে কিংবা বশে আনতে—তিনি দেশগৌরব (পরবর্তীকালে নেতাজী) সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধীজীর আসল চরিত্র ধরতে পেরে সুভাষচন্দ্র তাঁর পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন পোষাকী আন্তর্জাতিক ব্যক্তি (fashionable internationalist)–মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, আচার-আচরণে পুরোদস্তুর ইংরেজীয়ানা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জুয়া। ক্রমান্বয়ে আমরা এঁদের জীবনের বিশেষ কয়েকটি অধ্যায় তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

## স্বর্গীয় মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী

প্রথমে আমরা গান্ধীমহারাজকে নিয়ে কিছু কথা বলবো, পরে তদীয় শিষ্য এবং সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নেহেরুজীকে নিয়ে। তার-ও পূর্বে আমাদের একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহীরা তাদের নানাপ্রকার অভাব-অবিযোগের সুরাহা না হওয়ার কারণে বিদ্রোহ করে। অনেকে আবার এই অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেও অভিহিত করেন। আমরা সে-বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি, সেই বিদ্রোহ বা সংগ্রাম যে নামেই অভিহিত করি না কেন, ইংরেজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরূপ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য তারা একটা পথ খুঁজছিলেন। পথ খুঁজতে যেয়ে তারা যখন ২৭ বছর কাটিয়ে দিলেন ঠিক সেই সময় অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ সচিব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব দেন ভারতীয় প্রজাদের মধ্য থেকে অনুগত কিছু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে তোলা হোক যার মাধ্যমে দেশের সবাই তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবে এবং ঘটনা বা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে। তিনি কর্তৃপক্ষকে আরও জানালেন, এরূপ একটি সংস্থা গড়ে তুললে দেশের কোথায় কখন কী হচ্ছে তা তারা জানতে পারবেন, হটাৎ করে তাদেরকে কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ মিঃ হিউমের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং তাঁকে এগিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। মিঃ হিউম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর

বোম্বেতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামে একটি সংস্থার গোড়াপত্তন করলেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠন তো তৈরী হলো। এখন এর পরিচালনায় কে বা কারা থাকবেন? উত্তরে বলা চলে, বাহ্যত এর পরিচালনায় থাকবেন ভারতের কিছু সিভিলীয়ান (civilian) এবং নামীদামী কিছু লোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূর থেকে পরিচালনায় (Remote Control) থাকবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ পর্যন্ত এই সংগঠন শাসক এবং শাসিতের মধ্যে এক প্রকার যোগসূত্ররূপে কাজ করছিল এবং মোটামুটিভাবে বলা চলে, এর কাজকর্ম আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রতিবাদে শুধু বঙ্গদেশই নয় সমস্ত ভারতবর্ষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই প্রতিবাদের হাওয়া কংগ্রেসের গায়েও এসে লাগে। যারা বঙ্গভঙ্গের সক্রিয় প্রতিবাদ করতে চাইলেন তারা চরমপন্থী এবং যারা শুধুমাত্র প্রস্তাব নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চাইলেন তারা নরমপন্থী নামে পরিচিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে এ-সময় থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি মতবাদের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। চরমপন্থীদের নেতৃত্বে ছিলেন বোম্বের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি আরও একটি শক্তি আত্মপ্রকাশ করলো যার নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার পি. মিত্র ও অরবিন্দ ঘোষ। এই শক্তিই ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের সূচনা করে যার প্রথম বলি হলেন ক্ষুদিরাম বসু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। এই যখন দেশের অবস্থা অর্থাৎ একদিকে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের উত্থান এবং নরমপন্থীদের পতন, অপরদিকে বিপ্লববাদের আত্মপ্রকাশ, তখন রাজশক্তি প্রমাদ গনলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। তখন তারা কংগ্রেসের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান করছিলেন। ঠিক সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের মহড়া শেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারতবর্ষে ফিরে এলেন এবং দেশে ফিরে কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং তাকে ঢেলে সাজাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক কর্মকুশলতার দ্বারা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে নিজেকেও অন্যতম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন, অহিংসার পথেই তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করবেন, অর্থাৎ দেশকে মুক্ত করার জন্যে কখনই হিংসার আশ্রয় নেবেন না। এসব কিছু দেখে ভারতের তদানিন্তন রাজশক্তি গান্ধীজীর মধ্যে তাদের ঈপ্সিত লোকের সন্ধান পেলেন এবং তাঁকে তুলে ধরবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু অত সহজে নয়। গান্ধীজীকে প্রমান দিতে হয়েছিল, সে সত্যিকারেরই অহিংসায় বিশ্বাসী, হিংসায় তিনি বিশ্বাস করেন না।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন সত্য ও অহিংসার আর একজন অবতার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে, কোনক্রমেই ব্রিটিশ সিংহকে ক্ষেপিয়ে নয়। এতে যদি ভারতবাসীর কিছু উপকার হয় ভাল, নতুবা তাঁর কিছু করার নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আশা-আকাংখাকে কোনক্রমেই জলাঞ্জলী দেবেন না। এর জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে তাঁর মনে হয়নি। তাই ভারতে এসে কংগ্রেস নামক নড়বড়ে একটি সংগঠনকে কুক্ষিগত করে তার সর্বময় কর্তা হওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে তিনি একে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্যে তাঁকে যথেষ্ট খরকুটো পোড়াতে হয়েছিল, সন্দেহ নেই। পরোক্ষভাবে রাজশক্তিও যে গান্ধীজীর কার্যকলাপের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলো তা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। এই মণিকাঞ্চন-যোগ কি নেহাৎই কাকতালীয় ঘটনা, না এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে তা আবিস্কার বা খুঁজে দেখার দায়িত্ব একমাত্র নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরাই নিতে পারেন। তবে একটি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতে আসার পর গান্ধীজী তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে যে সব কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার কোনটির সাথেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের কোন সম্পর্ক ছিল না।

## প্রথম অধ্যায় (১৯১৬-১৯২২)

(১) গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেই সময় ভারতবাসীর তরফ থেকে এই যুদ্ধে ইংরেজ শক্তিকে রসদ এবং সৈন্য দিয়ে সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে গান্ধীজী ইংরেজকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। এখানে আমার দু'টি প্রশ্ন আছে ঃ (ক) যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে শেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, কেন এবং কোন্ যুক্তিতে তিনি ভারতে এসে একই শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তিকে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিলেন? (খ) অহিংসার পূজারী হয়ে তিনি যে-ভাবে ইংরেজদের সৈন্য সংগ্রহে মদত দিয়েছিলেন (যে সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই হিংসার আশ্রয় নিয়ে অপর পক্ষের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে) তাতে কি আর তাঁকে অহিংসার পূজারী বলা যায়?

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের খলিফা তার খলিফাগিরি হারায়। এর পুনরুদ্ধারের জন্যে ভারতের মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। এর সাথে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনকে কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করলেন।

মুখে ছিল হিন্দু-মুসলিম একতা ও সহমর্মিতার বুলি, উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানের সমর্থনে কংগ্রেসের মধ্যে নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা। এখানে উল্লেখ্য, এই খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন এবং কংগ্রেসকে এর সঙ্গে যুক্ত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন মহম্মদ আলী জিন্না। এ প্রসঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (যাঁর নামে কলিকাতার একটি পার্কের নামকরণ হয়েছে।) গান্ধীজীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। অচিরেই এই আন্দোলন পথভ্রষ্ট ও পর্যুদস্ত হলো। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো কেরালায়, মুসলমানদের হিন্দু-নিধনের মধ্য দিয়ে। এবং পরবর্তী কালে এই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন মুসলমানদের হাতে নিহত হলেন তখন কিন্তু গান্ধীজী এর প্রতিবাদে কোন কিছু বললেন না বা করলেন না। এই খিলাফৎ সম্বন্ধে বিশ্বের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তুলে দিলাম। মিঃ পোল্যাক লেখেন, "If Mohammad Ali's interpretation of Islam is correct....Islam is a World-danger to be fought remorselessly by all other peoples." এন্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, "I am out against empires altogether, and to agree to the Khilafat demand (for an Ottoman empire) would surely cut the ground under the Indian demand for independence." রোঁলার ডায়েরীতে পাই, রবীন্দ্রনাথের মতে "Gandhi was not working...for the unity of India but for the pride and force of Islam." (স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী পৃঃ ১১৬)।

(৩) রাউলাট সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার। রাউলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালীয়ানওয়ালাবাগে যে সভা হয় তাকে ছত্রভঙ্গ করতে ইংরেজের রাজশক্তি নৃশংসভাবে গুলি চালায়। তাতে এক হাজারের উপর লোক নিহত হয় এবং আহত হয় আরও কয়েক হাজার লোক। হিংসার কারণে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করেন ১৮ই এপ্রিল।

(৪) তখন দেশে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন চলছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে। সেই সময় গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরায় আন্দোলনের নেতা ভগবান আহিরকে থানার পুলিশ বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে এবং থানার সম্মুখে সমবেত জনতার উপর পুলিশ গুলিচালনা করে। তারই বদলা স্বরূপ উপস্থিত সত্যাগ্রহীরা উক্ত থানার কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। যেহেতু চৌরীচৌরার সত্যাগ্রহীরা পুলিশী অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ সহ্য করলো না, পরন্তু প্রতিশোধ স্বরূপ তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল তাই গান্ধীজী অনতিবিলম্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সত্যাগ্রহ চলছিল তা প্রত্যাহার করে নিলেন। সময়টা ছিল ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয় লিখছেন, "১৯২২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটি গনসত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মধারা, এক কোটি

সদস্য সংগ্রহ, জাতীয় বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা ও মাদকবর্জন প্রভৃতি গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহন করলো। অর্থাৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্দোলনের উপর যবনিকা নেমে এলো। বিমূঢ় জওহরলালকে গান্ধীজী লিখলেন, "The cause will prosper by this retreat. The movement had unconsciously drifted from the right path. We have come back to our moorings." (ঐ পৃঃ ১১১-১২)।

(৫) এই অধ্যায়েই গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দেন, আর কংগ্রেসের নেতৃত্বও তা বিশ্বাস করলেন। এতোবড় ভাওতা তারা কী করে বিশ্বাস করলেন তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

## দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯২৮-১৯৩২)

(১) ১৯২৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে কংগ্রেসের সভাপতি করলেন গান্ধীজী। অধিবেশন বসলো লাহোরে এবং এই লাহোর কংগ্রেসেই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে-ও এই প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু যেহেতু সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব এনেছিলেন তাই গান্ধীজী তা পাশ করার পক্ষে মত দেননি। তবে পরের বছরেই নেহেরুকে খুশী করা এবং তার ভাবমূর্তি তুলে ধরবার জন্যে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। তবে সাথে সাথে 'রাজকে' খুশী করতেও তিনি ভোলেননি। ঐ একই অধিবেশনে গান্ধীজী বড়লাটের ট্রেনকে আক্রমনের জন্যে নিন্দাসূচক প্রস্তাব-ও পাশ করিয়ে নিলেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। "গান্ধীর মতে স্বাধীনতার অর্থ সবসময় সম্পর্ক ছেদ নয়, দেখতে হবে সে সম্পর্কের ফলে উভয়পক্ষ লাভবান হবে কিনা।" (ঐ পৃঃ ১৬৫)।

(২) ১৯৩১ সালে সর্দার ভগৎ সিংহের ফাঁসির আদেশ যাতে ইংরেজ সরকার কার্যকরী না করে সেকথা তাদের জানাবার জন্যে কংগ্রেসের ভেতরের ও বাইরের নেতৃবৃন্দ যখন গান্ধীজীকে চাপ দিতে শুরু করলেন তখন গান্ধীজী পরিস্কারভাবে বলেন, "I consider the demand for the release of the terrorists as mean." (Armed struggle for freedom by Balshastri Hardas. Page 327. Jagriti Prakashan, Noida-201301). কিন্তু এই গান্ধীজীই ১৯২৪ সালে আবদুল রসিদ নামে একজন মুসলিম যুবক যখন আর্যসমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে নৃশংসভাবে খুন করে, তখন তিনি রাজশক্তির নিকট তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্যে জোর তদবির করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অপরাধ ছিল, তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন।

(৩) এই অধ্যায়ে আইন অমান্য, গান্ধীজীর 'ডান্ডি মার্চ', বিদেশী

বর্জন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস অহিংসা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার পাশাপাশি বিপ্লবীরাও তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিলেন। "১৯১৯-২৯ মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, আর শুধু ১৯৩০-এই ঘটেছিল ৫৬টি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন,জালালাবাদের যুদ্ধ, লোম্যান হত্যা ও বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান।" (ঐ পৃঃ ১৬৩)। একদিকে সারা ভারতে গান্ধীজীর আইন অমান্য ও বিদেশী-বর্জন আন্দোলন ও অপরদিকে বাংলার বিপ্লবীদের ইংরেজ-নিধনের মহাযজ্ঞ। রাজশক্তি তখন বেশ বিপাকে। তাদের আশংকা ছিল, বাংলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ড যদি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে সামাল দেয়া মুসকিল হবে। তাই তারা গান্ধীজীকে শিখণ্ডী খাড়া করে অচিরেই একটা সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করলেন এবং শাসকগোষ্ঠী যে বিপ্লবীদের চেয়ে গান্ধীজীকে বেশী গুরুত্ব দেন তা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের মাধ্যম।

(৪) গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট—৫ই মার্চ ১৯৩১। এই প্যাক্টের কথা যখন মনে হয় তখন গান্ধীজীর সাথে প্রথম সাক্ষাতকারে (নভেম্বর ২, ১৯২৭) আরউইনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা মনে হয়। গান্ধীজী সম্পর্কে আরউইন তার পিতাকে লিখেছিলেন, "তাঁকে (গান্ধীকে) মনে হয়েছিল, বাস্তব রাজনীতি থেকে বহুদূরের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলা এমন একজনের সঙ্গে কথা বলা যিনি অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে পক্ষ কালের জন্যে নেমে এসেছেন।" (ত্রিপাঠী পৃঃ ১৩৮)। ঠিক তার তিন বৎসর পর এই আরউনকেই বৃটিশরাজের স্বার্থে গান্ধীজীর মত একজন নেটিভের সাথে এক চুক্তিতে আসতে হয়। এই চুক্তি সম্পাদন করে বৃটিশশক্তি এক ঢিলে তিনটি পাখী মারলেন।

(ক) ভারতের মুসলমান সমাজকে চিরদিনের মত কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

(খ) কংগ্রেসের ভেতরে এবং বাইরে যে সব রাজনৈতিক নেতারা গান্ধীজীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছিলেন না, তাঁদেরকে সাবধান করে দিলেন এই ভাবে ঃ "দেখ তোমাদের গান্ধীকে আমরা কত সম্মান করি, তোমরাও তেমনি বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কালক্ষেপ না করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নাও"।

(গ) আর বিপ্লবীদের পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন, বিপ্লববাদ ত্যাগ করে গান্ধীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমরাও মুক্তি পাবে; তবে তোমাদের বিপ্লবের পথ ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ গান্ধীজীর পথে চলতে হবে; নতুবা যতদিন খুশী আমরা তোমাদের জেলে রেখে পচিয়ে মারবো।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য ঃ গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে সত্যাগ্রহীদের বিনাশর্তে মুক্তির ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু বিপ্লবীদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ-প্রসঙ্গে সর্বত্যাগী সন্যাসী বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য ও মদীয় রাজনৈতিক গুরু স্বর্গীয় বিপ্লবী জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদারের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি একটি কথা প্রায়ই বলতেন, 'ইংরেজদের শত সহস্র কর্ম হয়ত নিন্দনীয়; কিন্তু তাদের দেশাত্মবোধে ত্রুটি ধরতে পারবে না কেউ।' তাই এখানে দেখতে পাই, রাজার প্রতিনিধি হয়ে আরউইন সাহেব দেশ ও জাতির স্বার্থে কীভাবে ব্যক্তিগত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের একজন প্রজার সাথে (যাঁকে উইন্‌ষ্টন চার্চিল Half Nacked Fakir বলে অভিহিত করেছেন) এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে এরূপ আর একজন ইংরেজের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের শেষ গভর্ণর জেনারেল, নাম লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন, যিনি দেশ ও জাতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পণ্ডিত জওহরলালকে স্বমতে আনতে পারিবারিক মানমর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা দ্বিধা করেননি।

এবার আসুন, গান্ধী-অরউইন চুক্তির শর্তগুলি কী ছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরাই ঃ

(ক) কংগ্রেস আইন-অমান্য স্থগিত রাখবে ও সরকার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ১৯৩১-এর ১নং অধ্যাদেশ ছাড়া সব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করবে।

(খ) আইন অমান্যকারীদের মুক্তি দেওয়া হবে, পিটুনি পুলিশ তুলে নেওয়া হবে।

(গ) অবিক্রীত বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়া হবে ও যেসব গ্রামীণ কর্মচারী পদত্যাগ করেছিল তাদের পুনর্নিয়োগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

(ঘ) পুলিশী নির্যাতন নিয়ে অনুসন্ধান হবে না।

(ঙ) বিলাতী পণ্যের বয়কট রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করা হবে না, আইন না ভেঙ্গে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলবে।

(চ) খাবার জন্য লবণ তৈরী করা যেতে পারে।

(ছ) কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে কিন্তু তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে বৃটিশের রক্ষাকবচ, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, আর্থিক বাজারে ঋণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা ও স্বীকৃত দায়িত্ব মেনে নিতে হবে।

এই প্যাক্টের সব ধারাই রাজশক্তির অনুকূলে রচিত হয়েছিল। চুক্তির সর্বশেষ ধারায় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন কথা ছিল না; পরন্তু ছিল, কীভাবে ভারতবর্ষে বৃটিশস্বার্থ সংরক্ষিত হবে তার রূপরেখা।

তবুও গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মতিলাল নেহেরু যদি সেদিন বেঁচে থাকতেন (মাত্র একমাস আগে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) তবে গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এমন অসম চুক্তি কখনই সম্পাদন করতে পারতেন না।

(৫) গোলটেবিল বৈঠক। গোলটেবিল বৈঠক হয়েছিল তিনটি—প্রথমটি ১৯৩০-৩১ নভেম্বর-জানুয়ারী, দ্বিতীয়টি ডিসেম্বর, ১৯৩১, আর তৃতীয়টি ১৯৩২-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর। প্রথম দুটিতে কংগ্রেস যোগ দিয়েছিল, কিন্তু কোন দিক দিয়েই কোন সুবিধে করতে না পারায় গান্ধীজী আবার লোকদেখানো আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং কারাবরণ করেন। ফলে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের মতো সুভাষচন্দ্র এই গোলটেবিল বৈঠকেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এ-সবই বৃটিশের কালক্ষেপ করে রাজশক্তিকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করা। তাই এসব লোকদেখানো চুক্তি বা কোন বৈঠকে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

## তৃতীয় অধ্যায় (১৯৩৮-৪২)

(১) গান্ধীজী যেদিন তাঁর নেতৃত্ব কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন সেদিন থেকেই কে কোন্ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হবেন তা নির্ধারণ করতেন গান্ধীজী নিজে। অন্যের মতামত নিতেন ঠিকই, কিন্তু শেষ কথা ছিল তাঁরই। এভাবেই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করলেন। সেই কংগ্রেসেই ভারতের পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্বারা তিনি এক ঢিলে দুটি পাখী মারলেন— (১) সভাপতির পদ উপঢৌকন দিয়ে জওহরলালকে স্বমতে এবং বশে আনলেন, (২) এই কংগ্রেসে দেশের পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন, জওহরই দেশের ভবিষ্যৎ নেতা যাকে তখন থেকে দেশবাসীর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মেনে নেয়া কর্তব্য।

(২) হরিপুরা কংগ্রেস (১৯৩৮)। এত করেও কিন্তু গান্ধীজী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছিলেন না। কারণ সুভাষ ছিলেন ফেডারেশনের বিরোধী এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে চেয়েছিলেন বৃটিশের সাথে চরম সংঘাতে লিপ্ত হতে, যা ছিল গান্ধীজীর নীতির সাথে চরম বিরোধ। তাই গান্ধীজী সুভাষকে স্বমতে আনার জন্যে, অন্যভাবে বলতে গেলে সুভাষকে তাঁর স্বধর্ম থেকে চ্যুত করার জন্যে ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসের সভপতির পদটি উপঢৌকন হিসেবে দিলেন। আশা ছিল, এতে সুভাষ অনেকটা নরম হবেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পরবর্তীকালে গান্ধীজীর সাথে নীতির দিক দিয়ে

বড় রকমের কোন সংঘাতে যাবেন না। কিন্তু গান্ধীজীর হিসেবে একটু ভুল ছিল (যা তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন এবং সুভাষকে সর্বদিক দিয়ে পর্যুদস্ত করার খেলায় মেতে ছিলেন)। সে-ভুলটি হলো সুভাষচন্দ্র যে বস্তু দিয়ে গঠিত এবং ভারতের নবজাগরণের যিনি উদ্‌গাতা সেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে যিনি উদ্বুদ্ধ তাঁকে কোন প্রলোভন দিয়েই আদর্শচ্যুত করা যায় না। তাই আমরা দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির ভাষণে এতোদিনের সযত্নে-লালিত চিন্তাভাবনার রূপরেখা তুলে ধরলেন দেশবাসীর কাছে ঃ (ক) ফেডারেশন কোনক্রমেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে না; (খ) স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অনতিবিলম্বে গনআন্দোলন গড়ে তোলা; (গ) সমস্ত বামপন্থী সংগঠনকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে আরো গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিতে পরিণত করা; (ঘ) স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পনা মাফিক দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন; (ঙ) সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে অগণতান্ত্রিক ও ঐক্যবিরোধী বলে বর্জনীয়; (চ) জমিদারী প্রথার বিলোপ ও ভূমিসংস্কারের উপর জোর; (ছ) সমস্ত দেশের জন্যে এক ভাষা, যা হবে হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণ এবং লিপি হবে রোমক অর্থাৎ ইংরেজী লিপি; এবং আরো অনেক সমস্যা ও সমাধানের উল্লেখ আছে উক্ত ভাষণে। সুভাষচন্দ্রের এ-ভাষণ যে গান্ধীজী ও দক্ষিণপন্থীদের কর্ণে মধু বর্ষণ করেনি তা বলাই বাহুল্য। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসে। এ-প্রসঙ্গে ত্রিপাঠী সাহেবের একটি মন্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি। "গান্ধী এতদিন সমস্ত গণআন্দোলনের কাল নির্ধারণের কর্তা, গতি-প্রকৃতির নিয়ামক হয়ে এসেছেন এবং দুবারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আবার হতে চান। সুভাষের মধ্যে তিনি নিজ অবিসংবাদিত নেতৃত্বের বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ দেখেছিলেন। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে নেহেরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়ে গেছে ১৯৩৬ সালে। বসু কি ভুলে গিয়েছিলেন গান্ধী কীভাবে, প্রায় চোখ রাঙিয়ে, নেহেরুকে বাগে এনেছিলেন? নেহেরু নানা কারণে বশ মেনেছিলেন, উত্তরাধিকারের লোভ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ গান্ধী জানতেন, সুভাষকে নিমন্ত্রণ করা যাবে না। তাঁর বিদ্রোহ চিরদিনের মত দমন করতে হবে।" (ঐ পৃঃ ২৫৮-৫৯)

(৩) ভারত-শাসন-আইন ১৯৩৫-এর ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয় তাতে ভারতের বেশীর ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের জন্যে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো না। **যদি হতো (যাতে সুভাষের মত ছিল) তবে লেনার্ড গর্ডনের মতে "কংগ্রেস ১১টি মন্ত্রীসভা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং হিন্দু-মুসলমানদের বৃহত্তর সমঝোতা না হলেও**

**কংগ্রেসই বৃটিশ ভারতের মুখপাত্র হতো। আবার সেই জোরে ত্রিপুরীতে (ত্রিপুরী কংগ্রেস ১৯৩৯) পূর্ণ স্বরাজের দাবী করতে পারতো। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ দাবী অগ্রাহ্য করা সহজ হতো না। আর করলেও বৃহত্তর জনমতের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস ব্যাপকতর সত্যাগ্রহ শুরু করতে পারতো।" (ঐ-পৃঃ ২৫৭)।** এখানে মাত্র একটি কথাই বলার আছে, একজন বিদেশী যেভাবে ভারতের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেছেন এবং ভেবেছেন, গান্ধীজী যিনি নিজেকে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা বলে মনে করেন তিনি তো সে পথে যানইনি বরং প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের পথ অবরোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি উদাহরণ দেবো। সেদিন গান্ধীজী কৃষক প্রজা পাটির সর্বময় কর্তা জনাব ফজলুল হক সাহেবের প্রস্তাব মেনে নিয়ে শরৎ বসুর নেতৃত্বে বাংলায় কোয়ালিশন (Coalition Govt.) সরকার গঠনের স্বপক্ষে মত দিতেন তবে নিশ্চিতরূপেই ফজলুল হক সাহেব লিগে চলে যেতেন না এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসও অন্যভাবে লিখিত হতো। কিন্তু না, তা হয়নি। যে-ভাবে একদিন তিনি কংগ্রেসকে খিলাফৎ আন্দোলনের সাথে সামিল করে মহম্মদ আলি জিন্নাকে কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক একইভাবে বাংলায় শরৎ-হক কোয়ালিশন সরকার গড়তে না দিয়ে ফজলুল হককে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। যে-গান্ধী বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গড়ার পক্ষে মত দেননি সেই গান্ধী আসামে গোপীনাথ বরদলুইর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গড়ার মত দিয়েছিলেন। দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে সেদিনগুলিতে গান্ধীজী যে-সব কাজ করেছেন এবং আমরা দেখবো ১৯৩৯, ১৯৪২ ও ১৯৪৭-ও করবেন, তা ক্ষমার অযোগ্য তো বটেই, এমন কি দেশদ্রোহীতার দায়েও তাঁকে সোপর্দ করা যায়। কিন্তু সেদিনগুলিতে তাঁকে সোপর্দ করার মতো কেউ ছিল না ঠিকই, তবে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন তাঁকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। ইতিহাসকে সাময়িকভাবে কুয়াসাচ্ছন্ন করা যায়, কিন্তু চিরদিনের মত তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

(৪) ত্রিপুরী কংগ্রেস—১৯৩৯। তাই সতীর্থ ও অনুগামীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্যে প্রার্থী হলেন তখন গান্ধীজী সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন গান্ধীজী দেখলেন সুভাষ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করছেন না তখন তিনি পট্টভি সীতারামায়াকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করালেন, সুভাষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে। তাতে কোন ফল হলো না, সুভাষেরই

জয় হলো—সুভাষ পেলেন ১৫৮০ ভোট, আর সীতারামায়া পেলেন ১৩৭৫ ভোট। গান্ধীজী এবার মরিয়া, নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "সীতারামায়ার পরাজয় আমার পরাজয়।" এই বক্তব্যের সাথে তিনি আরো কিছু বক্তব্য জুড়ে দিলেন যার সাতে সত্য ও অহিংসার কোন সম্পর্ক নেই, আছে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার কুৎসিত প্রতিফলন। বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি ঃ "After all, Subhas Babu is not an enemy of the country. He has suffered for it... The minority can only wish it all success. If they cannot keep pace with it, they must come out of the Congress..... Those, therefore, who feel uncomfortable in being in the Congress may come out, not in a spirit of ill-will but with the deliberate purpose of rendering effective service."

ত্রিপাঠী সাহেব বলছেন, "এত ভদ্রভাষায় এমন ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ কী হতে পারে?" (ঐ পৃঃ ২৫৯)। উত্তরে আমরা বলবো ঃ অবশ্যই হতে পারে, কারণ গান্ধীজী সব কিছুতেই একটা ভদ্র আবরণ দিতে ভালবাসতেন এবং অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় তদানিন্তন বড়লাটের একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ "Mahatma took the opportunity of pull him to pieces and leave him in no doubt whatever as to what he thought of him on all points." (ঐ পৃঃ ২৬০) । মনে হয়, বড়লাট সাহেব এখানে গান্ধীজীর মনের অবস্থা যেভাবে মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন, স্বয়ং গান্ধীজী নিজেও এতো স্বল্প কথায় ব্যক্ত করতে পারেননি। ত্রিপুরীর প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় ১০ই মার্চ। ঐ সময় সুভাষচন্দ্র অসুস্থ থাকায় সভাপতির পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। ঐ ভাষণের মূখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী নিয়ে বৃটিশকে অবিলম্বে চরম পত্র (Ultimatum) দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই প্রস্তাব অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। গান্ধীপন্থীরা রেগে আগুন। তারা এর প্রতিশোধ নিল পন্থ-প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে। যেহেতু প্রস্তাবটি গোবিন্দ বল্লভ পন্থ উত্থাপন করেছিলেন তাই সেটি পন্থ-প্রস্তাব নামে খ্যাত যার মর্ম ছিল, গত ২০ বৎসর গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়ে আসছে, সুতরাং এবারও নবনির্বাচিত সভাপতিকে অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মত নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিছুদিন পূর্বেই যাদের সমর্থন পেয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের সবাই কি পন্থ-প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেননি ? না, দেননি। তাদের

অনেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন এবং কেউ কেউ পক্ষেও ভোট দিয়েছিলেন। পন্থ-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এখানেও আমাদের আবার সেই বড়লাট সাহেবের পরিস্থিতি-মূল্যায়নের দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে। তিনি বলছেন ঃ "Whether he (Gandhi) goes to Tripuri or not, he has beyond any question completely allowed the unhappy Bose out into the cold (if, indeed, a man with 102° of fever can be cold) and has concentrated the spotlight on himself." (ঐ পৃঃ ২৬২)। সুতারাং গান্ধীজী যে সুভাষের Ultimatum-এর প্রশ্নে ইতিবাচক সাড়া দেবেন না তাতে আশ্চর্যের কী আছে? এবার আমরা আমাদের পূর্বকথায় ফিরে যাবো। পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সহযোগিতা কামনা করেও যখন তার নিকট থেকে কোনপ্রকার গঠনমূলক সাহায্য পেলেন না এবং যেহেতু সুভাষচন্দ্র হোমোজেনাস (Homogenous) কমিটির পক্ষপাতি ছিলেন না, তাই তিনি সভাপতিপদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তা কার্যকরী করে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই "Forward Bloc" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। অতঃপর ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর সাথে চরম সংগ্রামের জন্যে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ালেন এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইয়োরোপে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপ থেকে এসে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন, অতি শীঘ্রই ইয়োরোপে একটা যুদ্ধ সংগঠিত হতে চলেছে। যিনি নিজেকে একজন আন্তর্জাতিকবিষয়ের বেত্তা বলে মনে করতেন, সেই পণ্ডিতজী কিন্তু সুভাষের এই বক্তব্যকে মোটেই আমল দেননি। সে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র কিন্তু ইয়োরোপের এই যুদ্ধকে ভারতবর্ষের পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলেন এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রাজশক্তিকে যে Ultimatum দেবার কথা বলেছিলেন তা গান্ধীজীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্যে আবেদন করলেন। গান্ধী তদুত্তরে কোনরূপ ইতিবাচক সাড়া দেননি। ফলে সুভাষকে এককভাবেই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হলো এবং তাঁর সংগঠন ফরওয়ার্ড ব্লককে শক্তিশালী করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। একদিকে গান্ধীজীর নৈষ্কর্ম্য, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন এগুতে লাগলো। শেষবারের মতো যখন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নিকট বৃটিশকে চরমপত্র দেবার কথা বল্লেন তখন গান্ধীজী ১৯৪০ সালে নিম্নোক্ত চারটি কারণ দেখিয়ে সুভাষের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন।

প্রথম কারণ, বৃটেন যখন যুদ্ধের কারণে নিজেই ধ্বংসের মুখোমুখি

তখন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা বা চরমপত্র দেয়াকে আমি পাপকার্য বলে মনে করি। দ্বিতীয় কারণ, আমি ভারতের আকাশে বাতাসে ঘৃণা ও হিংসার পরিবেশ লক্ষ্য করছি; তৃতীয়তঃ মুসলিম লিগ কংগ্রেসের এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং চতুর্থতঃ আমি আশা করছি, বৃটিশের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব। এসব অজুহাত দেখিয়ে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র তথা দেশবাসীকে শুধু হতাশই করলেন না, সাথে সাথে সুভাষচন্দ্র যাতে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগ্রামী মনোভাবের সাথে কংগ্রেস যাতে কোনপ্রকারে জড়িত না হয়ে পড়ে তার জন্যে বসু-ভ্রাতৃদ্বয়কে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করলেন।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, যতদিন গান্ধীজী কংগ্রেসের সর্বময় কর্তৃত্বে থাকবেন ততদিন দেশের ভেতর থেকে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবর্ণ সুযোগকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কাজে লাগানো যাবে না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দেশের বাইরে যেয়ে অক্ষ-শক্তির (Axis Power) সাহায্য নিয়ে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্র কাবুল হয়ে বার্লিনে যেয়ে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে (১৯৪১ খৃঃ) জাপান এ্যাংলো আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ১৯৪২ পার হবার পূর্বেই জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে এসে অবস্থান করছে। যে কোন মুহূর্তে তারা ভারতে প্রবেশ করতে পারে। ১৯৪১ ও ১৯৪২ এর মধ্যে জার্মানীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে পৃথিবীর দুই প্রান্তে দু'টি মুক্তিবাহিনী তৈরী হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে জার্মানের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে জাপানীদের সাহায্যে রাসবিহারী মোহনসিংদের মুক্তি বাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে পারে। এ-অবস্থায় গান্ধীজী প্রমাদ গনলেন। এবার বুঝি আর ইংরাজদের বাঁচানো গেলো না। একবার যদি মুক্তি বাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে পারে তবে ভারতের অগনিত বিপ্লবী সংগঠন তাঁদের সর্বদিক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে, পরন্তু বৃটিশদের যুদ্ধ-উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করবে। তাই গান্ধীজী ঠিক করলেন, একটা আন্দোলনের অবতারণা (পড়ুন প্রহসন) করে নিজেরা জেলের অন্তরালে যেয়ে বসবেন, আর দেশের বিপ্লবীশক্তি বৃটিশের বুলেট-বেওনেটের মুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। অতঃপর যে-দিক দিয়েই হোক, মুক্তিবাহিনী যদি ভারতের ভেতরে ঢুকেও পড়ে তবুও তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো বা সাহায্য করার মতো কোন বিপ্লবীশক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না। এক ঢিলে

তিনি দুটি পাখী মারতে চেয়েছিলেন—(১) বৃটিশ শক্তি যাতে তাদের যুদ্ধোদ্যমে ভারতবাসীর কাছ থেকে এতোটুকুও বাঁধা না পায় তা নিশ্চিত করা; আর (২) বৃটিশের বিরুদ্ধে সুভাষ-পরিকল্পিত বিপ্লব ভারতের অভ্যন্তরে দানা বাঁধার পূর্বেই অংকুরে বিনাশ করে দেয়া। প্রসঙ্গতঃ ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর "ভারতের অস্থায়ী সরকার" গঠনের প্রাক্কালে নেতাজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। নেতাজী বলেছিলেন ঃ "The real revolution will begin in India when we shall march with our armies flying the National Flag of Free India and cross into the Indian borders. I have no doubt that only revolution will destroy the British power in our country.... The Provisional Government is the creation of the Independence League and its function is to declare the last war of Independence to lead it on to a successful consummation." (Armed Struggle for Freedom by Balshastri Hardas. Jagriti Prakashan Noida-201301. Page 393)। এটাই ছিল নেতাজীর পরিকল্পিত বিপ্লবের রূপরেখা যা গান্ধীজী ১৯৪২ সালে তাঁর আগষ্ট আন্দোলনের প্রহসন দিয়ে আগেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, যারা বিশ্বাস করেন, গান্ধীজী সত্যি সত্যি বৃটিশকে ভারতছাড়া করবার জন্যে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তাদের নিকট শুধু একটি প্রশ্ন রাখতে চাইঃ যে সব কারণ দেখিয়ে ১৯৩৯-৪০ সালে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের "বৃটিশকে ভারত ছাড়ার জন্যে চরম পত্র দেবার" প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন, ১৯৪২ সালের আগস্টে সে-সব কারণ যখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তৎসত্ত্বেও কোন্ যুক্তিতে বা নৈতিকতা-বলে গান্ধীজী "ভারত-ছাড়" আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন? এই হলো গান্ধীজীর "ভারত-ছাড়" বা ৪২-এর আন্দোলনের গোড়ার কথা। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, গান্ধীজী শেষরক্ষা করতে পারলেন না। মিত্রশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েও বৃটিশশক্তিকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হলো ঐ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কারণেই। একথা তদানিন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী সাহেব স্বয়ং কোলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে কবুল করে গেছেন। মৎপ্রণীত "স্বাধীনতা সৈনিকের ডায়েরী" শীর্ষক পুস্তকে এ-প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক পুস্তকটি পড়ে দেখতে পারেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন দেখা যাবে, আজকে যারা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলতে চান, তাদের আসল চরিত্র। আরও দেখা যাবে, সেদিন ভারতবাসীর কাছে যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সুযোগ নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ এনে

দিয়েছিলো তা কাদের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় বানচাল ও বিপর্যস্ত হয়েছিল।

## চতুর্থ অধ্যায় (১৯৪৫-৪৮)

গান্ধীজীর জীবনের এই অধ্যায় ভারতবাসীর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই অধ্যায়ে (১) অক্ষশক্তির পরাজয়ের সাথে সাথে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও পরাজয় ঘটে এবং সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশ হন; (২) মিত্রশক্তির জয় এবং ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত; (৩) ভারতবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর; (৪) ১৯৪৮ সালের ৩০-শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে কর্তৃক গান্ধীহত্যা।

১। ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগষ্ট আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোসীমা ও নাগাসাকী শহরে দু'টি আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে জাপান অনতিবিলম্বেই মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সাথে সাথে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তিনি আজও নিরুদ্দেশের তালিকায় আছেন, যদিও ১৮ই আগষ্ট তাইহুকু বিমান-বন্দরে নেতাজী এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন বলে এক কাল্পনিক সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, জাপানের আত্মসমর্পণের পূর্বেই পশ্চিম গোলার্ধে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে।

২। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিত্রশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তিকে চুড়ান্তভাবে পরাজিত করে। এই মিত্রশক্তির এক মিত্র ছিল গ্রেট বৃটেন বা বৃটিশ শক্তি। আবার এই গ্রেট বৃটেনের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল ভারতবর্ষ, ইংরেজ জাতির Life Line. এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েও বৃটিশ শক্তি ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল কেন? আমরা জানি, জাগতিক নিয়মে কেউ স্বেচ্ছায় তার সম্পদ বা সম্পত্তি ত্যাগ বা হস্তান্তর করে না, একমাত্র বাধ্য হলেই করে। যুদ্ধোত্তর কালে সেদিন এমন কী বাধ্যবাধকতা ছিল যার জন্যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষ থেকে তাদের চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হল? যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল গর্বভরে একদিন বলেছিলেন, "I have not become the Prime Minister of His Majesty's Government to liquidate the British Empire". তিনি তখনো জীবিত এবং যুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে তার দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও গ্রেটবৃটেনের রাজনীতিতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বা মতামতের দাম এতোটুকুও খর্ব হয়নি। জয়ী লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি সাহেবকেও ভারতবাসীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাঁর মত

বা সম্মতি নিতে হয়েছিল। তিনি বেঁকে বসলে কিছুতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতো না। কিন্তু স্যার উইনস্টনকেও এ্যাটলি সাহেবের সাথে একমত হয়ে সম্মতি জানাতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? "এই কেন-র উত্তর" দেশের শাসকগোষ্ঠী অদ্যাবধি সর্বসাধারণকে জানতে দেননি; কারণ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা ছিল কলংকিত, মসিলিপ্ত। কিন্তু ইতিহাসকে তারা কতদিন চেপে রাখবেন? ইতিহাস কারু আজ্ঞাবাহী ভৃত্য নয়—সত্যকে একদিন সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেই এবং সেদিনের আর বেশী বাকী নেই।

প্রকৃত ঘটনা হলো, বৃটিশসিংহকে সেদিন ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের কারণে। যুদ্ধোত্তরকালে যুগপৎ দেশবাসীর মনে গণবিদ্রোহের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং ভারতীয় নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী যেভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তার মূল কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ও সেনাপতিদের যুদ্ধকয়েদীরূপে ভারতে এনে লালকেল্লায় বিচারের ধৃষ্টতা-প্রদর্শন। ভারতবাসী ও যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনারা, যারা বৃটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা নেতাজীর নেতৃত্বে গঠিত আজাদহিন্দ ফৌজ বা তাঁদের সেনাপতিদের কখনই যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করেনি, গণ্য করেছিলেন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। এমন যে পুলিশ বাহিনী তারাও, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পূর্বোক্ত বিচারের প্রতিবাদে যে-সব জমায়েত ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করেছিল। এমতাবস্থায় বৃটিশ শক্তি প্রমাদ গনলেন—বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য দুই বুঝি যায়! তাই ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলেন না। "সর্বনাশেসমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ"—নীতি গ্রহণ করে, বাণিজ্যিক স্বার্থ অটুট রেখে সাম্রাজ্যের স্বার্থ ত্যাগ করলেন। একদিন যেমন তারা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন সেদিনও তারা বাণিজ্যের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিলেন। তাই স্বাধীনতার বাহান্ন বৎসর পরও আজ ভারতে যতো বিদেশী মূলধন খাটে তার শীর্ষে আছে গ্রেটবৃটেনের স্থান। প্রাসঙ্গিক বিধায় সেদিনগুলিতে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল তা পাঠক মহোদয়ের অবগতির জন্যে তদানিন্তন ভারতের বড়লাট ওয়াভেল সাহেবের একটি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করবো। চিঠিটি লিখেছিলেন রাজা ষষ্ঠ জর্জকে, ৮ই জুলাই ১৯৪৬। "the services are tired and discouraged.... the loyalty of the police and Indian army problemetical." (সূত্র-কংগ্রেসের ইতিহাস-ত্রিপাঠী। পৃঃ ৪৩১)। চিঠিতে এর বেশী খোলাখুলিভাবে লিখা যায় না। একদিকে তিনি যেমন লণ্ডনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে পরিস্থিতির অবস্থা জানাচ্ছিলেন, অপর দিকে কংগ্রেস

ও লিগের কর্মকর্তাদের ডেকে বলে দিলেন, শীঘ্র এই বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানকে থামাও, নতুবা তোমাদের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান কোনটিই পাবে না। তাই সাততাড়াতাড়ি কংগ্রেসের সর্দার প্যাটেল ও লিগের মিঃ জিন্না বোম্বে চলে যান এবং বিদ্রোহীদের এই বলে আশ্বস্ত করেন, অনতিবিলম্বেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ও সেনাপতিদের বিচারের প্রক্রিয়া পরিত্যক্ত হবে এবং আমরাও শীঘ্রই স্বাধীন হতে চলেছি; সুতরাং তোমরা যে যার স্থানে চলে যাও। প্রকৃতপক্ষে, কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীর লালকেল্লার বিচার পরিত্যক্ত হলো, দেশ শান্ত হলো। সেদিন কংগ্রেসের হয়ে সর্দার প্যাটেল বিদ্রোহীদের নিকট অসত্য ভাষণ দিয়ে বিদ্রোহ প্রশমিত করলেন ঠিকই, কিন্তু দেশ যে শীঘ্রই টুকরো টুকরো হতে চলেছে সে-কথাটি তাদের নিকট গোপন করে দেশ ও জাতির প্রতি তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ইতিহাস তাকে এবং কংগ্রেসকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

৩। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ততো ইংরেজরা নিলেন; কিন্তু মনে প্রাণে সিদ্ধান্তটিকে মেনে নিতে পারছিলেন না—তাদের মাথায় সবসময় সেই ইউনিয়ন কথাটি ঘুরপাক খাচ্ছিল। ১৯২৮-৩১ সালের বাংলায় যে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছিল তাতে তারা বুঝতে পেরেছিলেন, খুব শীঘ্রই তাদের এদেশ থেকে বিদেয় নিতে হবে; গান্ধীজীর অহিংসা-ঠহিংসায় কোন কাজ হবে না। তাই তারা ঠিক করেছিলেন, ভারতকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করবেন ঃ (১) হিন্দু-গরিষ্ঠ ভাগ, (২) মুসলমান গরিষ্ঠভাগ, আর (৩) দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে একটি ভাগ। এদের সবাইকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হবে। সেই ইউনিয়নের নিয়ামক শক্তিরূপে থাকবে বৃটিশ শক্তি। হাতে থাকবে প্রধানতঃ দেশরক্ষা, বিদেশনীতি, যানবাহন প্রভৃতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা; আর এসবের জন্যে যে খরচপত্র হবে তার যোগান দেবে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সব কটি রাষ্ট্র। সমস্ত ভারতবর্ষকে যখন একদিন হারাতেই হবে তখন হিন্দু, মুসলমান ও দেশীয় রাজ্যের নেতাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগী করে যাতে আরও কিছুদিন এদেশে থাকা যায় তারই পরিকল্পনা এই ইউনিয়ন। এবং গল্পের "বানরের পিঠে ভাগের" ভূমিকা গ্রহণ করে সবার উপর ছড়ি ঘুরাবেন। কিন্তু বিধি বাম হলো। তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হলো অর্থাৎ শেষপর্যন্ত কোন জারিজুরিই খাটল না। মুখে এবং কালিকলমে যাই বলুন বা লিখুন না কেন গান্ধীজী কোনদিনই চাননি যে বৃটিশরা ভারত সাম্রাজ্য থেকে চিরদিনের মতো চলে যাক। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের একেবারে পূর্বমুহূর্তে ও যখন কেবিনেট মিশনের মাধ্যম শাসকগোষ্ঠী শেষ চেষ্টা করেছিলেন তখন গান্ধীজী কংগ্রেসের হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটনকে একটি চিঠি

লিখে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। চিঠিটি ছোট্ট, কিন্তু একে একটু ধীরস্থির ভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে ইংরেজের প্রতি গান্ধীজীর তথা কংগ্রেসের আনুগত্য কত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল এবং ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি কীরূপ ধারণা পোষণ করতেন। চিঠিটি মাউন্টব্যাটেনকে অত্যন্ত গোপন ভাবে লিখিত। তিনি লিখেছিলেন ঃ

১। "কংগ্রেস শপথপূর্বক ঘোষণা করছে যে, ইউনিয়নের কোন প্রদেশ বলপূর্বক ধরে রাখবে না।

২। "সংখ্যাল্প হলেও সুসংবদ্ধ মুসলমানদের বলপূর্বক অধীনস্ত করে রাখা জাত-পাত নিয়ে দ্বন্দ্বগ্রস্ত কোটি কোটি হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভব অবাস্তব।

৩। "একথা ভুললে চলবে না যে মুসলিম শাসন ধীরে ধীরে ভারতকে পদানত করেছিল যেমনভাবে ইংরেজ বিজেতারা করে।

৪। "তথাকথিত তপশীলী জাতি এবং তথাকথিত আদিবাসীদের মুসলীম পক্ষে টানার জন্য একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

৫। "সবর্ণ-হিন্দু-রূপী জুজুরা যে নিরাশজনক সংখ্যালঘু, তা ভালভাবেই প্রমান করা যায়। এদের মধ্যে রাজপুতেরা শ্রেণীগতভাবে এখনও জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেনি। ব্রাহ্মণ ও বানিয়ারা এখনও অস্ত্রের ব্যবহার করতে শেখেনি। তাদের প্রাধান্য কেবল মাত্র নীতির জগতে। এরকমের হিন্দুমসাজ যে কোটি কোটি মুসলমানকে শেষ করে দিতে পারে তা একমাত্র কল্পকথাই।

"আমি এ চিঠি আমার কোন বন্ধুকেই দেখাইনি" ২৭/২৮ জুন, ১৯৪৭ ইং ('মহাত্মা'—ডি. জি. তেন্ডুলকর, খণ্ড ৮, পৃঃ ৩০। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বিশ্ব হিন্দু বার্তা, ভাদ্র ১৪০৪)। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি, কারণ লিগ বেঁকে বসেছিল। মুসলিম-তোষণ-নীতি চালিয়ে গান্ধীজী এবং মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে ইংরেজ সরকার যে ফ্রেঙ্কেনস্টাইন (Frankenstein) তৈরী করেছিলেন তার হাতেই উভয়ের কলাকৌশল পরাজিত হলো। ইংরেজ ভেবেছিল, হিন্দুদের সহিংস আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্যে গান্ধীতো পরোক্ষভাবে তাদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছেই; এখন মুসলমানদের কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দিলে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের সাথে সামিল হবে না, পরন্তু প্রয়োজনমত তাদেরকে ইংরেজরা কাজে লাগাতে পারবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইংরেজ পরিকল্পনার প্রথম অংশ সফল হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশে তারা ইংরেজের বশংবদ থাকলো না। মুসলমানরা ইংরেজদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের দাবীতে অচল-অটল রইলো। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজরা ইউনিয়নের (Union) পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে Divide and Depart-এর নীতি গ্রহণ করলো যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের জন্ম হলো, আর অখণ্ড

হিন্দুস্থান হলো খণ্ড খণ্ড। ইংরেজদের এই সিদ্ধান্ত নেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। অন্যথায় তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সাথে বাণিজ্যিক স্বার্থও ভারতে আর অবশিষ্ট থাকতো না। কিছুদিন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা চলে যেত। এ-অবস্থা বৃটিশরা কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। তাই সময় থাকতে থাকতে বৃটিশরা মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে (Direct Action) নীরব দর্শক থেকে প্রত্যক্ষভাবেই মদত জোগাতে লাগলো। এটা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন লর্ড ওয়াভেল দিল্লীর গবর্ণর জেনারেল। বৃটিশের যদি মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মদত না থাকতো তবে ওয়াভেল সাহেব বাংলা ও পাঞ্জাবের গভর্ণরদের ১৯৩৫ সালের সংবিধানের ৯৩ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার নির্দেশ দিয়ে কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা থামালেন না কেন? এ-প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে দিয়ে দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন মৌলানা আজাদকে যে কথা ক'টি বলেছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন ঃ "I am a soldier, not a civilian. Once partition is accepted in principle, I shall issue orders to see that there are no communal disturbances anywhere in the country... I shall order the Army and the Air Force to act and use tanks and aeroplanes to suppress anybody who wants to create trouble." (কংগ্রেসের ইতিহাস—ত্রিপাঠী। পৃঃ ৪৯৬)। আমার মনে হয়, ওয়াভেল সাহেব মাউন্টব্যাটেনের চেয়ে কোন প্রকারেই কর্ম দরের সৈনিক ছিলেন না। দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করাবার জন্যে ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন যুগপৎ যে হুমকি ও আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছিলেন, ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা বা নরমেধ যজ্ঞ থামাবার জন্যে লর্ড ওয়াভেল কি একইভাবে হুমকি এবং আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করে তা কার্যকরী করতে পারতেন না? উত্তরে বলবো ঃ না, পারতেন না। কারণ দাঙ্গা থামাবার কোনই ইচ্ছে সেদিন ওয়াভেলের ছিল না, ছিল মুসলিম লীগ-দ্বারা অনুষ্ঠিত নারকীয়-হত্যাকাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে কংগ্রেসকে ভীতি প্রদর্শন করা যাতে তারা দেশভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করে। বাস্তবক্ষেত্রে ঘটলো-ও ঠিক তাই।

প্রথম দিকে কংগ্রেস ও গান্ধীজী নীতিগতভাবে দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধীজী এমন কথাও বলেছিলেন, "দেশভাগ হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশভাগ হলো তাঁর সম্মতিতেই। যে এ.আই.সি.সি-র সভায় (১৪ই জুন ১৯৪৭) দেশভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে গান্ধীজী স্বয়ং উপস্থিতই ছিলেন না এক মুখে একই সভায় দুরকম কথা রাখেন। একবার বলছেন, "If you are sure that your rejecting

the scheme will not lead to further breach of peace and further disorders you can do so." (কংগ্রেসের ইতিহাস—ত্রিপাঠী, পৃঃ ৪৯৭)। আবার বলছেন, " If you had it I would also be with you and if I felt strong enough myself I would alone, take up the flag of revolt. But to-day I do not see the conditions for doing so." (ঐ পৃঃ ৪৯৭)। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ কেন তিনি সেদিন আবহাওয়া অনুকূল দেখতে পাননি? যদি তিনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন "দেশ বিভাগ হবে একমাত্র তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে" তবে সেদিন তিনি পূর্বোক্ত সভায় উপস্থিত হলেন কেন? যদি বা উপস্থিত হলেন, তখন পরোক্ষভাবে দেশভাগ মেনে নেয়ার কথা বল্লেন কেন? যে-গান্ধীজী পানের থেকে চুন খসলে কথায় কথায় অনশন আরম্ভ করতেন সেই গান্ধীজী, দেশের যখন চূড়ান্ত সর্বনাশ হতে চলেছিল অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যখন দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, তখন অনশনব্রত অবলম্বন করে তাদের নিরস্ত করার প্রচেষ্টা চালান নি কেন? অথবা, যেহেতু তাঁর উত্তরাধিকারী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দেশভাগের পক্ষে ছিলেন তাই তিনি তাকে সমর্থন না করে পারেন নি? তিনি নিজেকে সারাজীবন ধরে একজন সাচ্চা সত্যাগ্রহী বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন, সেদিনের তাঁর তাদৃশ আচরণ কতখানি সত্যের প্রতি আগ্রহের পরিচয় বহন করেছিল? এখানে স্মর্তব্য, পরবর্তীকালে পণ্ডিত নেহেরু স্বীকার করেছেন, "সেদিন যদি বাপুজী বেঁকে বসতেন, তবে আমাদের পক্ষে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হতো না।" পক্ষান্তরে কিছুদিন পরেই অর্থাৎ দেশবিভাগের পরে ভারতসরকার যখন পাকিস্তানের অন্যায্য দাবী মেনে তাদেরকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে অস্বীকার করলো তখন তিনি অনশন করে পাকিস্তানের দাবী মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করলেন। গান্ধীজীর পূর্বোক্ত দু'প্রকার আচরণ থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্তে আসেন যে, গান্ধীজী কোনদিন সত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না— তিনি সত্যাগ্রহীর ভান করতেন একমাত্র নিজের মতলব হাসিল করার জন্যে, তবে কি তিনি ভুল করবেন? এখানে গান্ধীজী সম্পর্কে ওয়াভেল সাহেবের একটি বক্তব্য তুলে দিয়ে তার একটু ব্যাখ্যার চেষ্টা করবো। ওয়াভেল বলছেন, "He (Gandhi) is an exceedingly shrewd, obstinate, domineering, double-tongued, single-minded politician; and there is little true saintliness in him". (ঐ পৃঃ ৪২৯)। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, "ঠিক এই কথাই ত্রিশের দশকে বলে গেছেন উইলিংডন।" (ঐ-পৃঃ ৪২৯। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের আশা-আকাংখা, কৃষ্টি-সভ্যতা ও ধনপ্রাণ নিয়ে গান্ধীজী যে-ভাবে ছেলেখেলা করেছেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুদের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু তা বলে ইংরেজ শাসককুলের গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার কটু কাটব্য করার অধিকার ছিল না। কারণ,

গান্ধীজীর দ্বারা ইংরেজ সরকারের কোনই ক্ষতি হয়নি; বরং পরোক্ষভাবে, "রাজ" নানাভাবে লাভবানই হয়েছিল। গান্ধীজী কংগ্রেসকে দিয়ে ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়ার পর বা আগে স্বরাজের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কোথাও তিনি বলেননি, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাক। তিনি সব সময়ই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের পক্ষেই ছিলেন। তদুপরি ইংরেজরা যখনই যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার একটু আধটু অদলবদল করে তিনি সবসময়ই তার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, যেমন ভারত-ইউনিয়নের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন; আবার যখন সে-প্রস্তাবের পরিবর্তে ইংরেজরা দেশভাগের প্রস্তাব দিলেন, তা-ও তিনি সমর্থন করেছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তিনি ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কেন? সে-প্রস্তাবে কি ইংরেজকে ভারত থেকে চলে যাবার কথা ছিল না? আপতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে; কিন্তু আসলে সে-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সে-ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে কিছু কথা বলেছি। গান্ধীজীর আগষ্ট আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন যদি কোন পাঠকের জানার আগ্রহ থাকে তবে অনুরোধ করবো, তিনি যেন দয়া করে মৎ-প্রণীত "স্বাধীনতা সৈনিকের ডায়েরী"-র অন্তর্ভুক্ত "গান্ধীজীর আগষ্ট আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্র বসু" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

ঠিক একইভাবে, সত্য এবং অহিংসার একজন নবতর অবতার হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থন থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বভাবে মুসলিম-তোষণ করে গেছেন। এতো করেও কিন্তু তিনি মুসলমানদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি যেমন পারেননি ইংরেজ শাসকের মন-পরিবর্তন ঘটাতে। খিলাফৎ-আন্দোলন-খ্যাত মহম্মদ আলী গান্ধীজী সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করতেন তা তার একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি পড়লেই বুঝা যাবে। তিনি বলছেন, "মুসলমানদের মধ্যে নিকৃষ্ঠতম মানুষটিকেও আমি মিঃ গান্ধীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।" এতেও তাঁর সম্বিত ফিরে আসেনি। অহিংসার অবতার হওয়ার অন্ধ মোহ থেকে কোনদিন নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। সত্য এবং অহিংসার পথে চলতে গেলে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধর্মাচরণ করার প্রয়োজন হয়, সে-পথে তিনি কোনদিন চলেননি, শুধু চলার ভান করেছেন মাত্র। তাই তিনি ঘর বা পর, কারুরই মিত্র হতে পারেননি। এর একমাত্র কারণ তিনি "চালাকী দ্বারা" কিস্তি মাত করতে চেয়েছিলেন।

এবার আমরা পূর্বকথায় ফিরে যাবো। কংগ্রেসের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়াই কাল হয়েছিল। অর্থাৎ বৃটিশ যে-জাল পেতেছিল বা টোপ দিয়েছিল তাতে পা দিয়ে বা গলধকরণ করে কংগ্রেস আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। সেদিনও কিন্তু গান্ধীজী কংগেসকে সঠিক পথ দেখাননি।

তিনি কি জানতেন না, যে ব্যঘ্র একবার মনুষ্যরক্তের স্বাদ পায় সে আর অন্যপ্রাণীর রক্ত পছন্দ করে না? এই দেখুন না, যেখানে কোন মালপানির আকর্ষণ ছিল না, শুধুমাত্র কংগ্রেসকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্যে গান্ধীজী নিজে কত ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছিলেন অথচ যেখানে (অর্থাৎ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারে) ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে মালপানির তীব্র আকর্ষণ ছিল সেখানে গান্ধীজী নেহেরুজীকে কোন্ যুক্তিবলে অন্তর্বর্তী (Interim Government) সরকারে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন? আমার বিশ্বাস, প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সেদিন যদি কংগ্রেস Interim Government-এ যোগ না দিত তবে বোধ হয় ক্ষমতা ও মালপানির লোভে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দেশবিভাগকে মেনে নিয়ে ক্ষমতার আসনকে পাকা করবার মানসিকতা প্যাটেল-নেহেরু জুটির (যারা ছিলেন গান্ধীজীর পর কংগ্রেসের Seconds-in-Command) সৃষ্টি হতো না এবং দেশও ভাগ হতো না।

নেহেরুজীর মতো গোবিন্দবল্লভ পন্থও ছিলেন গান্ধীজীর একান্ত অনুগত। নেহেরুজী ছিলেন গান্ধীজীর বহিরাবরণ, আর পন্থজী তাঁর সব অপকর্মের দোসর। ১৯৩৯ সালে এই পন্থজীকে দিয়েই এ.আই.সি.সি.-র সভায় গান্ধীজী নেপথ্যে থেকে এক প্রস্তাব পাশ করান। তাতে বলা হয়, সুভাষচন্দ্র যখন তার ওয়ার্কিং কমিটি (Working Committee) গঠন করবেন, তখন যেন তাতে গান্ধীজীর সম্মতি থাকে অর্থাৎ গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র যেন ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন ব্যক্তিকে সদস্য না করেন। এর পরিণতি কী হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এবারও ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত দেশবিভাগের প্রস্তাবটি এ.আই.সি.সি-কে দিয়ে পাশ করিয়ে নেবার জন্যে সেই গোবিন্দবল্লভ পন্থের ডাক পড়লো। তিনি ১৯৪৭, ১৪ই জুন সভায় প্রস্তাবটি পেশ করলেন এবং ১৫ই জুনের ভোটাভুটিতে ১৫৭/২৯ ভোটে সেটি পাশ হলো। আর নিরপেক্ষ ছিলেন ৩২ জন। পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এই প্রস্তাবের জোর বিরোধীতা করে বলেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত দুর্বলতা ও হতাশার প্রকাশ। (ত্রিপাঠী পৃঃ ৪৯৭-৯৮)।

কংগ্রেসের দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মাউন্টব্যাটেন সাহেব গির্জায় গিয়ে Special Service-এর ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি যে এ্যাটলি সাহেবের সাথে কথা বলেছিলেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ যে তাঁর অনুমতি নিয়েই এক বছর এগিয়ে এনে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ধার্য করেছিলেন সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বক্তব্যের সমর্থনে কেউ যদি কোন প্রমাণ চান তা আমি দিতে পারবো না। তবে ঘটনার পারম্পর্য বিচার করলে দেখা যাবে, ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা আমার এ-বক্তব্য একেবারে বাতিল করে দিতে

পারবেন না। তদানিন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি সাহেব ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গবর্ণর জেনারেলরূপে ওয়াভেলের স্থানাভিষিক্ত করে নিয়োগপত্র দিলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ এবং মাউন্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বেই নিয়োগপত্রের সর্তানুযায়ী এ্যাটলি ২০শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮ জুনের মধ্যেই বৃটেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। সাথে সাথে আরও ঘোষণা করলেন যে " ভারতীয়রা যদি ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে পুরো প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচনা করতে না পারে (সোজা কথা, লীগ যদি যোগ না দেয়) তবে ... 'H.M.G. will have to consider to whom the power of the Central Government in British India should be handed over, on the due date, whether as a whole to some form of Central Government for British India or in some areas to the existing Provincial Government, or in such other way as may seem most reasonable and in the best interests of the Indian people'. সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হল ওয়াভেল বিদায় নিচ্ছেন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন। তিনি বৃটিশ ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দেশীয় রাজ্যের সংগে বৃটেনের সম্পর্ক (Paramountcy) চলবে আগেকার মত।" (ত্রিপাঠী পৃঃ ৪৫৯)। লীগ যে পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন বন্দোবস্তে রাজি নয়, তা তো এ্যাটালি সাহেবের জানাই ছিল। তবুও নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমান করার জন্যে 'যদি ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতীয়রা পুরো প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচনা করতে সমর্থ না হয়' শর্তটি জুড়ে দিলেন এবং প্রকারান্তরে কংগ্রেসকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন ঃ হয় তোমরা দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নাও (সেক্ষেত্রে যদি কিছু অদলবদল করতে চাও তা না হয় মেনে নেয়া যাবে) এবং স্বাধীনতা ভোগ কর, অন্যথায় নির্দিষ্ট দিনের পর আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কার হাতে তুলে দেবো এবং কীভাবে দেবো তা আমাদের উপর নির্ভর করবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের আর কোন বক্তব্য শোনা হবে না। স্বাধীন হওয়ার এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ দেয়া গেলো। আরও একটি কথা মনে রেখো, দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে বর্তমানে আমাদের যে-রকম সম্পর্ক আছে ঠিক তেমনি বজায় থাকবে। সেক্ষেত্রেও তোমাদের কোন বক্তব্য থাকবে না। অর্থাৎ সেদিন ভারতের বুকে আমরা যে লঙ্কাকাণ্ড সৃষ্টি করবো সে কথাটি মাথায় রেখে তোমরা সিদ্ধান্ত নিও। পূর্বোক্ত এ্যাটলি সাহেবের বক্তব্যের এটাই হলো আমার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা। আমি মনে করি, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই হুমকির উত্তরে সেদিন যদি কংগ্রেস তার শিরদাঁড়া সোজা করে বলতেন ঃ না, তোমাদের প্রস্তাব আমরা মানিনা, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণপরিষদ যে সংবিধান তৈরী করবে

তার হাতেই তোমাদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ আমরা কীভাবে রক্ষা করবো সে-ভার আমাদের। তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তবে আমার বিশ্বাস, দু'দিন আগে হোক, আর পিছে হোক, বৃটিশকে অখণ্ড ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হতো। যদি না করতেন, হয়তো তখন দেশে আগুন জ্বলতো, গৃহযুদ্ধের সূচনা হতো, অসংখ্য লোকের প্রাণ-হানি ঘটতো। সবই বাস্তব চিত্র। কিন্তু সে-অগ্নি-পরীক্ষা থেকে যে-ভারত উঠে আসতো তাকে কোনভাবেই বৃটিশশক্তি প্রতিহত করতে পারতো না। কিন্তু না, সেদিন কংগ্রেসের পক্ষে রুখে দাঁড়াবার কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। আমি পূর্বেই বলেছি, যতটুকু অবশিষ্ট ছিল অন্তবর্তী সরকারে (Interim Government) ঢুকে পড়ার পর তাও নিঃশেষিত হয়েছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারী এ্যাটলি সাহেবের ঘোষণার বহু পূর্বেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দেশভাগের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তো পরিস্কার ভাষায় বলেই দিয়েছিলেন, "The Independence of India cannot wait for Bengal and Punjab". এর জন্যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে যদি ভাগ করার প্রয়োজন হয়, হোক না। তা যদি না হবে তবে মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে তিন মাসের মধ্যে কংগ্রেসকে দিয়ে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করানো কোনভাবেই সম্ভব হতো না। (গবর্ণর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেন যোগ দেন ১৯৪৭-এর March মাসে, আর কংগ্রেস দেশভাগের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে ঐ সনেরই ১৫ জুনে)।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে সময় দিয়েছিলেন এক বছর চার মাস; আর মাউন্টব্যাটেন তা সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে। এতে যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সায় ছিল তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু কেন, এতো সাত তাড়াতাড়ি অর্থাৎ এই ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন প্রায় একবছর এগিয়ে আনা হলো? উত্তরে বলবো ঃ ১৫ই জুন কংগ্রেসের ভারত-বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেয়ার সাথে সাথে একদিকে যেমন শাসকগোষ্ঠী আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, অপরদিকে দেশবাসী শোকে, দুঃখে হতবাক হয়েছিল। যে-কথা তারা কোনদিন চিন্তায়ও আনতে পারেনি, অচিরে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে দেখে তাদের ক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, সে দিনগুলোতে দেশের যে-সব পত্রিকা জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত ছিল তারা তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। সবচেয়ে দেশবাসী হতাশ হয়েছিল গান্ধীজীর নেতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে যে-সব প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছিল, তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। এই অসংগঠিত প্রতিবাদ সংগঠিত হওয়া এবং দেশবাসীর ক্ষোভ দানাবাঁধার

পূর্বেই যাতে দেশভাগের কাজটি সম্পন্ন করা যায় তার জন্যে শাসকগোষ্ঠী বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করতে রাজি ছিলেন না। তারা জানতেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ একটু দেরী হলে ভারতবর্ষের আর কোন-ও প্রান্তে না হোক, অন্ততঃ বাংলা ও পাঞ্জাবে অচিরেই এই ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হবে এবং সে-বিক্ষোভ কী আকার ধারণ করবে তা বৃটিশের অজানা ছিলনা। তখন দেশবাসী এবং বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চাপে পড়ে কংগ্রেসের পক্ষে তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা ছিল ১০০ ভাগের ১০০ ভাগ। তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের গৌরব হারিয়ে এবং একেবারে পর্যুদস্ত পরাজিত সৈনিকের কলংক মাথায় নিয়ে বৃটিশ সিংহকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হতো। আমার মতে, এটাই ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এক বছর এগিয়ে আনার প্রকৃত কারণ। অন্য যে-সব কারণ দেখানো হয় বা হয়েছে তার সবটাই প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক।

এরপর আমরা কথা বলবো, গান্ধীজীর অহিংসনীতি ও তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু রাশিয়ার লিও টলষ্টয়কে নিয়ে। প্রথমেই জেনে রাখা ভাল, টলষ্টয় ভারতবর্ষ থেকেই সত্য ও অহিংসার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী এ-ও জানতেন, এই ভারতবর্ষেই অহিংসার অবতার তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল, জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ। এতৎসত্বেও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সেই বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে টপকে গান্ধীজী কেন সুদূর রাশিয়ার টলষ্টয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন অহিংসার শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং কেনই বা তিনি তাঁকে তার গুরু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন? এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়, জানি। কিন্তু সব ব্যাপারেই যেমন আমি আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও মত প্রকাশ করে যাচ্ছি তেমনি এব্যাপারে-ও আমি আমার মত প্রকাশ করছি। তা গ্রহণ করা বা না-করা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিবেচনার বিষয়, আমার নয়; আমি মত প্রকাশ করেই খালাস। গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক। গান্ধীজীর একমাত্র ইচ্ছে বা আকাংখা ছিল ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে নিজেকে একজন সত্য ও অহিংসার অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করা। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। অন্যভাবে বলা চলে, তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধদেব হতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বা রামকৃষ্ণদেবকে যদি তিনি তাঁর আদর্শ বলে স্বীকার করেন তবে তাকে বলতে হতো "ধম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তাঁর দ্বিতীয় বুদ্ধ হবার স্বপ্ন অংকুরেই বিনাশ হতো, তখন তিনি অন্যান্যদের মতো আর একজন বুদ্ধের অনুগামী বলে পরিচিত হতেন মাত্র। এটা তিনি চাননি। কারণ, এক আকাশে দুটি সূর্যের অবস্থিতি যে সম্ভব নয়, তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তাঁকে সুদূর রাশিয়ার লিও টলষ্টয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল যাঁর সম্বন্ধে সাধারণ ভারতবাসী কিছুই জানে না। রাশিয়ার যেমন টলস্টয় অহিংসার পূজারী হিসেবে পরিচিত

ছিলেন, গান্ধীজীও তাঁরই অনুকরণে ভারতবর্ষে তদ্রুপ পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর সৃষ্টিকর্তা তাঁকে বহুভাবে সাহায্য করলেও এক্ষেত্রে ছিলেন বাম। শতচেষ্টা করেও তিনি তাঁর অভীষ্টে পৌছুতে পারেননি। কারণ, তিনি একসংগে একাধিক নৌকায় পা রেখে এগুতে চেয়েছিলেন, যা কোনদিন কারুর পক্ষে সম্ভব হয়নি বা কোনদিন সম্ভব হবেও না। আরও একটু পরিস্কার করে বলতে গেলে বলা চলে, যেহেতু তিনি অতি চতুরালী বা চালাকীর আশ্রয় নিয়েছিলেন তাই তাঁর পক্ষে এগুনো সম্ভব হয়নি। একদিকে তিনি ভারতবাসীকে 'এক বৎসরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবেন বা ভারতবর্ষের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা' বলছেন, অপরদিকে তিনি শাসকগোষ্ঠীকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তোমরা ঘাবরিও না, ভারতবর্ষ কোনদিন হিংসার পথে যাবে না, অন্তত 'আমি যতদিন বেঁচে আছি।' মুসলমানদের বলছেন, তোমরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সামিল হও, অবশ্যই অহিংস পথে—আমি তোমাদের খিলাফৎ আন্দলন সমর্থনের সাথে সাথে অন্যান্য দাবী দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবো। হায় গান্ধীজী! 'জেহাদ' ভিন্ন মুসলমানরা যে অন্য কিছু বিশ্বাস করে না, তা তাঁর চেয়ে আর কি কেউ বেশী জানতেন? তবু তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র তাঁর নিজস্ব ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে তুলে ধরবার জন্যে। এভাবে ইংরেজ-তোষণ ও মুসলীম-তোষণের ফল যে কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা আজ আর কারো অজানা নেই। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪। অতঃপর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী শোনা গেল, গান্ধীজী দিল্লীর এক প্রার্থনা সভায় কোন্ এক নাথুরাম গড্‌সের গুলিতে নিহত হয়েছেন। তখন আমি ইতিমধ্যেই বাস্তুহারা হয়ে মা ও ভাইবোনদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার চন্দননগরে একটি বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করছিলাম। বাবা তখনো ময়মনসিংহ শহরে রয়ে গেছেন। চূড়ান্তভাবে দেশত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেদিন আমার মনের অবস্থা কীরূপ ছিল, আজ আর তা মনে নেই। তবে পরের দিনের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়-র শিরোনামটা আজ-ও আমার মনে গেঁথে আছে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। "If you have tears, shed them now" শিরোনামটি ছিল এরূপ। দেশবিভাগের আগেপরে দেশবাসীর দেহ থেকে যে পরিমান চোখের জল ও তাজা রক্তের ধারা বইছিল গান্ধীজীর রক্ত ঝরার মধ্য দিয়ে কি সেই চোখের জল ও রক্ত-ধারা বন্ধ হয়েছিল? মুসলীম-তোষণ-নীতির যিনি জনক ছিলেন তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে কি সেই তোষণ-নীতি বন্ধ হয়েছিল? নাকি তাঁর শিষ্য নেহেরুজী আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? একদিন ইতিহাস নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

## স্বর্গীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

গান্ধীজীর জীবদ্দশায় নেহেরুজীর একমাত্র কাজ ছিল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলা এবং তাঁর ইচ্ছা বা কার্যপ্রণালীকে বাস্তবায়ন করা। বাহ্যত পণ্ডিতজীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও কার্যত তিনি ছিলেন গান্ধীজীর প্রতিচ্ছবি মাত্র। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেহেরুজীর পক্ষে কিছু বলা বা করা ছিল সাধ্যের অতীত। গান্ধীজীর ভাষায় শুনুন, "Jawaharlal has been risisting me ever since he fell into my net. You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. It is just as difficult to divide us. I have always said that not Rajaji, nor Sardar Vallabhbhai, but Jawaharlal will be my successor. He says whatever is uppermost in his mind, but he always does what I want". (Tripathi, p-304). আশা করি, এ উদ্ধৃতিটি পড়ার পর, গান্ধীজী ও নেহেরুজী যে অভিন্ন ছিলেন সেকথা বুঝতে কারুর অসুবিধা হবে না। দেশ-ভাগের জন্যে নেহেরু-প্যাটেল অথবা গান্ধীজী, কে দায়ী ছিলেন সেকথা জানা যাবে স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্বীয় উক্তি থেকে। তিনি বলছেন ঃ সত্য হল এই যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং বছরের পর বছর ধরে বৃদ্ধ-ও হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মধ্যে খুবই অল্প কয়েকজন আবার জেলে যেতে প্রস্তুত ছিল—যদি আমাদের অখণ্ড ভারতের জন্যে দাঁড়াতে হতো ত-হলে জেল ছিল অবধারিত।.,... কিন্তু গান্ধীজী যদি আমাদের না বলতেন তাহলে আমাদের মারামারিই করতে হতো এবং অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু আমরা বিভাজনই মেনে নিই। (দি লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ—লিওনার্ড মস্‌লে। পৃঃ ২৪৮। সৌজন্যে ঃ বিশ্ব হিন্দু বার্তা, ভাদ্র ১৯০৪)। নেহেরুজীর এ-বক্তব্য শোনার পর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না যে, গান্ধীজী যদি দেশ-বিভাগের পক্ষে সম্মতি না জানাতেন তবে দেশভাগ হতো না, পরে কী হতো সে পরের কথা। কিন্তু কেন তিনি এই সর্বনাশা পথে এগুলেন? তিনি কি জানতেন না, তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তা দেশবাসীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা? উত্তরে বলবো ঃ বিলক্ষণ তিনি জানতেন। তাঁর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অত্যন্ত সোজা সত্য কথাটি বুঝতে পারেননি তা কোন যুক্তি দিয়েই মেনে নেয়া যায় না। তবু-ও তিনি বিভাজনকে সমর্থন করলেন তার একমাত্র কারণ আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি পৃথিবীর বুকে তার একজন অহিংসার অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন। সে-আশা তখনো তার ছিল। ভারতের হিন্দুদের তিনি অনেক পূর্বেই কুক্ষিগত করেছিলেন। বাকী ছিল ইংরেজ ও মুসলমান সমাজ। গান্ধীজী ১৯৪৭ সালের ২৮ জুন মাউন্টব্যাটেনকে ভারতীয় ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের সমর্থনে এক চিঠি দেন। তা ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তাতে যখন মাউন্টব্যাটেনের নিকট থেকে কোনরূপ ইতিবাচক সাড়া পেলেন না তখন তিনি বুঝলেন, ইংরেজ

ও মুসলমানদের সমর্থন পেতে হলে তাকে দেশ-বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিতেই হবে, নতুবা ঐ দুই শক্তির নিকট তিনি গ্রহণযোগ্য হবেন না; আর তাঁর অহিংসার অবতার হওয়ার স্বপ্নও সফল হবে না। এতে যদি দেশ খণ্ড খণ্ড হয় এবং হিন্দুরা সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করে তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। বিশ্ববাসীর নিকট তার অহিংসার ধ্বজা তো পত পত করে উড়বে। হায় গান্ধীজী! ইংরেজ ও মুসলমানদের চরিত্র বুঝতে তখনো তাঁর অনেক বাকী ছিল। তাই দেশভাগ হবার পরও তিনি (মূর্খের স্বর্গে বাস করে) একসময় ঘোষণা করেছিলেন, বাকী জীবনটা তিনি পাকিস্তানে যেয়েই কাটাবেন। হিন্দুদের ভরাডুবি ও দেশভাগ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল, এবার অন্ততঃ ইংরেজ ও মুসলমানরা তাঁকে একজন সত্যিকারের অহিংস ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু তিনি তা পাননি, বরং পেয়েছিলেন উপেক্ষা এবং প্রত্যাখ্যান। যাক সে কথা, এবার আমরা পণ্ডিতজীর কথায় ফিরে যাই।

গান্ধীজী না হয় তাঁর দুরাকাংখা চরিতার্থ করার জন্যে সর্বপ্রকার ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়েছিলেন, নেহেরুজী কেন 'রাজা' হবার জন্যে দেশবিভাগের মতো একটা জঘন্য কাজ করলেন? দেশ-বিভাগের পর কেন তিনি খণ্ডিত ভারতকে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেন? কেন তিনি পাকিস্তানে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের ধর্ম-ধন-মান-প্রাণ রক্ষার জন্যে কোন ব্যবস্থা নিলেন না? ক্ষমতার লোভে না হয় দেশভাগ করেছিলেন, কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে যখন দেশভাগ হয়েছিল পাকিস্তানে বসবাসকারী অমুসলমানদের সেই উপাসনা-পদ্ধতি রক্ষার জন্যে কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা কেন করলেন না? কেন তিনি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন না ঃ তোমরা তোমাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি যেরূপ আচরণ করবে, আমরাও আমাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি তদ্রুপ আচরণই করবো? এ-কথায় যদি তারা কোনরূপ ইতিবাচক সাড়া না দিতেন তবে কেন তিনি আম্বেদকরের কথা শুনে লোকবিনিময়ের নীতি গ্রহণ করলেন না? পক্ষান্তরে, নেহেরুজী খণ্ডিত ভারতকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ (উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষও বলা যায়) রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্বের দরবারে নিজের ঔদার্য ও মহানুভবতা প্রমান করার চেষ্টা করলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যের মতই কাজ করলেন। একজন হতে চেয়েছিলেন অহিংসার অবতার, অপরজন বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন একজন শান্তির দূত হিসেবে! এর বিনিময়ে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে মূল্য দিতে হয়েছিল এবং আজো দিতে হচ্ছে সেদিকে তিনি এবং তার বংশধররা কোনদিন দৃষ্টিপাত করেননি। এখানেই শেষ নয়। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে তার ও তার

বংশধরদের আজও চেষ্টার অবধি নেই। **একদিকে ভারতের মুসলমানরা জামাই আদরে প্রতিপালিত হচ্ছে, অপরদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুরা সর্বপ্রকার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষটা কি গান্ধী-নেহেরুর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, যে-ভাবে খুশী তারা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের উপাসনাপদ্ধতি, ধন-মান-প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন?** হাজার বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে-সব ভারত-সন্তান তাঁদের তাজা রক্ত দেশমাতৃকার বেদীমূলে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁদের সেই আত্মাহুতির প্রতি সেদিন যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাদের একদিন ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে যেয়ে দাঁড়াতেই হবে। ইতিহাস কারুর পক্ষে কথা বলে না—সে তার নিজ পথ ধরে চলে।

গুরু-শিষ্যের মধ্যে মানসিকতার দিক দিয়ে কী আশ্চর্য রকমের মিল ছিল এখানে তার মাত্র দু'টি উদাহরণ দেবো—একটি সুভাষকে নিয়ে, আরেকটি দেশভাগ ও কালোবাজারীদের নিয়ে।

১। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পর যে-গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "After all Subhas Babu is not an enemy of the country..." সেই গান্ধীজী পরবর্তী কালে লুই ফিশারের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "I regard Bose as a patriot of patriots...."

গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে-নেহেরুজী একদিন ঘোষণা করেছিলেন, বিদেশের সাহায্যে সুভাষ যদি তাঁর মুক্তিফৌজ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে তবে তিনি রুখে দাঁড়াবেন, সেই নেহেরুজী ১৯৪৫ সালের যুদ্ধ-শেষে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যখন দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপ্রধানের (শা'নওয়াজ খান, জি.এস.ধীলন ও সেগল) যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে বিচার আরম্ভ করলো, সর্বপ্রথম বাজার থেকে একটা সামলা কিনে কিংবা কারুর কাছ থেকে ধার করে তাঁদের পক্ষের উকীল হিসেবে হাজির হলেন!

২। আবার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথার সাথে সাথে দেশ বিভাগের কথা যখন চলছিল তখন গান্ধীজী বলেছিলেন, যদি দেশভাগ হয় তবে একমাত্র তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে—তাঁর জীবিত অবস্থায় হবে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেলো তাঁর জীবিত অবস্থায় এবং তাঁর সম্মতিতেই দেশ-ভাগ হলো।

নেহেরুজীও বলেছিলেন, "ক্ষমতায় আসার পর আমার প্রথম কাজই হবে, কালোবাজারীদের ধরে ধরে নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্টে (Lamp Post) ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া।" কিন্তু হায়! ক্ষমতায় আসার পর কোন কালোবাজারীকে

ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলাবার পূর্বেই তারা নেহেরুজীকে ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলিয়ে দিলো! তাদেরকে আর ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলানো গেলো না। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগ হবার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন ডঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ। তিনি অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। নেহেরুজীর বক্তব্য বিশ্বাস করে তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীকে খুব দ্রুত পাকড়াও করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নতুন দিল্লীর নির্দেশে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলে যায়! নতুন দিল্লীর মসনদে তখন স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সমাসীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে , কে কাকে ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলিয়েছিল।

এই ঘটনা দিয়েই পণ্ডিতজী তার কার্যভার আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজীর বৃটিশপ্রীতি বা প্রেম, যাই বলুন না কেন, এতই উগ্র ছিল খণ্ডিত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে (যার নেতৃত্বে দেশের দফা রফা হয়েছিল) মনোনীত করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থায়-ও কেন তিনি অতবড়ো আসনটিতে কোন ভারতবাসীকে বসালেন না? এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তিনি বহুবার বলেছেন, "By accident I am a Hindu, Culturally I am a Muslim and in Education I am an English." তদুপরি, মাউন্টব্যাটেন দম্পতির প্রভাব তার উপর কীরূপ ছিল তার প্রমাণ আমরা একটু পড়েই পাবো।

দেশভাগ হবার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং সাময়িকভাবে ভারতে যোগ না দিয়ে স্বাধীনভাবে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সুযোগে পাকিস্তান হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করে বসলো। তখন হরি সিং আর কালবিলম্ব না করে ভারতের সাথে সংযুক্তির চুক্তিপত্র সই করলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান গিলগিটসহ কাশ্মীরের অর্দ্ধেক অংশ দখল করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এসে পাকিস্তানের অগ্রগতিই শুধু রোধ করেনি তাদের অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশ পুনর্দখলও করেছে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত ও কাশ্মীর থেকে তাদের বিতারণের জন্যে ভারতীয় বাহিনী তাদের অগ্রগতি বহাল রেখেছিল। ঠিক সেই মুহুর্তে সেনাবাহিনীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মাউন্টব্যাটেন দম্পতির পরামর্শে নেহেরু সাহেব রাষ্ট্রসংঘে যেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। ফলশ্রুতি হিসাবে কাশ্মীর সমস্যার তো সমাধান হলোই না, সেদিন থেকে ভারতীয় জওয়ান ও কাশ্মিরী হিন্দুদের ধমনি থেকে যেভাবে রক্তঝরা শুরু হয়েছিল তা আজও সমানভাবে ঝরে চলেছে। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতজীর ভ্রাতৃপ্রতীম শেখ আব্দুল্লা এবং পরবর্তীকালে তদীয় পুত্র ফারুক আবদুল্লার যোগসাজসে কাশ্মিরী মুসলমানরা

পুরো কাশ্মীর উপত্যাকার হিন্দুদের ধন সম্পত্তি লুটপাট করে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে এবং নারী-নির্যাতন করে কাশ্মীর থেকে চলে যেতে বাধ্য করলো। এখন তারা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মুর বিভিন্ন স্থানে তাবু খাটিয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছে। কাশ্মীর থেকে হিন্দুদের বিতারণপর্ব শেষ করে এবার তারা জম্মুর দিকে নজর দিয়েছে এবং সেখানেও হিন্দু-নিধন ও বিতারণপর্ব শুরু হয়েছে। পক্ষান্তরে, সেদিন যদি পণ্ডিতজী ভারতীয় সেনাপ্রধানের পরামর্শ গ্রহণ করে মাত্র একসপ্তাহ অপেক্ষা করতেন এবং সৈন্যবাহিনীকে তাদের কাজ করতে দিতেন তবে দখলীকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের চুড়ান্তভাবে তাড়িয়ে দিতে কোনই অসুবিধা হতো না এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে কাশ্মিরী হিন্দুদের এভাবে তাদের ধন-প্রাণ-মান জলাঞ্জলি দিতে হতো না। জম্মু ও কাশ্মীরে পণ্ডিতজী আরও একটি কাজ করেছেন। তার ভ্রাতৃপ্রতীম শেখ আবদুল্লাকে খুশী করার জন্যে ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা যোগ করে কাশ্মিরীদের জন্যে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার সংস্থান রেখেছেন যা দেশের অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে, মূল ভারত-ভূখণ্ডের বিভাজনের পর কাশ্মিরীদের মনে, বিশেষ করে কাশ্মিরী মুসলমানদের মনে, আর একবার বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রোপণ করলেন যা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর পণ্ডিতজী আমাদের শেখালেন "হিন্দি-চিনি ভাই ভাই" বলতে; আর চিনারা তাদের দেশবাসীকে বলতে শেখালেন "তিব্বত আমাদের চাই-ই চাই"। তারপর চিন সরকার সবার অতর্কিতে একদিন তিব্বত দখল করে নিল। পণ্ডিতজী সক্রিয় কোন বাধা দিলেন না। যতদিন ভারতবর্ষ বৃটিশের দখলে ছিল ততদিন চিন তিব্বতকে আক্রমণ করতে সাহস করেনি। তিব্বত ভারত ও চিনের মধ্যে একটি বাফার ষ্টেটের কাজকরে যাচ্ছিল। কিন্তু যেই-মাত্র বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করলো অমনি চিনারা তিব্বতের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে দখল করে নিল। সাথে সাথে ভারতের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হলো। তার প্রমাণ, অনতিবিলম্বেই (১৯৬২ খৃস্টাব্দে) চিনারা ভারত আক্রমণ করে তার কয়েক হাজার বর্গমাইল জমি দখল করলো, যা আজ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলো না। সাথে সাথে আর-ও বড় রকমের একটি পরিবর্তন ঘটলো তিব্বতীদের জীবনে। তিব্বতের ধর্মগুরু মহামান্য দালাই লামাকে তাঁর সব অনুগামী সহ দেশত্যাগ করে ভারতে এসে আশ্রয় নিতে হলো। ফলশ্রুতি হিসেবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তিব্বত কম্যুনিষ্ট তিব্বতে পরিণত হলো। তাদের ধর্মকর্ম রসাতলে গেলো।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্যে মুখে মিশ্র অর্থনীতির কথা বল্লেও কার্যতঃ নেহেরুজী কম্যুনিষ্ট অর্থনীতিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তার নাম সোজাসুজি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি না বলে 'সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ন অব

ইকনমি' (Socialistic Pattern of Economy) বল্লেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা চলে, তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দিকেই ঝুঁকে পড়লেন এবং Licence-Quota-Permit- রাজের প্রবর্তন করলেন। ফল দাঁড়ালো এই ঃ যারা মুক্ত অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাদেরও কোন নতুন শিল্প-প্রকল্প চালু কিংবা পুরানো শিল্পের প্রসার ঘটাতে হলে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই অনুমোদন পেতে হলে কোন উদ্যোগীকে (Entreprencur) যে মূল্য দিতে হতো তা আজ আর কারু অজানা নেই। এই দেয়া-নেয়ার ব্যাপার চালু হবার পর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দেশকে গ্রাস করলো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লো। কার্যতঃ দেশের সার্বিক উন্নতি বলতে যা বুঝায় তা ঘটলো না; দিনের পর দিন গরীব আরো গরীব হতে লাগলো, বড়লোক আরো বড় হতে লাগলো। এই অর্থনীতি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রে যখন নরসিংহ রাও সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকে এই নিয়মের শিথিলতা আরম্ভ হলো এবং দেশকে বাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা হলো। সেই প্রক্রিয়া পরবর্তীকালের সব সরকারই মেনে চলছেন। এ-ব্যাপারে সর্বশ্রী নরসিংহ রাও ও ডঃ মনমোহন সিংকে পথিকৃত বলা চলে। সর্বশেষ বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারও একই নীতি মেনে চলছে এবং অর্থনীতির উদারিকরণের কাজ দ্রুতগতিতে করে যাচ্ছে। এর ফলাফল কী দাঁড়াবে সে ব্যাপারে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি।

খণ্ডিত ভারতকে উপাসনা-পদ্ধতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার অধিকার যে পণ্ডিতজীর ছিল না, তা নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা কিছু কথা বলেছি। এখন আমরা কথা বলবো; তার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ছিলেন না, ছিলেন মুসলীম সম্প্রদায়ের পক্ষে। কেন তিনি মুসলমান উপাসনা-পদ্ধতির লোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন? এর কারণ দুটি। প্রথম কারণ ভোট ব্যাংক, আর দ্বিতীয় কারণ, মুসলীম-প্রীতি।

প্রথম কারণ ঃ পণ্ডিতজী তার গুরুমহাশয়ের মত ধরেই নিয়েছিলেন (taken for granted) যে নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করা ছাড়া হিন্দুদের অন্য কোন পথ নেই। কারণ দেশ-বিভাগের ন্যায় অতো বড়ো একটা সর্বনাশ করা সত্বেও দেশে তখন কংগ্রেসের কোন বিকল্প দল ছিল না যাদেরকে দেশবাসী ভোটে সমর্থন করতে পারে। এই সুযোগ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি নিয়েছিল। এতোদিন ভারতবর্ষের মানুষ কংগ্রেসকেই তাদের মুখপাত্র বলে মনে করতো। তাই অন্য কোন বিকল্পের কথা তারা ভাবেনি, ভাবেনি দেশ ও জাতির প্রতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করবে! তাই দেশ ভাগের পর হিন্দুদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে কংগ্রেসের কোনই

মাথাব্যথা ছিল না, ছিল কীভাবে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলীমদের, ভোটব্যাংক অটুট থাকে তার দিকে। এবং মুসলমান ভোটব্যাংক নিশ্চিত করার জন্যে পণ্ডিতজী নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আমরা সে-কথায় একটু পরেই যাচ্ছি।

দ্বিতীয় কারণ ঃ যে পণ্ডিতজী একদিন ভারতবাসীর শিক্ষা-নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন, সেই মানুষটি যখন ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন তখন তার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল শিক্ষার দিক দিয়ে সমস্ত ভারতবাসীকে অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি সেপথে গেলেন না। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতজী নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "Culturally I am a Muslim and in Education I am an English". একজন ভারতীয় হয়ে যিনি একথা বলতে পারেন বা বিশ্বাস করেন তিনি যে ভারতীয় সভ্যতা এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে এগিয়ে নেবার জন্যে যত্নবান হবেন না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই! পক্ষান্তরে, যিনি নিজের জন্মের ব্যাপারে বলতে পারেন "I am a Hindu by accident" (যার উপর তার কোনই হাত ছিল না), তার এবং তার বংশধরদের কাছ থেকে হিন্দুদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যাপারে তাদের যে কিছুই আশা করার নেই এই সোজা-সরল কথাটি বুঝতে হিন্দুস্থানের হিন্দুদের বুঝে উঠতে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। এখন দেখা যাক, কীভাবে তিনি তার অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

(ক) একদিকে একটা জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে যেমন তার কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে সম্যক পরিচয় ও পঠন-পাঠনের প্রয়োজন হয়, অপর দিকে ঠিক তেমনি তাকে বিনষ্টির পথে ঠেলে দিতে হলে তার কৃষ্টি ও সভ্যতার মূলে আঘাত হানতে হয়। পণ্ডিতজী ও তার উত্তরসূরীরা দ্বিতীয় কাজটি খুব সাফল্যের সাথে করে চলেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে। ভারতীয় সংবিধানে ২৮,২৯ ও ৩০ ধারা সংযোজন করে মুসলমান-দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে যা হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর ফলে তারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপাসনা-পদ্ধতির পঠন-পাঠন ও প্রচারের অধিকার পেয়েছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যদি তাদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলিতে হিন্দু উপাসনা-পদ্ধতির শিক্ষাদান বা প্রচারের ব্যবস্থা করেন তবে তারা সরকারী অনুদান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন; কিন্তু মুসলমানরা বঞ্চিত হবেন না। তারা যথারীতি অনুদান পাবেন। মুসলমানদের মত খৃষ্টানরা-ও সংখ্যালঘু বিধায় এ-সুযোগ পেয়ে আসছেন।

(খ) শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, উপসনা-পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে-ও অর্থাৎ হিন্দুদের ইসলাম ও খৃষ্টান উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরের

ব্যাপারেও পণ্ডিতজী কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ও খৃষ্টানদের জয়ের পতাকা পত পত করে উড়ছে; আর হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতা দিনের পর দিন বিনষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলীম-প্রীতির ন্যায় পণ্ডিতজীর খৃষ্টান-প্রীতি এমনি উগ্র ছিল যে তিনি এক দুর্বল মুহূর্তে আমেরিকার কুটনীতিবিদ জন গলব্রেথের নিকট বলেছেন "আমিই হলাম শেষ ইংরেজ যে আজ ভারত-শাসন করছে।" জন গলব্রেথের ভাষায় শুনুন, "It did not especially surprise me, when once in a relaxed moment he (Nehru) said–well, you know that I am the last Englishman to rule in India." (J.K. Galbraith, A life of our times : Memoir,Boston 1981, P. 408. Source : Organiser 23.11.97.)। তার ইংরেজ প্রীতির আরও একটি নমুনা তুলে দিচ্ছি। Jawaharlal Nehru himself stated in his court trial of 1922 : "Less than 10 years, I returned from England, after a long stay there... I had imbibed most of prejudices of Harrow and Cambridge and in my likes and dislikes I was perhaps more an Englishman than an Indian. I looked upon the world almost from an Englishman's standpoint....as much prejudiced in favour of England and the English as it was possible for an Englishman to be". (Quoted from Jawaharlal Nehru by B.R. Nanda, OUP. P. 255. Source : Ibid).

(গ) ইংরেজ-প্রীতির কিছু নমুনা পেলেন তো। এবার শুনুন পণ্ডিতজী তার দেশের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি কী ধারণা পোষণ করতেন। যুবক জওহরলাল (২১) ইংলণ্ড থেকে তার পিতার নিকট এক চিঠিতে লেখেন, "Indians were bound to have self-government but...not before a few aeons of geological time! This may mean anything between a few million years and wholly incomprehensible period. The chief difficulty was the want of education and some million generations will be required to educade them (Indians) upto the colonial standard". (Source : Organiser dated 23.11.97) অর্থাৎ ভারতবর্ষ একদিন স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই পাবে....তবে তার জন্যে তাকে কয়েক লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হবে।.... এর প্রধান কারণ ভারতের অশিক্ষা।.... আবার এই অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোতে পৌঁছেতে তাদের প্রয়োজন হবে কয়েক লক্ষ জেনারেশনের।.... তাতেও তারা শিক্ষায় বৃটিশের সমকক্ষ হবে না; হবে শুধু তাদের কলোনীগুলিতে যে-রূপ শিক্ষার মান প্রচলিত আছে তার সমান। সুতরাং আর সবকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে (যিনি বলেছেন, কোরানে যা লেখা নেই তা কোন মুসলমানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়) যে পণ্ডিতজী মনোনীত করেছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পন্ডিতজীর পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যগুলি অনুধাবন করলে একটি কথাই বেরিয়ে আসে, তা হলো প্রকৃতপক্ষেই তিনি মুসলমান ও খৃষ্টানদের বন্ধু ছিলেন এবং বন্ধু

হিসেবে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে (অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের সাহায্যে) তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যা যা করা দরকার তার সবই তিনি করেছেন। শুধু করেননি দেশের সেই সব মানুষের জন্যে যাদের অন্নে তিনি প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছিলেন এবং যাদের সমর্থনে দেশের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে যিনি এতো চিন্তিত ছিলেন তার কি উচিত ছিল না দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেদিকে সবার আগে নজর দেয়া?

(ঘ) দেশ ভাগ করার পর দেশকে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু; কিন্তু তার জনগনের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করলেন না। একটু পূর্বেই উপাসনা-পদ্ধতির আচরণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রমান পেয়েছি। এবার আমরা দেখতে পাবো সামাজিক রীতি-নীতিতে-ও তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি সমস্ত ভারত-বাসীর জন্যে অভিন্ন ফৌজদারী আইনের মতো অভিন্ন দেওয়ানী আইন চালু না করে, হিন্দুদের জন্যে 'হিন্দু কোড বিল' চালু করলেন এবং মুসলমানদের দাবী মেনে তাদেরকে তাদের 'ব্যক্তিগত আইন' মেনেই চলার অনুমতি দিলেন। ফল দাড়ালো (১) মুসলমান তাদের ব্যক্তিগত আইনের সুযোগ নিয়ে বহুবিবাহের প্রথা অটুট রাখলো এবং তাদের পরিকল্পনা মতো বংশবৃদ্ধি করে চললো যার বোঝা বইতে হলো বা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের; (২) এই লাগামহীন বংশবৃদ্ধির দ্বারা মুসলমানরা তাদের অভীষ্টের দিকে অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতকে দারুল ইসলাম অর্থাৎ মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখানে আর একবার পণ্ডিতজী সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করলেন। এর নামই কি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা কিংবা উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা যাকে সগৌরবে (প্রকৃত অর্থ না বুঝে কিংবা ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে) ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) বলা হয়? যিনি একদিন বৃটিশের সবকিছুর মধ্যেই ন্যায় এবং নীতির ছাপ লক্ষ্য করেছেন সেই দেশে কি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আইন চালু আছে? (বিঃ দ্রঃ আমি ইচ্ছে করেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির পরিবর্তে 'সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছি; কারণ ইংরেজি Secularism-এর বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা নয়)।

আজ পণ্ডিতজী বেঁচে নেই; কিন্তু তার অনুগৃহীতরা, যারা তাকে নবভারতের রূপকার বলে অভিহিত করেন, তারা বেঁচে আছেন। তাদেরকে আজ আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই ঃ তারা জেনে রাখুন, অখণ্ড ভারতবর্ষকে সম্প্রদায় ও উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে খণ্ড খণ্ড করেও যিনি ক্ষান্ত হননি, খণ্ডিত ভারতেও যিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে

দেশের শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থা বিকৃত করতে দ্বিধা করেননি, নিশ্চতরূপেই তার স্থান হবে ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে (Dustbin)। গুরু-শিষ্য-সংবাদ আর বাড়াবো না। গুরু মহাশয়ের একটি ঐতিহাসিক উক্তি দিয়েই এই কাহিনীর ইতি টানবো। গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"। আমরাও এই উক্তির প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই, পণ্ডিতজীর জীবনও তার বাণী। গান্ধীজীর শতখণ্ড এবং নেহেরুজীর বিশখণ্ডে প্রকাশিত বক্তব্যের মধ্যে তাঁদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁদের অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে, যার কিঞ্চিতন্মাত্র বিবরণ আমরা তুলে ধরলাম। কেন আমরা এ-কথা বলছি তার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মানুষের পরিচয় কিসে? তার কথায়, না কাজে? যদি 'কথায়' হয়, তবে আমাদের কিছু বলার নেই। তাঁরা দু'জনেই অনেক ভালভাল এবং বড়বড় কথা বলেছেন, আমাদের ছোট মুখে যে-সব কথা মানায় না। কিন্তু (এ-কিন্তু ছোট নয়, বেশ বড়) যদি 'কাজে' হয়, তবে দেখা যাবে, এঁদের দু'জনেরই সারাজীবনের কর্মের ফসল বিরাট দু'টি শূন্য অর্থাৎ তাঁরা কথায় যা বলেছেন, কার্যক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত আচরণ করেছেন।

তবে দেশকে যে কিছুই দিয়ে যাননি, এমন নয়। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর রামমনোহর লোহিয়া বলেছিলেন, "পণ্ডিত নেহেরু তার পরিবারের জন্যে রেখে গেলেন অতুল ঐশ্বর্য্য, আর দেশবাসীর জন্যে রেখে গেলেন দু'মুঠো ছাই"! এখানে স্মর্তব্য, নেহেরুজীর চিতাভস্ম দেশের বিভিন্ন স্থানে, প্রধানত নদ বা নদীসমূহের সঙ্গম-স্থলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রয়াত লোহিয়াজীর বক্তব্য শুনতে যতই খারাপ লাগুক, বাস্তব ঘটনা কিন্তু তাই।

*"No Wonder, harmonisation of regional forces with Hindutva is underway. They have no objection to nationalist BJP's national agenda if they are allowed a freehand to fulfil local aspirations and develop regional sub-culture and economy. Hinduism is itself a federal system. It is a commonwealth of a bewildering variety of sects. Hindutva provides a strong nationalist, Pan-Indian backbone to it.*

*"Secularists are living in fool's paradise if they think Hindutva and regionalism can't co-exist. Regionalism does not dilute but fortify Hindutva. Hindutva gains strength by stressing strong self-contented States in a stronger federation. Regionalism, which smashed the congress, cannot smash Hindutva because Hinduism itself is a federal system."* (Mr. V.P. Bhatia, Organiser, dated May 9, 1999).

# দেশ-বিভাগের চেয়ে গৃহযুদ্ধ (Civil War) ভাল ছিল

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকার দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক। "স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)" গ্রন্থের প্রণেতা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের কিছু বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি বলছেন, "১০ই আগষ্ট ১৯৪৫ জাপান আত্মসমর্পণ করল। সেই দিনই আই.এন.এ-র প্রচারমন্ত্রী এস.এ. আয়ারের মুখে খবরটা শুনলেন নেতাজী। ক্ষণেকের গভীর চিন্তার পর হাসিমুখে বললেন, 'So that is that. Now what next? Well, don't you see we are the only people who have not surrendered?' এ যে ভাগ্যাহত কর্ণ—রথচক্র মেদিনী গ্রাস করছে; শুধু পরাজয় নয়, বিনাশও আসন্ন, তবু নির্বিকার। ১৫ই আগষ্ট জাপান বেতারে আত্মসমর্পণ সংবাদের সমর্থন শুনে বসু বুঝতে পারলেন সিঙ্গাপুর ছাড়তে হবে। স্থির হ'ল, সম্ভব হলে, রাশিয়া যাবেন। সিঙ্গাপুর থেকে সায়গন। সায়গন থেকে ১৭ আগষ্ট উড়ল তাঁর বিমান। 'The rest is silence'. কি হল সঠিক আমরা আজও জানি না। যদি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়ে থাকে তবে লাতিন কবি হোরেসের ভাষায়— Dulce et decorum est Pro Patria mori (It is a sweet and seemly thing to die for one's country). কিন্তু আবার তাঁরই ভাষায়— Non omnis moriar (I shall not altogether die)." (Page 389). নেতাজীর ক্ষেত্রে এ উদ্ধৃতিটি যে একান্তভাবে প্রযোজ্য, তা বলাই বাহুল্য। নেতাজী তো সায়গন থেকে নিরুদ্দেশ হলেন। কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী"! ত্রিপাঠীজী বলে চলেছেন,"বসু তাদের (ইংরেজদের) জন্য এক সমস্যা রেখে গেলেন যা ক্রমশঃ কালবৈশাখীর মেঘের মত বড়ো হয়ে উঠল। কী করা হবে আই.এন.এ.-র বন্দী সৈন্যদের নিয়ে? ওয়াভেলের নীতি হল —"to detain the Blacks and try 'the worst of them by court martial,' to discharge the greys and to return the 'Whites' to their units." (পৃষ্ঠা-৩৮৯)।

ত্রিপাঠী মহাশয় বলছেন ঃ "...আই.এন.এ. বন্দীদের মুক্তি নিয়ে কংগ্রেস, লিগ, কম্যুনিষ্ট, সব ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা ছিল সোচ্চার। গোয়েন্দা দপ্তর জানাচ্ছে আই.এন.এ.-র প্রতি সহানুভূতিতে সব সম্প্রদায় ও শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ। ৫ নভেম্বর একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখ আই.এন.এ. বন্দীদের বিচার শুরু হল লালকেল্লায়। প্রতিবাদে আই.এন.এ

সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হল ৫-১১ নভেম্বর। ১২ই আই.এন.এ. দিবস পালিত হল। দেশপ্রিয় পার্কে শরৎ বসু, নেহেরু ও প্যাটেল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।... ২১শে নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিল চলল ডালহৌসি স্কোয়ার অভিমুখে। ধর্মতলায় মিছিলের উপর গুলি চলল। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক মুসলীম ছাত্র প্রাণ দিলেন। আহতের সংখ্যা ৫২ জন।... মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়নি তবু। পরদিন সাধারণ ধর্মঘটে কলকাতা অচল হল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড—গাড়ী ও লরি পোড়ানো স্মরণ করালো '৪২-এর দিনগুলিকে। সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের লাট কানিংহ্যাম থেকে বাংলার লাট কেসি প্রমাদ গুনলেন। দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে প্রধান সেনাপতি ও বড়লাটের তন্দ্রাও ছুটে গেল।" (ঐ পৃষ্ঠা ৩৯১-৯২)।

"সীমান্তের লাট কানিংহ্যাম পরামর্শ দিলেন—প্রধান সেনাপতি এখুনি ঘোষণা করুন ভারতের জনমত প্রচণ্ড বিরোধীতা করায় তিনি সব বিচার বাতিল করছেন। এতে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা-ভঙ্গের ভয় নেই। অন্যদিকে—'I think that everyday that passes now brings over more and more well-disposed Indians into the anti-British Camp and, whatever the outcome of the trial may be, this anti-British bias will persist in each man's mind'. ২৪ নভেম্বর ওয়াভেলের ডায়েরীতে পড়ি ভারতীয় বাহিনীর আনুগত্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকায় অচিনলেক নীতি বদলাতে রাজি এবং সেই মর্মে বিলেতের নির্দেশ চেয়েছেন। এর সমর্থন পাই জেনারেল টুকারের 'While Memory Serves' গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে শানওয়াজ, সেগল, ধীলোঁর বিচার চলবে কিন্তু বর্বরোচিত ব্যবহারের অভিযোগ ব্যতীত আর কারুর বিচার হবে না। ...কয়েক মাস পর স্বয়ং ওয়াভেল স্বীকার করেছিলেন, 'It was undoubtedly a serious blunder to place on trial first men against whom no brutality could be proved'. আই.এন.এ-র ব্যাপারে সি.পি.আই., লীগ, হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস, শিখ লীগ প্রত্যেকেই জড়িত ছিল, যদিও কংগ্রেস ছিল সর্বাধিক সোচ্চার। বহু অনুগত (বৃটিশের) পরিবারও (বিশেষতঃ পাঞ্জাবে) সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। **মৃত (?) সুভাষ জীবিত সুভাষের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী প্রতিপন্ন হয়েছিল**"। (ঐ পৃষ্ঠা ৩৯৩)।

"ইতিমধ্যে আই.এন.এ-র তিন সেনাধ্যক্ষের বিচারে (শানওয়াজ, সেগল ও ধীলোঁ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রধান সেনাপতি তা কম্যুট করার সিদ্ধান্ত নেন।" (ঐ পৃষ্ঠা ৩৯৬)। জনজীবনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং ভারতীয় সৈন্যের বিদ্রোহের ফলে তিন সেনাধ্যক্ষকে বেকসুর মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অচিনলেক।

ত্রিপাঠীজী বলছেন ঃ "R.I.N. বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী—

'এইচ.এম.আই. এন. তলোয়ারে'। ....এবং পরের দিন তা ব্যাপ্ত হয় ২২টি জাহাজে ও তীরবর্তী নৌ-সংস্থায়। ....২১এ কাসল ব্যারাকে অবরুদ্ধ নৌ-সেনা মুক্তি পাবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাধে। করাচীতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে ও 'হিন্দুস্তান' থেকে বৃটিশ সৈন্যের উপর কামান দাগা হয়। ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় কংগ্রেস ও লীগ পাতাকা উত্তোলিত হয়।

"বোম্বাই ও কলকাতা, পরে অন্যান্য শহর, প্রতিবাদ-মুখর হয়। আবার আক্রান্ত হয় সাহেবরা। থানা, ডাকঘর, ট্রাম ডিপো, খাদ্যশস্যের দেকান পোড়ান হয়। YMCA কেন্দ্রও বাদ যায়নি। ....সবসুদ্ধ ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরস্থ ঘাঁটি ও ২০,০০০-এর মত নাবিক সামিল হয়েছিল বিদ্রোহে। উপরন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, কলকাতা, যশোর ও আম্বালার ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরাও ধর্মঘট করেছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্যাটেল ও জিন্নার অনুরোধে নাবিকরা আত্মসমর্পণ করে। ....বিশেষ করে বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা ছিল লক্ষ্যণীয়।" (ঐ পৃষ্ঠা ৩৯৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজীর আই.এন.একে যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে ইংরেজরা বিচার আরম্ভ করেছিল দিল্লীর লালকেল্লায়। তার প্রতিবাদে যে-ভাবে গণবিদ্রোহ, সেনা ও নৌবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, বিস্তারিত বিবরণ ত্রিপাঠীজীর বিবরণে আমরা পাই না। কিছু না বল্লে না হয়, এই ভেবে তিনি নমো নমো করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন দেখা যাবে এ-সব বিদ্রোহের আকৃতি-প্রকৃতি ছিল কতো ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তদুপরি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ পুলিশবাহিনীর মধ্যে, বিশেষ করে বিহারে, যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার উল্লেখ পর্যন্ত ত্রিপাঠীজীর পুস্তকে নেই। এতৎসত্তেও ত্রিপাঠী সাহেব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "মৃত (?) সুভাষ জীবিত সুভাষের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী প্রতিপন্ন হয়েছিলেন"। এখন দেখবো, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী তাঁর আই.এন.এ.-র মধ্যে যে একাত্মতার বীজ বপন করেছিলেন, যথাসময়ে তা মহীরুহে পরিণত হয়ে ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইংরেজের ষড়যন্ত্রে অদূরদর্শী ও স্বার্থান্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধরা দিয়ে সেই বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন করলেন।

ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, কাজিয়া বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যাই বলুন না কেন, নতুন কোন ঘটনা নয়। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের শুরু থেকে ইংরেজ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা অপ্রতিহতগতিতে চলে আসছিল। বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান সমাজ বেশী আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা ধরেই নিয়েছিল, মুসলমানরা তো তাদের পক্ষেই আছে, হিন্দুদের ভেতর যে বিদ্রোহী ও বৈপ্লবিক শক্তি আছে তাকে দমিয়ে রাখতে পারলেই তাদের কেল্লা ফতে। কংগ্রেসকে তারা কোন শক্তির মধ্যেই গণ্য করতো না। কিন্তু

**ব্যতিক্রম ছিল ১৯৪৫ সালটা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বছরটি ছিল 'বড়ই শুভ', কিন্তু চিহ্নিত হয়ে রইলো 'কলংকিত বর্ষ-রূপে'। 'শুভ ছিল' এই কারণে, ইংরেজ শাসনে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনদিন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি, সেই হিন্দু-মুসলমান শুধুমাত্র ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নেতাজী-প্রতিষ্ঠিত আই.এন.এ. সেনাধ্যক্ষদের বিচারের প্রতিবাদে এককাট্টা হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। আর 'কলংকিত বর্ষ' এই কারণে, যে বিপ্লবের সুযোগ নেতাজী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আই.এন.এ. দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবাসীর কাছে এনে দিয়েছিল ভারতবর্ষের তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেই বিপ্লবকে সফলতার দিকে এগিয়ে না নিয়ে বিপথগামী (বা পথভ্রষ্ট, যাই বলুন না কেন) করলো।** ত্রিপাঠী সাহেবের বর্ণনা থেকেও আমরা জানতে পারি, আই.এন.এ.-র বিচারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বা তুচ্ছ করে একযোগে বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো ঃ আই.এন.এ.-র বিচার করা চলবে না, তাঁদের বিচার করার অধিকার ইংরেজের নেই। হিন্দু-শিখ-মুসলমান যাঁরাই আই.এন.এ.-তে ছিলেন তাঁরা সবাই দেশপ্রেমিক, দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং তাঁদের গায় এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত দেয়া চলবে না। প্রতিবাদ করতে যেয়ে, শুধুমাত্র ভারতবাসী হিসেবে সেদিন তারা সব কিছু কবুল করতে রাজি ছিলেন। এই ঐক্য যদি শুধুমাত্র অ-সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তা-ও না হয় কোনভাবে সামাল দেয়া যেতো। কিন্তু না, দেখা গেলো, সামরিক শক্তি, এমন কি পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান-শিখ এক হয়ে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অস্ত্র তুলে ধরেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। এমন অবস্থা যে কোনদিন সংঘটিত হতে পারে, তা শাসক গোষ্ঠীর ছিল চিন্তার-ও অতীত। তাই তারা সত্যি সত্যি প্রমাদ গনলো। এবার বুঝি দু'দিকই অর্থাৎ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য দুই-ই যায়। তাই তারা ঠিক করলো ঃ মুসলিম লীগের দাবী মেনে দেশভাগ করা হবে এবং তাদেরকে পাকিস্তান দিয়ে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবে। সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য দুটো রক্ষা করা যাবে না।

কিন্তু কোন্ পথে তারা তাদের অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যাবেন? মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবী মেনে নিলেই তো ভারতবর্ষকে ভাগ করা সম্ভব হবে না। কংগ্রেসকেও দেশভাগের ব্যাপারে রাজি করাতে হবে। **তাই তারা "Hot and Cold" - নীতির আশ্রয় নিয়ে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।** এবং এ-ব্যাপারে বেশী কালক্ষেপ-ও করা যাবে না। কারণ, আগষ্ট আন্দোলনের বিভ্রান্তিতে পড়ে যে-সব বিপ্লবীরা জেলবন্দী হয়েছিলেন তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়ে নতুন করে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁরা যদি পুনরায় সংগঠিত হয়ে দেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থাকে

বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে পারেন তবে ইংরেজের পক্ষে সে-অবস্থার মোকাবিলা করা খুব সহজ হবে না, এমন কি তাদের মূল পরিকল্পনাটিও বানচাল হয়ে যেতে পারে। তাই ইংরেজ শাসক একদিকে মুসলিম লীগকে Direct Action-এর মাধ্যম (অবশ্যই নিজেরা নীরব দর্শক থেকে) হিন্দু-মনে ত্রাস ও ভয়ের সঞ্চার করার ইঙ্গিত দিলেন, অপরদিকে কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তী সরকারে (Interim Government) যোগ দিয়ে দেশের যাবতীয় সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যম মিটিয়ে নিতে বল্লেন, যা ছিল একান্তই অবাস্তব। এক দিকে ভীতি-প্রদর্শন, অপর দিকে প্রলোভন—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পড়ে কংগ্রেস তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেল্লো এবং শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি, সেদিন যদি কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিয়ে অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে জেদ ধরতো তবে ইংরেজের সাধ্য ছিল না তাদের এই দাবীকে অগ্রাহ্য করে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা। একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে, ১৯৪৬-এর ১৬-১৮ই আগষ্ট ইংরেজ শক্তির পরোক্ষ মদতে মুসলিম লীগ কর্তৃক কলকাতার বুকে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ, অপহরণ ও অগ্নিসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক তার অব্যবহিত পর ২রা সেপ্টেম্বর কোন্ যুক্তিতে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিল! একতরফা এবং বিনা বাধায় কলকাতার বুকে সেদিন যে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা থেকে কংগ্রেসের কি কিছুই শিক্ষার ছিল না?

এখানে অনেকে হয়তো বলবেন ঃ সেদিন, সরকারের বাইরে থেকে কংগ্রেসের পক্ষে কিছুই করার ছিল না। পরিবর্তে, সরকারে যোগ দিয়ে সরকারী যন্ত্রের সাহায্যে দেশের ভেতর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল তার কিছুটা হলেও প্রতিহত করতে পারা যাবে। এখানে আবার ত্রিপাঠী সাহেবের কিছু বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। তিনি বলছেন, "১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬। মানিকতলায় মুসলিম মিছিল বেরোল। মুখে তাদের আওয়াজ 'লেকর রহে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। তারপর শুরু হল নির্বিচার হিন্দু আক্রমণ। কিভাবে এই দাঙ্গা লাগল? কে বা কারা এর জন্য দায়ী? ঠিক কত লোক এর শিকার হয়? কি পরিমান সম্পত্তি নষ্ট হয়? সব চেয়ে বড়ো কথা নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লী—এর যে শৃঙ্খল সূত্রে ধৃত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা কি অনিবার্য ছিল? এর কিছু প্রশ্ন নিরসনের জন্য স্যার প্যাট্রিক স্পেন্সের সভাপতিত্বে এক কমিশন বসান হয় কিন্তু তাঁরা কোন রিপোর্ট দাখিল করেননি। আয়েষা জালাল ঠিকই বলেছেন, '...the Killings still await their historian," (ঐ পৃষ্ঠা ৪৪৩)। ত্রিপাঠী সাহেব যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার আংশিক উত্তর আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। আর আয়েষা জালালের বক্তব্যের উত্তর-ও আমাদের পূর্বোক্তি আলোচনার মধ্যেই

খুঁজে পাওয়া যাবে—এর রহস্য উদঘাটনের জন্যে ভবিষ্যতের কোন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হবে না। খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে "The Great Calcutta Killing"-এর (The Statesman-এর ভাষায়) মুল কোথায় নিহিত ছিল। তবু-ও যদি কেউ প্রমাণের জন্যে পীড়াপীড়ি করেন তবে অনুরোধ করবো, তারা যেন ১৯৪৬ সালের ১৭ থেকে ২১শে আগষ্টের সংবাদপত্রগুলো একটু কষ্ট করে দেখেন। সেখানে দেখতে পাবেন, গণহত্যার প্রথম দুই-তিন দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় এবং বাংলার গবর্ণর বারোজ সাহেবের সৈন্য-বাহিনী ছিল নীরব দর্শক। কিন্তু প্রথম দিকে হিন্দুরা একতরফা মার খাবার পর তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট থেকে যখন পাল্টা মার দিতে আরম্ভ করলো ঠিক তখনই সুরাবর্দীর পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং বারোজ সাহেবও তার সৈন্যবাহিনী ও সাঁজোয়া গাড়ী কলকাতার রাস্তায় নামিয়ে দিলেন মুসলমানদের ধন-প্রাণ রক্ষা করার জন্যে। এ থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয়, শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র করে হিন্দু-নিধন যজ্ঞে লিপ্ত হয়েছিল। এ সত্য উদঘাটনের জন্যে কোন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হয় না। এর পরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। কলকাতার পর মুসলিম লীগ নোয়াখালিতে সংঘবদ্ধভাবে এবং বাংলার বিভিন্নপ্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দু-নিধনে মেতে উঠলো নারকীয় উল্লাসে। বিজ্ঞান শাস্ত্রমতে প্রতিটি ক্রিয়ার-ই বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তাই দিনের পর দিন খবরের কাগজে হিন্দুদের উপর বিভৎস হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, নারী-ধর্ষণ ও নারীহরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হলো। ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব ও দিল্লীতেও সে-আগুন ছড়িয়ে পড়লো। এককথায় সেই দিনগুলিতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একপ্রকার গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। এসব দেখে কংগ্রেস ভীত-সন্ত্রস্ত হলো, অর্থাৎ যে-সম্ভাবনা বৃটিশ শক্তি ইতিপূর্বেই ভেবে রেখেছিল তা বাস্তবে পরিণত হলো। অপর দিকে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার ফলে তার নেতৃবৃন্দ (বিশেষ করে নেহেরুজী) ইতিমধ্যেই ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে লোভাতুর হয়ে পড়েছিলেন। তাই, গদি ছেড়ে আসা নেহেরু-প্যাটেলদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। মোট কথা, বৃটিশের 'Hot and Cold'-নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো এবং কুটযুদ্ধে কংগ্রেস পরাজিত হলো। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি সত্যি সত্যি দেশের মঙ্গলাকাংখী হতেন তবে সেদিন তাদের পক্ষে একটা পথই খোলা ছিল। তা হলো গদির লোভ ত্যাগ করে জনতার পাশে এসে দাঁড়ানো এবং হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা কীভাবে প্রশমিত করা যায় তার একটা পথ খুঁজে বের করা।

এখানেই প্রশ্ন উঠবে, শাসকগোষ্ঠী যেখানে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে এককভাবে কী প্রকারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব ছিল, না সম্ভব হতো? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে ত্রিপাঠীজীর আরও একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলছেন ঃ 'গ্রুপ', 'সেকশন' ও 'ইউনিয়ন' প্রভৃতি নিয়ে ইংরেজের সংগে দরকষাকষিতে প্যাটেল সাহেব এতই বিরক্ত এবং হতাশ হয়েছিলেন, "আশ্চর্য নয় যে ৮ই মে প্যাটেল ওয়াভেলকে জানালেন—জোট ব্যাপারটাই সংহতি নাশ করবে। তিনি নাকি এও বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ অনিবার্য এবং এখনই তা হয়ে যাক"। (ঐ-পৃষ্ঠা ৪১৩)। কিন্তু না, প্যাটেল যে-বক্তব্য সেদিন ওয়াভেল সাহেবের সামনে রেখেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তা ধরে রাখতে পারেন নি। এর কারণ দু'টি হতে পারে—হয় পণ্ডিতজীকে স্বমতে আনতে পারেননি, অথবা নিজেও উত্তেজনাবশে যে-কথা বলেছিলেন পরে তা পরিবর্তন করে গদির দিকেই ঢলে পড়েছিলেন।

এখন আমরা আমাদের কথায় ফিরে যাবো। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কংগ্রেসের পক্ষে কি সেদিন একক প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা যেতো? উত্তরে বলবো ঃ নিশ্চয়ই যেতো না। ইংরেজের পাতা ফাঁদে কংগ্রেস যখন একবার ধরা দিয়েছিল তখন সেখান থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তবে উপায় কী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমি পূর্বেই দিয়েছি। তাদের উচিত ছিল গদির লোভ ত্যাগ করে বিপথগামী দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ানো এবং যে কোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করা। যদি সম্ভব না হতো, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দিয়ে যে মারামারি আরম্ভ হয়েছিল তা যদি গৃহযুদ্ধেও রূপান্তরিত হতো তাতেই বা ক্ষতি কী ছিল? ক্ষয়ক্ষতি তো একপক্ষের হতো না, উভয় পক্ষেরই হতো এবং এ-যুদ্ধ অনন্তকাল ধরেও চলতো না। যুদ্ধ করতে করতে একদিন উভয় সম্প্রদায়ই ক্লান্ত হতো এবং সেই অবসরে উভয় পক্ষ থেকে বেশ কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক বেরিয়ে আসতো যারা নিশ্চয়ই একটা মিমাংসায় পৌঁছুতে সক্ষম হতেন। সেক্ষেত্রে দেশও ভাগ হতো না আর ইংরেজের জারিজুরিও খাটতো না। বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে চিরদিনের মতো চলে যেতে হতো। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজদের প্রতি এতোই বিরোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল যে দেশের চরম বিপদের দিনে অর্থাৎ দেশে যখন গৃহযুদ্ধ চলতে থাকতো তখন তারা নীরব দর্শক হয়ে থাকতো না; পরন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে নিশ্চিতরূপে এগিয়ে আসতো।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে ঃ তখন দেশ-শাসনের ভার বা দায়িত্ব কাদের উপর থাকতো? উত্তর অত্যন্ত সোজা ঃ প্রথম দিকে নিশ্চিতরূপে সেনাবাহিনীর হাতে থাকতো। অতঃপর যথাসময়ে (এই যথা সময় কতদিন বা কত বছর হতো তা বলা সম্ভব নয়) গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সৈন্যবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যেতো। যদি না যেতো? হ্যাঁ, তার সম্ভাবনাও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী হতো? বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশতো সামরিক শাসনেই চলছে এবং ভালভাবেই চলছে। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না, ভারতের মতো বিরাট দেশকে কখনই কোন সামরিক বাহিনীর পক্ষে জনগনের সহযোগিতা ব্যতীত অনন্তকাল ধরে শাসন করা সম্ভব ছিল না।

এ-সব কথার পর আরও কিছু প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষায় আছে। এক, গৃহযুদ্ধ বা Civil War কি দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গল হতো? দুই, গৃহযুদ্ধে যে অগণিত নর-নারীর জীবনহানি ঘটতো এবং সীমাহীন ধন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হতো তার জন্যে কি নেতৃবৃন্দ দায়ী হতেন না? উত্তরে বলবো ঃ

(এক) ভারতবর্ষের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দেশকে কুচক্রী ও স্বার্থান্ধদের ষড়যন্ত্রের চাপে পড়ে টুকরো টুকরো করার চেয়ে গৃহযুদ্ধ (Civil War) অবশ্যই মন্দের ভাল ছিল। গৃহযুদ্ধ একটা সাময়িক ঘটনা; কিন্তু দেশবিভাগ চিরস্থায়ী। গৃহযুদ্ধের পর কালের গতিতে একদিন সব ধুয়ে মুছে যায়; কিন্তু দেশবিভাগের দাগ কোনদিন মুছে যায়না—তুষের আগুণের মতো ধিকধিক জ্বলতেই থাকে। সেদিন ইংরেজ শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ ভারতের বুকে যে-আগুন প্রজ্বলিত করেছিল, সে-আগুন কি আজো জ্বলছে না খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে? ১৯৪৭-এর আগষ্টের অব্যবহিত পর জম্মু ও কাশ্মীর (যাকে বিশ্ববাসী জান্নত অর্থাৎ ভূস্বর্গ বলে) দখল করার জন্যে পাকিস্তান যে যুদ্ধের সূচনা করেছিল সে-যুদ্ধ কি অদ্যাবধিও চলছে না? এতে যে প্রতিদিন ভারতবর্ষের বিপুল অর্থব্যয় ও অগণিত জোয়ানের তাজা রক্ত দেশের মাটিতে ঝরছে তার মূল্যায়ন কোন্ মাপকাঠি দিয়ে নির্ণীত হবে? এতদ্ব্যতীত ভারত-ভাগের পর পাকিস্তান তিনবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে এবং নিজেরা পর্যুদস্ত হয়েছে। তবুও শিক্ষা হয়নি। যতদিন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর তাদের দখলে নিতে না পারবে ততদিন তারা কোনভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা বন্ধ করবে না এবং দুই দেশের মধ্যে শান্তিও স্থাপিত হবে না।

(দুই) আর প্রাণহানি ও ধনসম্পত্তি নষ্ট? ১৯৪৬ সালের পূর্বের কথা না তুলেও বলা চলে উক্ত বছরের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ কলকাতায় যে হিন্দুমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছিল, যা কালক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার রূপ নেয়, তাতে সম্মিলিত হিন্দুমুসলমানের যত ধনসম্পত্তি ও জীবন-হানি হয়েছিল তা কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার? সত্যিকারের হিসাব যদি কোনদিন দিনের আলোতে প্রকাশ পায়, দেখা যাবে, উভয় সম্প্রদায়ের দুই থেকে তিন লক্ষ নর-নারী নিহত হয়েছে এবং সমসংখ্যক আহত হয়েছে। আর বাস্তুহারা হয়েছে তিন কোটির উপর। যারা নিহত হয়েছে তারা একবারই মরেছে, পরবর্তীকালে আর কোনরূপ জীবন-

যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি; কিন্তু যারা আহত হয়েছে কিংবা বাস্তুহারা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বিনা চিকিৎসায় এবং অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা অনাহারজনিত নানা রোগে ভুগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। বাকি যারা ছিল তাদের মধ্যে কারা কোথায় কীভাবে পূনর্বাসন পেয়েছে বা নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সে-কথায় আমরা যাবো না; কারণ সে-আলোচনা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়-বহির্ভূত। এখানে এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, আজো তাদের (উভয় সম্প্রদায়ের) অনেকেই সুষ্ঠু পুর্নবাসন না পেয়ে শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে নানাপ্রকার অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছে কিংবা উঞ্ছবৃত্তি বা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে-জীবন তারা ফেলে এসেছে সে-জীবনে আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে না। একমাত্র মৃত্যুই তাদেরকে চিরশান্তির দেশে তুলে নেবে। এর সাথে উভয় সম্প্রদায়ের ধনসম্পত্তি যে-পরিমান নষ্ঠ হয়েছে, অংকের হিসেবে, তার পরিমান হবে হাজার হাজার কোটি টাকা। এক কথায়, সব কিছু হারিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের নর-নারীকে স্ব স্ব বাস্তু ত্যাগ করে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াতে হয়েছে শুধুমাত্র প্রাণ ও মান বাঁচাতে। কিন্তু হায়! সেই মানমর্যাদা ও প্রাণটুকুও শেষ পর্যন্ত অনেকেই রক্ষা করতে পারেনি। এর পরিবর্তে, কমবেশী এই তিনকোটি নর-নারী যদি গৃহযুদ্ধের (Civil War) শিকার হয়ে নিজেদের ভিটে মাটিতে প্রাণ দিত, তবে তাদের সেই প্রাণের মূল্যে ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকতো এবং গৃহযুদ্ধের পর যারা বেঁচে থাকতো তারা উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা দেশের আইন মোতাবেক মৃতদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা হতো। কোনক্রমেই দেশভাগের বাহান্ন বছর ধরে অমানুষের জীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত শেয়াল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে পড়ে থেকে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। তাই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের নিকট আমার প্রশ্ন ঃ ইংরেজ ও লীগের ষড়যন্ত্রে ধরা দিয়ে দেশ-বিভাগে সম্মত হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সমীচীন হয়েছিল, না কি মন্দের ভাল বেছে নিয়ে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া দূরদর্শিতার কাজ হতো? তবে হ্যাঁ, গৃহযুদ্ধ-শেষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হয়তো সেদিন প্রধানমন্ত্রী না-ও হতে পারতেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে এই গৃহযুদ্ধের (Civil War) কাহিনী প্রতিটি দেশে। কোন দেশই এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। সে-সব কাহিনীর সাথে যদি আরো একটি কাহিনী যুক্ত হতো তাতে মহাভারত নষ্ট তো হতোই না, পরন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাক্তি বিগত দীর্ঘ বাহান্ন বছর ধরে ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে যে বাদর নাচ নাচাচ্ছে তার সুযোগ তারা কোনদিন পেতো না। পক্ষান্তরে, অখণ্ড ভারতবর্ষ গর্বভরে মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো। আজ যেমন আমেরিকা ও চীন ভারতের উপর দাদাগিরি ফলাচ্ছে, সে-সুযোগ থেকে চিরিদিন তারা বঞ্চিত হতো।

# দেশবিভাগ ও সংখ্যালঘু সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ) পর যখন ভারতবর্ষের জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্থাৎ শাসনভার হস্তান্তরের কথা উঠলো তখন কংগ্রেস (যে-সংস্থা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতো) অখণ্ড ভারতের কথা বললো; কিন্তু মুসলিম লীগ (যারা মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করতো) তারা বল্লো ঃ না, মুসলমানরা একটি ভিন্ন জাতি, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। তারা হিন্দুদের সাথে এক সাথে প্রতিবেশীরূপে বসবাস করতে পারে না, তাদের জন্যে চাই একটি ভিন্ন রাষ্ট্র যাকে তারা নাম দিয়েছিলেন পাকিস্তান। অনেক দর কষাকষির পর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, স্বর্গীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এণ্ড কোং মুসলিম লীগের দাবী মেনে দেশকে ভাগ করলেন। কেন মেনে নিলেন, সেকথা স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা এপুস্তকের অন্যত্র তুলে দিয়েছি, পাঠক মহোদয় যথাস্থানে তার সাক্ষাত পাবেন।

"বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে দিতে তারা না হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সাথে সাথে দেশবাসীও কি ক্লান্ত হয়েছিলেন এবং হতাশায় ভুগছিলেন? না, তারা কখনই ক্লান্তি বা হতাশায় ভোগেননি। তাদের প্রতি দেশের তদানিন্তন নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতকে খণ্ড খণ্ড করে স্বাধীনতার নামে বিভ্রান্ত করেছিলেন এবং দেশ ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে সেখানে হিন্দুদের উপর অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ হলো, তাদের প্রার্থনার স্থানসমূহ অপবিত্র করা হলো, নারীনির্যাতন ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন অবাধে চল্লো। যে-প্রক্রিয়া সেদিন পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল অদ্যাবধি তা শেষ হয়নি। আজ পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু-নিধন ও বিতারণপর্ব প্রায় শেষ। পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) যে ক'জন হিন্দু আজও আছে তারা নিজেদের উপাসনাপদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে অর্ধেক মুসলমান হয়েই জিম্মি হিসেবে দিন কাটাচ্ছে। পক্ষান্তরে, ভারতের মুসলমানরা বহাল তবিয়তে থেকে নতুন উদ্যমে খণ্ডিত হিন্দুস্থানকে দারুল ইসলামে পরিণত করার সর্বরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং একাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত জোগাচ্ছে এদেশেরই শাসকগোষ্ঠী যারা নিজেদের উপাসনাপদ্ধতি-নিরপেক্ষ বলে দাবী করেন। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ দেশটা যখন সাম্প্রদায়িকতার

ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল তখন এসব রংচোরাদের নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার জন্যে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে মুসলিম তোষণের অধিকার কে দিলো? পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যখন নিজেদের ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলো তখন ভারত কেন তাকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলো না বা করবে না?

এপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার আছে। দেশভাগ হবার পর উভয় ডমিনিয়নে সংখ্যালঘুদের নিয়ে যে একটা সমস্যা দেখা দেবে তা কি উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন। এবং জানতেন বলেই ডঃ বি. আর. আম্বেদকর লোকবিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু যিনি "দৈবক্রমে হিন্দু, সংস্কৃতিতে মুসলমান এবং শিক্ষায় ইংরেজ" সেই নেহেরুজী রাজি হলেন না। আরও একটা পন্থা তদানিন্তন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের নিকট খোলা ছিল। সেটি ছিল একান্ত বাস্তবানুগ এবং উভয় পক্ষের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা। সেদিন যদি ভারতের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিতেন ঃ তোমরা তোমাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি যেরূপ আচরণ করবে এবং উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি যেমন ভাব প্রদর্শন করবে আমরা-ও আমাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি ঠিক তেমন ব্যবহার করবো—একটু কমও নয়, একটু বেশীও নয়। কিন্তু যিনি নিজেকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন (যদিও দেশ-বিদেশে তিনি "পোষাকী আন্তর্জাতিক ব্যক্তি বা Fashionable Internationalist" নামে পরিচিত) সেই নেহেরুজী একথা কী করে বলেন? তিনি যে পরম অহিংস ও মানব-দরদী (?) গান্ধীজীর এক নম্বর শিষ্য! "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতি মেনে না নেয়ার ভেতর আর যা-ই থাকুক, অন্তত নৈতিকতা ও পুরুষত্ব যে নিহিত নেই সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে কি? বরং নপুংসকতারই পরিচয় বহন করে!

*"In this world always take the position of the giver. Give everything and look for no return. Give love, give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter. Make no conditions and none will be imposed. Let us give out of our own bounty, just as God gives to us. The Lord is the only Giver; all the world are only shopkeepers. Get His cheque and it must be honoured everywhere."*

—Swami Vevekananda.

# পাছে না ভুলি

অনেকে বলেন, অহিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। আমাদের মতে, তারা শুধু ভণ্ড এবং প্রতারকই নয়, তারা দেশের শত্রু, জাতির কলংক। পাঠক মহোদয়ের অবগতির জন্যে আমরা **শ্রী বি.এন.যোগ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ হুবহু তুলে দিচ্ছি।** তা থেকে বুঝা যাবে, ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করে কত হিন্দুর রক্তমূল্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। তিনি লিখছেন ঃ ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয়, অর্থাৎ দেশ বিভাজনের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তার ঠিক একবৎসর আগে ব্যারিষ্টার জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুলাই।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চরিত্র কি হবে তার আভাষ দিয়ে মিঃ জিন্না বলেছিলেন, "আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নিলাম তা আমাদের ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম লীগের ইতিহাসে আমরা আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি আইনের পথেই করেছি। কিন্তু আজ আমরা ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছি যে আমাদের আইনের পথ বর্জন করতে হচ্ছে। আজ থেকে আমরা বৈধ আইনের পথ ত্যাগ করলাম।"

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যক্রম কি হবে সে সম্পর্কে আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে ব্যাখ্যা দিয়ে তখন জিন্নার ডান হাত এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ বলেন, "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ আইন ভঙ্গ করা। আমরা এখন যে জীবন যাপন করছি (অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ-চাপের মধ্যে আছি) সেই পরিস্থিতিতে আমাদের আইন অমান্য যে কোন রকমের হতে পারে। আমরা কোন বে-আইনী কাজকেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অচ্ছুৎ করে রাখতে চাইনা। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মানেই বে-আইনী সংগ্রাম।"

বাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী (সেকালের আইনের ভাষায় প্রধানমন্ত্রী) এবং মুসলিম লীগের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কী বোঝেন তা পরিস্কার করে বলেন। "আমাদের এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে আমাদের শান্তিপূর্ণ পথেই চলতে হবে। হাঙ্গামা-সৃষ্টির একশ-এক পথ খোলা আছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কী জিনিষ বাংলার মুসলমান ভালই জানে। নিজেদের পথ খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে তারা বিভ্রান্ত হবে না।"

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রব নিস্তার উপরোক্ত দুই নেতাকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ ব্যাখ্যা করে এমন কথাও বলেন, "এখন শুধু মাত্র রক্তপাতের পথেই পাকিস্তানের দাবী পূরণ হতে পারে। সুযোগ পেলেই আমরা অমুসলমানদের রক্তপাত ঘটাব। মুসলমানেরা কিছু অহিংসার পূজারী নয়।"

মুসলিম লীগের নেতারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ ব্যাখ্যা করে নিজের নিজের মনের কথা খোলসা করে বলে দিয়েছেন। জিন্না বলেছেন আইনের পথ বর্জনের কথা, আবদুর রব নিস্তার বলেছেন হিন্দুদের রক্ত পাত করার কথা। কিন্তু কংগ্রেস সেই সব হিন্দুদের রক্ষার জন্য কিছুই করল না যারা তাদেরই অনুগামী এবং পক্ষকাল বাদেই যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শিকার হতে চলেছে। পূর্ববর্তী ষাট বৎসর ধরে হিন্দুদের শেখান হয়েছে যে তারা যেন মুসলমানদের ভাই বলে মনে করে এবং তাদের সমস্ত অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য করে। হিন্দুরা এই শিক্ষাই আত্মস্থ করেছে যে স্বাধীনতা পেতে হলে মুসলমানেরা যা চাইবে তাই মেনে নিতে হবে, মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ করা চলবে না।

১৬ই আগষ্ট কলকাতা শহরে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। নিহত হয় হিন্দুরা, ধর্ষিতা হয় হিন্দু নারীরা, অগ্নিদগ্ধ হয় হিন্দুদের ঘরবাড়ী, লুণ্ঠিত হয় হিন্দুদের দোকানপাট। এই পরিস্থিতি চলতে থাকে একটানা তিন দিন ধরে।

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব শ্রীপ্যারেলাল তাঁর রচিত "মহাত্মা গান্ধী-দি লাষ্ট ফেজ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঐ সব দিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রী প্যারেলাল লিখেছেন, "শহীদ সুরাবর্দী বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই সুরাবর্দীরই নেতৃত্বে কলকাতা মহানগরে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্থান থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতায় পুলিশ থানার সংখ্যা ২৪। ১৬ই আগষ্ট তারিখে তার মধ্যে ২২টি থানার দায়িত্বে ছিল মুসলমান অফিসাররা। বাকি দুইটির দায়িত্ব ছিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসারদের উপর। ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটির দিন ঘোষিত হয়। লাঠি, ছুরি থেকে বন্দুক পর্যন্ত নানারকম অস্ত্র ও হাতিয়ার মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পেট্রোলের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবু মন্ত্রিদের শত শত গ্যালন পেট্রোলের স্লিপ দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের কার্যকর্তা ও গুণ্ডাদের গাড়ী দেওয়া হয়। (এই সুরাবর্দীকেই গান্ধিজী নিজের মানসপুত্র বলতেন)। সুরাবর্দীর সাকরেদ শরীফ খান গুণ্ডাদের মধ্যে হাতিয়ার বিলি করেন। মহম্মদ ওসমান ছিলেন কলিকাতা নগর মুসলিম লীগের সম্পাদক এবং কলকাতার মেয়র। তিনি এবং শরীফ খান শহরে ঘুরে ঘুরে গুণ্ডাদের দাঙ্গা করার জন্য উত্তেজিত করেন। শহরে সকাল থেকেই হরতাল চলছিল। উত্তেজনা

বাড়তে থাকে। সুরাবর্দীর সভাপতিত্বে মুসমিল লীগের সভা হয়। সভাফেরত জনতা দোকানপাঠ লুঠ করতে থাকে। যানবাহন সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পথচারীদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। শহরের রাস্তায় রাস্তায় শুধু মুসলিম লীগের গুণ্ডাতে ভর্তি ট্রাক টহল দিচ্ছিল আর পাকিস্থানের স্লোগান দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল।

"পরের দিনের কলকাতা ছিল রক্তাক্ত শহর। চারমাস পূর্বে মুসলিম লীগের বিধায়কদের এক সভায় ফিরোজ খান নুন বলেছিলেন যে, মুসলমানেরা এমন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে যে চেঙ্গিজ খাঁ এবং হলাকুবও লজ্জায় নিজেদের মস্তক নত করবে। নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুঠপাট, বলাৎকার চলেছে মহোৎসাহে আর পুলিশ নীরবে সব দেখেছে। পরদিন সন্ধ্যায় ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ বলেন যে, 'পুলিশ একটিও গুলি চালায় নি।'

"মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী একটানা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং পুলিশকে মৌখিক এবং লিখিত নির্দেশ দিচ্ছিলেন। যে সব লুণ্ঠনরত গুণ্ডাকে পুলিশ হাতে নাতে ধরে গ্রেপ্তার করে তিনি নিজের দায়িত্বে তাদের ছেড়ে দেন।

"অনেক ঘন্টা ধরে হত্যালীলা চলতে থাকে। রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ পড়ে থাকে, নিকাশী ড্রেন মৃতদেহে ভর্তি হয়ে যায়। কুকুর, শিয়াল, শকুনেরা মৃত দেহের ভোজ খেতে থাকে। চারিদিকে নোংরা আর দুর্গন্ধ। বাড়ীর ছাতের উপর থেকে শিশুদের রাস্তায় ছুঁড়ে দেয়। তারপরে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। মহিলাদের আগে বলাৎকার করে পরে হত্যা করা হয়।"

কলকাতার দাঙ্গার এই বিবরণ দিয়েছেন গান্ধিজীর ব্যক্তিগত সচিব শ্রী প্যারেলাল। কেউ একে অতিরঞ্জন বলতে পারবেন?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশবিভাজন স্বীকার করে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তার আগে যত হিংসার প্রকোপ হয়েছে কলকাতার হত্যাকাণ্ড তার একটি ক্ষুদ্র স্ফূলিঙ্গ মাত্র। সমগ্র দেশ জুড়ে যে প্রত্যক্ষ হিংসা আচরিত হয়েছে তার হিসাব রাখাও সম্ভব নয়, সীমারেখা অঙ্কিত করাও সম্ভব নয়। তবুও কংগ্রেসীরা বলছে অহিংসার পথে কাউকে আঘাত না করে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। *(সৌজন্যে—বিশ্ব হিন্দু বার্তা, ১৯৯৭)।*

*"প্রতি বছর ১৫ই আগষ্ট দিনটিকে 'বিশ্বাসঘাতকতা ও লজ্জার দিন' হিসেবেই পালন করতে হবে; কোনক্রমেই 'স্বাধীনতা-দিবস' হিসেবে নয়।"* —কুরুক্ষেত্র। ইউ. কে.।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' — 'জনগণমন-অধিনায়ক' নয়

ভারতবাসী নিজের গর্ভধারিণী মাতা, দেশমাতা ও জগন্মাতার মধ্যে কোনপ্রকার বিভেদ আছে বলে মনে করে না। তাই তারা 'বন্দেমাতরম'-মন্ত্রকে তাদের জীবনের মহামন্ত্র বলে মনে করে, জপের মালা বলে মনে করে। ভারতবাসীর নিকট যখন জাতীয় সঙ্গীত কোন্‌টি হবে তা নিয়ে কথাবার্তা চলছিল তখন অনেকেই এই 'বন্দেমাতরম' সংগীতটির পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু না, সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের, এমন কি তখনকার দিনে মৌলানা আজাদের যিনি তখন আগমার্কা জাতীয়তাবাদী নেতা বলে পরিচিত ছিলেন, আপত্তিতে সংগীতটির ডানা ছাটা হলো এবং বিকৃত অবস্থায় বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয় হলো। এতেও তাদের মন ভরলো না, তাদের মতে যেহেতু মাতৃবন্দনা ইসলামে গুনাহ্ তাই তাদের দাবী মেনে "জনগণমন-অধিনায়ক" সঙ্গীতটিকে দ্বিতীয় জাতীয় সংগীত-রূপে গ্রহণ করা হলো। যারা একাজ করলেন তাদের নিকট আমার প্রশ্ন ঃ কোন দেশের জাতীয়-সংগীত কি একাধিক থাকে, না একটাই থাকে? কেন তারা মুসলমানদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ধূলায় লুটিয়ে দিলেন?

অতঃপর "বন্দেমাতরম" সংগীতটি সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাস্পদ অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যা বলেছেন তার কিছু অংশ তুলে দিলাম। "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তপস্যার আবেশে দেখিয়াছিলেন নব-সন্তান-দলের আবির্ভাব, ত্যাগ যাহাদের ব্রত, সেবা যাহাদের লক্ষ্য, চরিত্রবল যাহাদের লক্ষণ। মাভৈঃ-গর্জনে যাহারা সমগ্র জাতির দুঃখ ও কলংককে করিয়া দিবে চির-নির্বাসিত, সেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহৎগণের দলে দলে শুভানুগমনকে তিনি ধ্যান বলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একটি মহামন্ত্রমূলে তিনি ইহা দেখিয়াছিলেন, জানিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন। তাহাই হইতেছে আমাদের "বন্দে মাতরম্।".... "বন্দে মাতরম্" বাংলায় বিপ্লবের বন্যা বহাইয়াছিল। তাহা আস্তে আস্তে বিশাল ভারত-ভূবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়। অংশ অনেক সময়ে পূর্ণের কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং ভারতে জাতীয় সঙ্গীত রূপে 'বন্দেমাতরম্' যে কুণ্ঠিত ও খণ্ডিত মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতেও বিপ্লবিনী শক্তিই নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং, যদিও আকাশবাণী আর সিনেমার হল ব্যতীত এই সঙ্গীত আজকাল প্রায়ই অন্যত্র শোনা যায়

না তথাপি ইহাই একদা ভারতের সমাধানাতীত বহু সমস্যার সমাধান করিবে, এই বিশ্বাসটুকু রাখা সঙ্গত।

" 'বন্দেমাতরম' সত্যিই এক মহামন্ত্র—শ্লোগানের মন্ত্র নহে, জপের মন্ত্র। এই মন্ত্র যাহারা জপিয়াছে, তাহারা জপিয়াছে অহর্নিশ, অবিশ্রাম, অনুক্ষণ।... জপিতে জপিতে তাহাদের জীবন মন্ত্রময় হইয়া উঠিয়াছে অনায়াসে ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া তাহারা ফাঁসির রজ্জু সাগ্রহে গলায় পরিয়াছে এবং অবহেলে মরণকূপে ঝাঁপ দিয়াছে।"

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের. সাথে সমস্বরে আমরাও বলতে চাই, "মাতৃভক্তি কি অসার সংকীর্ণতা? মাতৃভূমির প্রতি প্রীতি কি জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা হইতে বিচ্ছিন্ন একটা আকস্মিক উৎকটতা? মাকে যে ভালবাসে, স্বদেশকে ভালবাসতে তাহার বিলম্ব হয় না। মাতৃভূমিকে যে ভালবাসিয়াছে তাহার পক্ষে বিশ্বের সমস্ত ভূমির সহিত ভূমার সমস্ত অস্তিত্বকে ভালবাসাও স্বাভাবিক। ইহা জাপকের অনুভূতি, শ্লোগান গর্জনকারীর জীবনে এই আস্বাদন কখনও আসে না।... গর্ভধারিণী জননী, দেশমাতৃকা এবং বিশ্বমাতা, এই তিনেরই বন্দনা-মন্ত্র হইল 'বন্দেমাতরম্'। বন্দেমাতরম সম্পর্কে এই অখণ্ডদৃষ্টি (Integral view) জনগণমানসে উন্মোচিত হউক।" (বিদ্যার্থী রঞ্জন, নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩। সৌজন্যে—বিশ্ব হিন্দু বার্তা, পৌষ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)।

আশা করি, বন্দেমাতরম মন্ত্রের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব পাঠক মহোদয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দেশ এবং জাতির কী দুর্ভাগ্য মাতৃবন্দনার এই মহামন্ত্রের সাথে সমান গুরুত্ব এবং মর্যাদা দেয়া হয়েছে 'জনগণমন-অধিনায়ক' সঙ্গীতটিকে, যার রচনার স্থান, কাল এবং উদ্দেশ্য তর্কাতীত নয়। অপিচ, প্রতিটি মানবশিশু মাতৃশোণিত পান করে জন্ম নেয় এবং মাতৃসুধা পান করে বর্দ্ধিত-ও হয়, অতঃপর-পরবর্তীকালে জলবায়ু, অন্নপানে পুষ্ট হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে। জন্মদাতৃ মাতা ও সন্তান-পালিনী দেশমাতৃকার এতাদৃশ ঔদার্যের বিনিময়ে যারা সমান্যতম কৃতজ্ঞতা স্বীকারেও অনিচ্ছুক তারা আর যাই হোন, আমার বিবেচনায়, মনুষ্যপদবাচ্য নয়। সুতরাং তারা যে মাতৃবন্দনায় আপত্তি জানাবে এবং বন্দেমাতরম-মন্ত্রকে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসেবে বর্ণনায় বিধর্মীদের সাথে একসুরে রা তুলবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে! একে 'জাতির দুর্ভাগ্য' বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। মাতৃবন্দনায় যারা আপত্তি জানাবে তাদের জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এই হোক আজকের শপথ।

*"যখনই তুমি তোমার সামনে দুর্নীতি দেখ এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কর তখনই তুমি তোমার কর্তব্যচ্যুত হও।"*

—জোসেফ ম্যাটসিনি।

# জাতীয়তাবাদ ও মর্যাদাবোধ

প্রতিটি পরিবারের যেমন বংশপরিচয় আছে, তেমনি প্রতিটি জাতিরও ঐতিহ্য এবং ইতিবৃত্ত আছে। আবার প্রতিটি বংশেরই যেমন বংশমর্যাদা আছে, তেমনি প্রতিটি জাতিরও জাত্যভিমান বা মর্যাদাবোধ আছে। এ-সব অস্বীকার করে কিংবা স্ব স্ব জাতীয়তা ও মর্যাদা বোধকে পাশ কাটিয়ে ''এক লাফে যারা আন্তর্জাতিকতার বৃক্ষটিতে উঠতে চান, হয় তারা অতিমানব, নয় অবমানব। এদের কাউকেই আমাদের প্রয়োজন নেই''। পরিবারের সুখশান্তি বজায় না থাকলে যেমন বৃহত্তর পরিবারের মঙ্গলসাধন করা যায় না, তেমনি প্রতিটি জাতি যদি তার জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধে সজাগ না থাকে তবে সেই জাতির দ্বারা পৃথিবীর মানুষের কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এই সহজ কথাটি আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসীরা যদি মনে রাখেন, ভাল করবেন।

এই ঐতিহ্য ও জাতীয় মর্যাদাবোধকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে প্রতিটি জাতির চরিত্র বা National Character. পৃথিবীর যে-সব দেশে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান সর্বপ্রথম। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। এর নাম বৈদিক সভ্যতা। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরাই মনে করেন, এর উন্মেষ ঘটে কমপক্ষে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং এর সূতিকাগৃহ এবং পীঠস্থান আর্যাবর্ত যার বর্তমান নাম ভারতবর্ষ। আর্যাবর্ত নাম হওযার কারণ, এখানেই আর্যরা বসবাস করতেন। তাঁরাই বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি মানব-শাস্ত্রের রচয়িতা। একজন ভারতবাসী হিসেবে তার গর্ব করার মতো যা আছে তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা জাতির মানুষের নেই। তবে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতবর্ষ মুসলমান ও খৃষ্টানদের শাসনাধীন থাকায় তার কোনরূপ অগ্রগতি বা শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। শুধু তাই নয়, তার কৃষ্টি ও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ভারতবর্ষকে প্রচুর মূল্য-ও দিতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর দেশবাসীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের যখন সুযোগ এলো তখন-ও আমরা তার সদ্ব্যবহার করলাম না, যেমন করিনি ১৯৪৫-এ যুদ্ধোত্তর কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর কাছে যে অখণ্ড ভারতবর্ষের (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বদলে) পূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। অবশ্য যে-ভাবে এবং যাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে অন্যরূপ আশা করার কোন কারণ ছিল না। যে-নেতৃত্ব সেদিন মাতৃদেহ-ব্যবচ্ছেদে সামিল হয়েছিল, পরবর্তীকালে,তারা যদি ভ্রাতৃহত্যায় মদত জুগিয়ে থাকে, দশকের পর দশক

ধরে যদি দেশস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি?

জাতীয়তাবাদ দুভাবে গড়ে উঠতে পারে। এক, অভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষাকে কেন্দ্র করে; দুই, অভিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতাকে কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য। ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ হওয়া সত্ত্বে-ও তার কৃষ্টি ও সভ্যতা তাকে এক উন্নত জাতিতে পরিণত করেছে। ভারতবর্ষে বহুভাষার প্রচলন থাকলেও তাদের সবার-ই উৎসস্থল সংস্কৃত ভাষা। সেই এক ভাষা থেকেই হিন্দী, পালি, প্রাকৃত, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, গুরুমুখী, উড়িয়া, বাংলা, অহমিয়া প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এবং এই ভাষাতেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বহুবিধ পুরান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবাসী আজ বিভিন্ন ভাষায় কথা বল্লেও তাদের প্রতিটি ভাষায়ই এই সব প্রাচীন গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে বহুকাল পূর্বে এবং যুগযুগ ধরে এই সব গ্রন্থ ভারতবাসীর কৃষ্টি ও সভ্যতার সেতুবন্ধরূপে কাজ করে আসছে। তাই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারতের মর্মবাণী প্রতি মুহূর্তে অনুরণিত হচ্ছে নানাছন্দে, নানা বর্ণে, নানাভাষায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এটাই বিশেষত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ "Each nation, like each individual, has one theme in its life, which is its centre, the principal note around which every other note comes to form the harmony. If anyone attempts to throw off this central note. that is, its national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies. In India religious life forms the centre, the key-note of the whole music of national life. Take away religion from India; nothing would be left." অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তির ন্যায় প্রতি জাতিরই নিজস্ব একটা স্বকীয়তা বা কেন্দ্রবিন্দু থাকে যাকে কেন্দ্র করে আর সব কিছু গড়ে ওঠে। এই মূল সুরটিকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে যে জাতীয় সত্তা গড়ে ওঠে তাকে যদি কেউ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে তবে সে-জাতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই মূল সুর হলো তার ধর্মীয় সত্তা। এই ধর্মভাবকে কেন্দ্র করেই তার জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠেছে। ভারতবাসীর জীবন থেকে এই ধর্মভাবকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্লে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

যদিও এখানে Religion শব্দটি স্বামীজী ধর্ম শব্দেরই ইংরেজী প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছেন তবু এই ধর্ম ও Religion শব্দ দুটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত-ভাষার অন্তর্গত। এর অন্তর্নিহিত অর্থ ধর্মভাব (Religiosity), কোনক্রমেই ইংরেজী প্রতিশব্দ রিলিজিয়ন (Religion) নয়। যদিও আমরা সাধারণভাবে ধর্ম শব্দের ইংরেজী রিলিজিয়ন (Religion) করে থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Religion নয়, নিকটস্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ হতে পারে Religiosity যার

মর্মার্থ ধর্মভাব। রিলিজিয়ন সংকীর্ণ, ধর্ম উদার। 'রিলিজিয়ন' সম্প্রদায়বিশেষের উপাসনা-পদ্ধতি সূচক; পক্ষান্তরে,'ধর্ম'সমগ্র মানব জাতির চিরন্তন ভাবনা-চিন্তা ও কাজকর্মের ধারক ও বাহক। ধর্ম সনাতন বা Eternal যাকে আমরা ইংরেজীতে Eternal Truth-ও বলতে পারি। অন্যভাবেও বলা চলে ঃ যে কাজ বা চিন্তাভাবনার মধ্যে কোন ধর্মভাব (Religiosity) অর্থাৎ চিরন্তন সত্য নিহিত নেই, তা ধর্ম নয়; আর যেখানে ধর্মভাব আছে তা-ই ধর্ম।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। আশা ছিল, দেশ রাহুমুক্ত হলে অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের পর নেতৃবৃন্দ দেশের লুপ্ত-গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল তারা স্বদেশ ও স্বজাতির কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়া দূরের কথা, তাকে প্রতিমুহূর্তে পদদলিত করে চলেছে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে। শুধু তাই নয়, এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধকে উপেক্ষা করে তারা এক নতুন জাতীয়তাবাদ আমদানী করেছেন, নাম দিয়েছেন মিশ্র জাতীয়তাবাদ (Composite Nationalism) অর্থাৎ "সোনার পাথরবাটি"। পরাধীন অবস্থায় জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা পাথর-চাপা অর্থাৎ অবনমিত ছিল, সন্দেহ নেই; দেশ স্বাধীন হবার পরও যদি জাতি তার ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট না হয়, তবে তাকে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং এই মুহূর্তে, দেশের কারা শত্রু এবং কারা মিত্র, চিনে নেবার সময় এসেছে। যারা দেশের মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে বিধর্মীদের এগিয়ে যাবার সহায়ক হয় তাদের পরিস্কার ভাষায় দেশদ্রোহী বলে। তাই আমরা দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমিক নর-নারীর নিকট আবেদন রাখছি, তারা যেন এই দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র থেকে, যে কোন মূল্যে, স্বদেশের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসেন।

এ-প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা না বললে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ কোন আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ নয়। এই জাতীয়তাবাদের চরিত্র, এক কথায় মানবিক, দানবিক নয়। পক্ষান্তরে, আগ্রাসী (Aggresive) জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র অন্য জাতির উপর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে না, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হলো, সে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি মৈত্রী ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সব মানুষকে 'অমৃতের-সন্তান' (অমৃতস্য পুত্রাঃ) বলে জ্ঞান করে। "বাঁচ এবং বাঁচতে দাও"—এই শাশ্বত বাণীর উৎপত্তিস্থলও এই ভারতবর্ষ। তার রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিসে আছে ঃ "এটি আমার, ওটি তার—এসব চিন্তাভাবনা একমাত্র ছোটমনের মানুষরাই করে থাকে; আর যাঁদের হৃদয় উদার এবং মহৎ, তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষকেই আপনজন বলে মনে করেন" (অয়ং নিজো পরোবেতি গননা লঘুচেতসাং, উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্)।

# ‘সর্বধর্ম-সমভাব’ নয়, হওয়া উচিত ‘সর্ব-উপাসনা-পদ্ধতি-সমভাব’

প্রথমেই বলে রাখি ‘সর্বধর্ম’ বলে কিছু নেই, ধর্ম একটি-ই যা সমস্ত মানব-সমাজকে ধারণ করে আছে। তবে পৃথিবীতে বহু মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আছে। তাদের সবারই নিজ নিজ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি আছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সেটি হলো ঃ ‘ধর্ম’-শব্দটির অর্থের সাথে উপাসনা-পদ্ধতি’র অর্থকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। ‘সর্ব-উপাসনা-পদ্ধতি-সমভাব’-র অর্থ, নিজ নিজ উপাসনা-পদ্ধতি সহ সকল উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি সমভাব প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কোনভাবেই অপরের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা প্রদর্শন নয়।

বর্তমান পৃথিবীতে মোটামুটি তিনটি প্রধান উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যেমন হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম। এদের মধ্যে আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। আমরা তাদের কথায় যাবো না। প্রথমটি বাদে বাকী যে দুই প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতি আছে অর্থাৎ খৃষ্টান ও ইসলাম, তারা বিশ্বাস করেন গড (God) এবং আল্লাহ যে কিতাব দিয়েছেন সেটিই চূড়ান্ত, এর বাইরে কোন কিতাব বা উপাসনা-পদ্ধতি নেই। যদি থাকেও, সে-সব গ্রন্থ বা কিতাব গ্রহণযোগ্য নয়। তাই গড এবং আল্লাহ তাঁদের নিজ নিজ অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এর জন্যে যা যা করণীয় অর্থাৎ যে যে পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা যেন তারা করেন। ফলে, এই দুই সম্প্রদায় একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়, এদের প্রত্যেকে মনে করেন, তার উপাসনা-পদ্ধতিই পৃথিবীর অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপারে কোনপ্রকার জোর-জুলুমে বিশ্বাসী নয়, যার যেমন খুশী উপাসনা-পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। তবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এরা অনড় অটল— এ-ব্যাপারে কারুর সাথে কোন আপোষ নেই। কারণ, আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম এক, অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েও যদি ধর্মভাবে জীবন-যাপন করেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা ধার্মিক, আর যদি না করেন তবে নিশ্চয়ই অ-ধার্মিক।

ধর্মাচরণের সাথে উপাসনা-পদ্ধতির পার্থক্যটা কোথায় তা সবিশেষ অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। ধর্ম সমস্ত মনুষ্য-সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে, উপাসনা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট কোন মানব-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধর্ম উদার, উপাসনা-পদ্ধতি সংকীর্ণ। এখন দেখা যাক, এ-মতবাদ কোথায় প্রযোজ্য হতে পারে এবং কোথায় হতে পারে না। যারা মনে করেন, নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতিই খাঁটি, আর সব মেকি, তাদের ক্ষেত্রে এ মতবাদ কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উপাসনা-পদ্ধতির ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র ধর্মকেই ধ্রুবতারা করে জীবনের পথে এগিয়ে যান। এই নিরিখে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, একমাত্র হিন্দুরাই সকল প্রকার উপাসনা-পদ্ধতিকেই সমান চোখে দেখে এবং সমান মর্যাদা দেয়—খৃষ্টান বা মুসলমানরা দেয় না। হিন্দুর হিন্দুত্ব বলে ঃ কোন সম্প্রদায়ের মানুষকেই তার নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতি ত্যাগ করে, ধর্মাচরণের জন্যে, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে না; নিজ নিজ উপাসনা-পদ্ধতি মেনে চলার সাথে সাথে মানুষ হিসেবে 'মানুষের ধর্ম', যথা কাউকে হিংসা বা দ্বেষ না করা, সবাইকে ভালবাসা, সব মানুষই এক ঈশ্বর, আল্লাহ বা গডের সৃষ্টি বলে আপন করে নেয়া প্রভৃতি চিরন্তন (Eternal) কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে বলে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টান ও ইসলাম-পন্থীরা এ-সবে বিশ্বাসী নয়। তারা অপরের উপাসনা-পদ্ধতি ত্যাগ করে নিজ নিজ উপাসনা-পদ্ধতিতে সামিল হতে বলে। অন্যান্য উপাসনা-পদ্ধতির লোকেরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের উপাসনা পদ্ধতির সামিল না হয়, তবে তাদেরকে জোরপূর্বক এবং/অথবা প্রলোভন দেখিয়ে সামিল করার বিধান আছে।

সুতরাং এই দুই উপাসনা-পদ্ধতির সাথে যারা সমভাব প্রদর্শনের কথা বলেন, হয় তারা এঁদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না, নতুবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'মানবধর্মে' বিশ্বাসী যে হিন্দু-সমাজ তাকে প্রবঞ্চনা এবং বিপথগামী করেন। পূর্বোক্ত দুই উপাসনা-পদ্ধতির অনুগামীরা যতদিন না নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতির সাথে যুগপৎ 'চিরন্তন মানবধর্মে'ও বিশ্বাসী হবেন এবং অপরের উপাসনা-পদ্ধতির উপর আঘাত-হানা দূরের কথা, সমভাবাপন্ন হবেন ততোদিন পর্যন্ত তাদের সাথে সহাবস্থান সম্ভব নয়, সম্ভব নয় এদের উপাসনা পদ্ধতির প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া। এদের সাথে সমভাবাপন্ন না হবার আর ও একটি প্রধান কারণ আছে। সেটি হলো, এরা উভয়-ই বস্তুবাদে (Materialism, now-a-days called, Consumerism) বিশ্বাসী, আর হিন্দুরা অধ্যাত্মবাদে (Spiritualism) বিশ্বাসী। একপক্ষ ভোগ-কেই জীবনের উপজীব্য (Summum Bonum) বলে মনে করেন, অপরপক্ষ ত্যাগ-কে। কাজেই, এই দুই বিপরীতমুখী মানবগোষ্ঠীকে একই তুলাদণ্ডে ওজন করে সমতা ফিরিয়ে আনা কিংবা সমভাবাপন্ন করে তোলার অপচেষ্টা এবং পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

# আমি ধর্মনিরপেক্ষ নই, ধর্মের (Religiosity) পক্ষে ঃ তবে নিঃসন্দেহে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ

১৯৪৭-এর উত্তরযুগে ভারভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দিনের পর দিন, দশকের পর দশক ধরে দেশের শাসকগোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবি ও বিদেশী মদত-পুষ্ট সংবাদপত্রগুলি, নিজ নিজ দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থে যে-ভাবে ধর্মের প্রতি অধর্মাচরণ করে যাচ্ছে এবং সেকুলারবাদের (Secularism) হিন্দী বা বাংলা প্রতিশব্দ যে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মদ্রোহীতা, সে-ব্যাপারে কিছু কথা বলার জন্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে ধর্ম ও রিলিজিয়ন (Religion) নিয়ে দু'চার কথা বলা যাক। পরে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সেকুলারবাদের কথায় যাবো। ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ধর্ম শব্দটির উৎপত্তিস্থলও আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষ। তাই ভারতবাসীর নিকট ধর্মের আবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারণ করে আছে অর্থাৎ যা প্রতিনিয়ত প্রতিটি নর-নারীকে অধর্মের পথ থেকে ধর্মের পথে চালিত করছে তাকেই ভারতবাসী ধর্ম বলে আখ্যা দিয়েছে। এক কথায়, প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভারতবাসী ধর্মকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে কোন কর্মকেই কর্ম বলে স্বীকার করে না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী তথাগত রায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "ধর্মকে আশ্রয় না করে ভারতীয় সমাজচিন্তা ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেটের মতো ব্যাপার"। (সৌজন্যে—উদ্বোধন, কার্ত্তিক ১৪০৫)। পক্ষান্তরে, রিলিজিয়ন (Religion) সংকীর্ণ এবং বিশেষ কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ধর্মের ইংরেজী কখনই রিলিজিয়ন নয় বা হতে পারে না। যদিও যথেষ্ট নয় তবুও ধর্মকে বোধগম্য করার জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে এর একটি চলনসই ইংরেজী প্রতিশব্দ আমি ব্যবহার করি। তার নাম Religiosity যার বাংলা প্রতিশব্দ 'ধর্মভাব'। যেহেতু এই শব্দটির মর্মার্থ 'ধর্মভাব' তাই একে মন্দের ভাল হিসেবে 'ধর্ম' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি। যা কিছু সুন্দর, শিব ও সত্য তার সব কিছুর প্রতিফলন এই শব্দটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেখানে ধর্মভাব নেই তাকে ভারতবাসী কখনই ধর্ম বলে স্বীকার করে না। যেখানে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিফলন নেই তা আর যাই হোক ধর্ম আখ্যায় ভূষিত হতে পারে না। ধর্ম (ক) মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে না; (খ) সমস্ত

জীবনের মধ্যে শিবকে দর্শন করার অনুপ্রেরণা দান করে এবং শান্তি জোগায়; (গ) সৃষ্টির সমস্ত জীবকে আপন করে নিতে এবং ভালবাসতে শিক্ষা দেয়; (ঘ) পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়; (ঙ) সৎ-চিন্তা ও সৎ-সঙ্ঘের দ্যোতক। পক্ষান্তরে, রিলিজিয়ন (ক) মনুষ্যসমাজকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে; (খ) সমস্ত মানুষকে সমান চোখে দেখে না; (গ) মনুষ্য-সমাজে ঘৃণা ও হিংসার সৃষ্টি করে; (ঘ) বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে স্ব স্ব গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে উৎসাহ জোগায় (ঙ) পরমত-সহিষ্ণু নয়। সুতরাং তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ঃ ভারতবর্ষ 'ধর্মে' বিশ্বাসী; আর পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি (যেখানে প্রধানত খৃষ্টান ও মুসলমানের বাস) রিলিজিয়নে বিশ্বাসী।

ধর্ম এবং রিলিজিয়ন নিয়ে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য যদি পাঠকের বোধগম্য হয়ে থাকে তবে আশা রাখি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সেকুলারবাদের অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হবে না। আমাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন এবং ধর্ম-দ্রোহীতা। এর সাথে, একজন ভারতবাসী হিসেবে, আমি সব সময় একমত এবং পৃথিবীর যে-সব মানুষ ধর্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করে এগিয়ে চলেছেন তাঁরাও এর সাথে সহমত হবেন। আরও একটু পরিস্কার করে বলতে চাই, আমি এবং আমার সাথে যাঁরা একমত তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নই, পরন্তু ধর্মের-ই পক্ষে। এখানেই প্রশ্ন উঠবে, তবে সেকুলারবাদের বাংলা বা হিন্দী প্রতিশব্দ কী? উত্তরে স্বামী শিবপ্রদানন্দ বলছেন, " 'সেকুলারিজিম' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', অথচ তা হওয়া উচিত ছিল 'মতনিরপেক্ষতা'। ধর্মের (তা যে কোন মত বা পথেরই হোক না কেন) যথাযথ আচরণ মানুষকে পরমতসহিষ্ণু করে তোলে। মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় হয়তো ধর্মাচরণ সম্ভব, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন চিন্তা বা কর্মে অর্থাৎ ব্যক্তি বা সমষ্টিগত জীবনচর্যা ও চর্চায় তার বাস্তব প্রতিফলনও সমান গুরুত্বপূর্ণ"। (সৌজন্যে— উদ্বোধন, অগ্রহায়ন ১৪০৫)। এপ্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, যাঁরা ধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা যে যুগপৎ পরমতেও সহিষ্ণু, সে-কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যারা রিলিজিয়নে বিশ্বাসী (অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন উপাসনা-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী), তারা কখনই পরমতসহিষ্ণু নয়—তারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। অন্যের-ও যে একটা মত থাকতে পারে এবং সে-মতের মধ্যে-ও যে কিছু ভাল জিনিষ থাকতে পারে, তা তারা মোটেই আমল দিতে রাজি নয়। শুধু তাই নয়, অন্য মতকে সমান চোখে দেখা দূরের কথা, তাকে সহ্য পর্যন্ত করতে রাজি নয়। এবং যেহেতু তারা পরমত-সহিষ্ণু নয়, তাই তাদের দৈনন্দিন চিন্তায় ও কর্মে সংকীর্ণ রিলিজিয়নের প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয়—ধর্মাচরণের প্রতিফলন

পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং সেকুলারবাদের (Secularism) বাংলা বা হিন্দী প্রতিশব্দ-ও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, হতে পারে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা। অথবা, আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম-দ্রোহীতা বা ধর্মের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপেদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম (পড়ুন, উপাসনা-পদ্ধতি) জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।"

ভারতবর্ষ ধর্মভূমি। ভারতবর্ষের ধর্ম (Religiosity) কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। এদেশের অধিবাসীরা কখনই ধর্মের প্রতি ঔদাসিন্য, উপেক্ষা কিংবা তার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ সহ্য করে না। তাই তারা ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটির বাংলা বা হিন্দী প্রতিশব্দ 'ধর্ম' বলে এবং সেকুলারবাদকে (Secularism) ধর্মনিরপেক্ষতা বলে স্বীকার করে না—স্বীকার করে যথাক্রমে 'উপাসনা-পদ্ধতি' এবং 'উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা' বলে। এখানে আবার আমরা স্বামী শিবপ্রদানন্দের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি বলছেন, "বেদান্তের সর্বজনীন ধর্মের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দ আগামী পৃথিবীর মানুষের জন্য সমস্ত মত ও পথকে মানবতামুখী করেছেন। তাই যাঁরা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের প্রশ্ন তুলে মানবসমাজের অকল্যানের প্রশ্নটিকে বড় করে দেখতে চান তাঁরাই আবার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ভয়াবহ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ জাতপাতের আবহ সৃষ্টি করেন।" (সৌজন্যে—উদ্বোধন। অগ্রহায়ন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)। পরিশেষে বলতে চাই ঃ সংকীর্ণ রিলিজিয়নের (Religion) গন্ডী পেরিয়ে যাঁরা নিষ্ঠার সাথে ধর্মকে (Religiosity) মেনে চলেন, ধর্ম-ও তাঁদেরকে রক্ষা করেন এবং ঠিকপথে চালনা করে না। "ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"।

*"সবার জন্য যদি ঘর তৈরী করতে চাও নিজের ঘরে তোমার ঠাঁই হবে না, জেনো। মানুষের জীবনে যদি মূল্য ফিরিয়ে আনতে চাও, নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। মানুষের মুখে যদি হাসি ফুটাতে চাও, নিজের চোখে বান ডাকবে। মনে হয়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ গৌরবের উপযুক্ত হবেন। আর আমাদের সবার থাকবে সঙ্গীর গৌরব....।"* —জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার। (বক্সা স্পেশাল রিজার্ভ জেল। ৩১/১২/৪৪ ইং 'বন্দীর চিঠি,' পৃষ্ঠা ২০)

# মৌলবাদ বনাম
# মেকি সেকুলারবাদ (Pseudo-Secularism)

মৌলবাদের অভিধানগত অর্থ "মূল বা শিকড় সম্বন্ধীয়" যৎযাবতীয় চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা ও কাজকর্ম। এতৎ অর্থে যারা মূল বা শিকড়ের সন্ধানে কাজ করেন তাদেরকে মৌলবাদী বলার ভেতর কোন প্রকার অসঙ্গতি কিংবা বৈপরীত্য নেই। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের বেশ কিছু মতলববাজ রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র এবং বুদ্ধিজীবীর কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে [ যারা নিজেদের সেকুলারবাদী (উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ) বলে দাবী করেন ] এই নির্দোষ শব্দটিকে একটি 'গালবাচক' শব্দে পরিণত করা হয়েছে। সেকুলারবাদীরা যখন আস্ফালন করে বলেন, "মৌলবাদ নিপাত যাক, নিপাত যাক" তখন কেবল হাসির-ই উদ্রেক করে না, সাথে সাথে এদের অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্যে করুণা হয়। "মৌলবাদ নিপাত যাক" বলার সাথে সাথে প্রকারান্তরে এরা যে নিজেদেরই নিপাত ডেকে আনছেন এবং নিজেদের শিকড় বা মূলোৎপাটন করে চলেছেন সেকথা এদের বুঝাবে কে! অপিচ, মূল এবং মৌলবাদ শব্দ দু'টির সাথে আমাদের প্রত্যেকের বংশপরিচয় জড়িত এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহ্য জড়িত। সুতরাং এই মূল বা মৌলবাদ নিয়ে দু'চার কথা বলা নিশ্চয়ই অ-প্রাসঙ্গিক হবে না।

এই মূল বা শিকড়ের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসা-প্রদর্শন এবং সে-কাজে মনোনিবেশ করা যেমন ব্যষ্টিজীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি প্রতিটি জাতির জীবনেও নিজ নিজ জাতির মূল বা শিকড়-সন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করা এবং তাকে পুনরুদ্ধার বা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা একটি স্বাভাবিক প্রবনতা। এর ভেতর কোন অসঙ্গতি বা অন্যায় নেই। এককভাবে প্রতিটি মানুষ যেমন তার পিতা, পিতামহ, প্র-পিতামহ এবং তারও পূর্বে কে বা কারা ছিলেন, কোথায় ছিলেন, তাদের পেশাইবা কী ছিল, তাদের আচার-আচরণ কীরূপ ছিল, শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কতখানি অগ্রসর বা অনগ্রসর ছিলেন, তাদের উপাসনা-পদ্ধতিইবা কীরূপ ছিল এবম্বিধ নানাপ্রকার তথ্য জানার জন্যে আগ্রহী, ঠিক তেমনি সমষ্টিগতভাবে প্রতিটি জাতি-ই তাদের পূর্বপুরুষদের পূর্ববর্ণিত সব কিছু জানতে আগ্রহী।

প্রতিটি পরিবারের যেমন ঐতিহ্য আছে, তেমনি প্রতিটি জাতির-ও ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য ভাল বা মন্দ দুই-ই হতে পারে। পরিবারের ক্ষেত্রে সেই ঐতিহ্য যদি সুখকর এবং মঙ্গলজনক হয় তবে অবশ্যই সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। পরিবারের ক্ষেত্রে যা

প্রযোজ্য জাতির ক্ষেত্রেও সমভাবেই তা প্রযোজ্য। বহু পরিবার নিয়ে গঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট কোন পরিবারের ঐতিহ্য যদি জাতীয়-জীবনের মূল স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে কিংবা প্রতিকূল হয়, তবে জাতীয় জীবনে তার প্রভাব খুব একটা পড়বে না। কিন্তু গোটা জাতির ঐতিহ্যই যদি মানব-মঙ্গলের পক্ষে অনুকূল না হয় তবে জাতীয়-জীবন কলুষিত এবং পর্যুদস্ত হতে বাধ্য। তাই সে-ঐতিহ্য পরিত্যজ্য। পক্ষান্তরে, কোন জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্টি ও সভ্যতা, বৃহৎ মানবসমাজের পক্ষে হিতকর হয়েও, যদি সাময়িকভাবে বিদেশীদের আক্রমণে বা অন্য কোন কারণে কোনঠাসা হয়ে গিয়ে থাকে তবে অবশ্যই তাকে স্বমহিমায় পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার মানসে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। হাজার বছর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা-অর্জনের মুখোমুখী ঠিক সেই মুহূর্তে গান্ধী, নেহেরু এণ্ড কোং দেশবাসীর প্রতি চরম আঘাত হানলেন। দেশ-ভাগে রাজি হলেন। নেহেরুজীকে খণ্ডিত ভারতের মনসবদার বানিয়ে গান্ধীজী দেহরক্ষা করলেন। ভারতাত্মা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইলো। নেহেরুজী ও তার বংশধরেরা বিগত ৫০ বৎসর ধরে সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারের কোনপ্রকার চেষ্টা তো করলেনই না পরন্তু, এর পুনরুদ্ধারের কাজে যাঁরা দেশবাসীকে মূলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলছেন এবং সীমাহীন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শনৈঃ শনৈঃ অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাঁদেরকে মৌলবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, Obscurantists প্রভৃতি আখ্যায় ভুষিত করে তাদের চলার পথ প্রতিমুহূর্তে পিচ্ছিল করে দিচ্ছেন। দেশের ৮৫% শতাংশ নাগরিকের প্রতিনিধি হয়ে প্রতিমুহূর্তে তাদেরই "নিপাত যাক"-কামনা করা যে কতখানি দেশদ্রোহীতার কাজ তা তারা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু তারা এ-ও জানেন, দেশের আপামর জনসাধারণকে যতদিন নিরক্ষরতার অন্ধকারে রাখতে পারবেন ততদিন তাদের গদিচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই। তাই তারা দেশ-বাসীকে শিক্ষার আলো থেকে দীর্ঘ ৫০ বৎসর ধরে দূরে রেখেছেন। এ-ব্যাপারে Ruling এবং Opposition দলগুলির মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে। সে-চুক্তির (চুক্তি না বলে ষড়যন্ত্র বলাই শ্রেয়) মর্ম সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আজো কোন শক্তিশালী গোষ্ঠী এগিয়ে এলো না। "বন্দেমাতরম্"-সঙ্গীত ও "সরস্বতী"-বন্দনা-র মতো একান্ত মৌলিক দু'টি কাজের সার্থক রূপায়ন দূরের কথা, আজো দেশের শাসকগোষ্ঠী (তা যে রং-এরই হোক না কেন) সংখ্যালঘিষ্ঠদের খুশী রাখার জন্যে এ দু'টি ব্যাপারেও প্রতিমুহূর্তে আপোষ করে চল্ছেন। এর চেয়ে জাতির দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!

এতক্ষণ আমরা মূল, মৌলবাদ ও মৌলবাদী নিয়ে কিছু কথা বল্লাম।

এবার সেকুলার, সেকুলারবাদ ও সেকুলারবাদী নিয়ে দু'চার কথা বলবো। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে সেকুলারবাদের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই এবং সেকুলারবাদের বাংলা বা হিন্দী প্রতিশব্দও ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; হতে পারে, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা কিংবা উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা বা অন্য কোন শব্দ যার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই—আছে, আচার-অনুষ্ঠানের সম্পর্ক। কিন্তু সেকুলারবাদীদের প্রচার-যন্ত্র এতোই শক্তিশালী এবং ধর্মের প্রকৃত অর্থ যে কী সে-ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা এতোই সীমিত, যার সুযোগ নিয়ে এরা সেকুলারবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। সেকুলারবাদের বাংলা প্রতিশব্দ যে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, তা না হয় বুঝা গেলো কিংবা ধরে নেয়া গেলো কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝায় এবং সেকুলারবাদ বলতেই বা কী বুঝায় তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

আমাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মাচরণে ঔদাসিন্য কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন বুঝায়। আর সেকুলারবাদের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, শ্রী তথাগত রায় মহাশয়ের মতে "উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা"। ধর্ম কোন নির্দিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর সম্পদ নয়—পৃথিবীতে যতো মানুষ আছে তাদের সবার সম্পদ। পক্ষান্তরে সেকুলারবাদের অর্থ হলো, বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা নির্দিষ্ট কোন মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যে-সব উপাসনা-পদ্ধতি বা রীতি-নীতি গড়ে ওঠে সে-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির নিরপেক্ষতা প্রদর্শন। [ তবে ধর্ম অর্থে মানব-ধর্ম বুঝায়, যা সর্বপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতির মানুষরেই মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কারণ ধর্ম একটাই—উপাসনা-পদ্ধতির ন্যায় এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেই। ] এখানে মনে রাখতে হবে, সে-সব রীতি-নীতি বা উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ এক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের উপাসনা-পদ্ধতি যেন অপর কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতির উপর আক্রমনাত্মক না হয়। যদি হয়, তবে তা পরিহার বা ত্যাগ করতে হবে। যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করে, তবে তাদেরকে দেশের সাধারণ আইন মোতাবেক ত্যাগ বা পরিহার করতে বাধ্য করা হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না, যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন সবার জন্যে সমান থাকবে।

সেকুলারবাদের নামে মেকি সেকুলারবাদীরা কীভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধন-প্রাণ, মান-সম্মান, ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিসভ্যতা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী তথাগত রায় মহাশয়ের "ভারতে সেকুলারবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এ-প্রসঙ্গের ইতি টানবো। সেকুলারবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রায় মহাশয় স্বামীজীর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে স্বামীজী বলছেন, "...তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থল হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া

আবার নতুন খাতে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয় তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।" (জাগো যুবশক্তি)। অতঃপর রায় মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানে রাষ্ট্রের থেকে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে আলাদা করবার সাহস পণ্ডিত নেহেরু বা তাঁর কন্যা পেলেন কোথা থেকে? সোজা উত্তর ঃ জাতির অপরিসীম দুর্ভাগ্য থেকে!" তিনি বলে চলেছেন ঃ "...বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা বহুকাল ধরে চোরাপথে ভারতে ঢুকছে এ কথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এর ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অর্থনীতির উপর বিষম চাপ পড়ছে, জনবিস্ফোরণ ঘটছে,জনসংখ্যার অনুপাত বদলে যাচ্ছে—এও আজ অনস্বীকার্য। অথচ এই সেকুলারবাদীরা গত দশ বছর ধরে অনুপ্রবেশ চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসনে বসে সেকুলার নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া চোরাপথে সীমান্ত পার সমর্থন করে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ন্যাকামীর দৃষ্টান্ত রেখেছেন ঃ 'ওপারেও বাঙ্গালী, এপারেও বাঙ্গালী। যাওয়া আসা চলেই থাকে'।

"...ওড়িশার এক মিশনারী ও তাঁর দুই কিশোর পুত্রকে পুড়িয়ে মারা যতটা ঘৃণিত, যতটা দুর্ভাগ্যজনক, বিহারে শয়ে শয়ে দলিত খুন, অনুরূপ সংখ্যার জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু খুন, ত্রিপুরায় বাঙ্গালী খুন নিশ্চয়ই অন্তত ততটাই ঘৃণিত, ততটাই দুর্ভাগ্যজনক। অথচ প্রথমটির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চাকরিই চলে গেল। আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে সেকুলার সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করাকে 'নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ' বলে নাচানাচি করল। আর তৃতীয়টির ও চতুর্থটির ব্যাপারে সবাই চুপ।

"সেকুলারবাদের আশ্রয় নিয়ে আজ যে কোন অন্যায়কেই চাপা দেওয়া যায়—এব্যাপারে লালুর গোখাদ্য চুরির অভিযোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, যে-তত্ত্ব এই ধরণের বিকৃতির জন্ম দিতে পারে তা কি আজই, এখনই পরিত্যজ্য নয়? রাষ্ট্র দলমত-উপাসনাপদ্ধতি নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান চোখে দেখবে—একথা অনস্বীকার্য এবং সভ্যতারই নিদর্শন। কিন্তু সেকুলার হতে হবে, তাই সংখ্যালঘুকে বেশী অধিকার দিতে হবে, সংখ্যাগুরুকে কম, একই দেশে মানুষের জন্য আলাদা আলাদা আইন হবে, সংখ্যালঘুর ধর্মীয় অধিকার রক্ষার নামে সামাজিক কুপ্রথা জিইয়ে রাখতে হবে—এ কোন্ দেশী কথা? সংবিধানের গোড়ার অনুচ্ছেদটি থেকে জরুরী অবস্থার এই অবৈধ সন্তানটিকে এবার সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।" *(সৌজন্যে— বর্তমান ২৩.৩.৯৯ ইং)।*

# সরস্বতী-বন্দনায় আপত্তি

ভারতবর্ষ একটি ঐতিহ্যবাহী দেশ। পৃথিবী যখন ঘোর তমিস্রার মধ্যে ছিল তখন পুণ্যভূমি আর্যাবর্তের আর্য-ঋষিরা জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর ছিলেন। জ্ঞানের চর্চা যেখানে হতো তাকে তাঁরা জ্ঞানের মন্দির বলতেন। মন্দির আছে, অথচ বিগ্রহ (Icon) নেই, তা তো হতে পারে না। তাই তাঁদের মানসপটে ভেসে উঠলো এক দেবীপ্রতিমা যাঁকে তাঁরা জ্ঞান-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন। রূপ বর্ণনায় বল্লেন, তিনি শুভ্রবরণা, শুভ্র বসনা এবং বীণাবাদনরতা। আর তাঁর বাহন-ও একটি হংস যার রূপও শুভ্র। শুভ্রতাকে যদি আমরা শুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক ধরি, তবে দেখা যাবে সেই ধ্যানের মূর্তিটি সবদিক দিয়েই শুচি-শুদ্ধা এবং আরাধ্য জ্ঞানেরই প্রতিমূর্তি। এবার নাম রাখার পালা। যেই ঋষিরা এই দেবীর নামকরণ করেছিলেন সরস্বতী বলে, কারণ তাঁরা স্বচ্ছতোয়া সরস্বতী নদীর অববাহিকায়ই বাস করতেন। এখানে উল্লেখ্য, আর্যাবর্তের মানুষ নদ বা নদী যা-ই হোক না কেন, যেহেতু তারা জীবের তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রাণ বাঁচায় তাই তারা আরাধ্য বা আরাধ্যা। অযাচিতভাবে প্রকৃতি তার সমস্ত সম্ভার জীবের হিতার্থে প্রতি মুহূর্তে দিয়ে যাচ্ছে। তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেই কৃতজ্ঞাতা-স্বীকার বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে শ্রদ্ধা এবং বন্দনার মধ্য দিয়ে। তাঁদের মতে শ্রদ্ধাবানরাই জ্ঞানাহরণের অধিকারি (শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্), অন্যেরা নয়। সুতরাং হিন্দু হয়েও যারা বাগ্‌দেবী-বন্দনায় আপত্তি জানায়, প্রকৃতপক্ষে তারা একদিকে হিন্দুর বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরীতা প্রদর্শন করেন, অপরদিকে জ্ঞান আহরণের জন্যে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয় তার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রশ্ন তুলতে পারেন : জ্ঞানাহরণের জন্যে কি কোন প্রতীক বন্দনার প্রয়োজন আছে ? আছে সেইসব প্রতীকের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপনের? উত্তরে বলবো : নিশ্চয়ই আছে। যাদের ঐতিহ্য নেই, তাদের ঐতিহ্যবাহী জাতির অনুসরণ করতে হবে। আর যাদের ঐতিহ্য আছে তাদের তা মেনে চলতে হবে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে রাখতে হবে : ঐতিহ্য মানে কুসংস্কার নয়, ঐতিহ্য মানে অনুকরণযোগ্য ও অনুধাবনযোগ্য উচ্চ কিছু আদর্শ। পূর্বসূরীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর প্রতি শ্রদ্ধাবান না হলে কেউ কোনদিন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। এই প্রসঙ্গে

দি ষ্ট্যাটস্‌ম্যান পত্রিকার ১১.৩.৯৯ তারিখে মিঃ এস. কে. চক্রবর্তীর "প্রতীকের প্রয়োজন আছে" (Icons are needed)-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি মনে করেন, "সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রতীক যথেষ্ট পরিমানে সাহায্য করে"। প্রাবন্ধিক মহাশয় কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের' 'ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ফর হিউমেন ভেল্যুজ'-এর আহ্বায়ক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় মুরলী মনোহর যোশীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-মন্ত্রীরা সমবেত হন। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়েরা যখন শুনলেন যে "সরস্বতী বন্দনা" দিয়ে সভা আরম্ভ হবে তখন তারা বিশ্রীভাবে 'চলবে না, মানি না' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে সভাকক্ষে ত্যাগ করেন। মনে হয়, এ-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত প্রবন্ধটি লিখিত। প্রাসঙ্গিক বিধায়, তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে দিলাম।

"On the occasion of one of the death anniversaries of Deshabandu C. R. Das, Netaji had himself said that the first step towards greatness or becoming a hero was to worship the great, the hero. No wonder today we have only pygmies around, no giant, because the ennobling instinct for heroism has been systematically eliminated during the last fifty years.

* * *

"By staging walk-outs in response to the singing of Saraswati Vandana our political leaders reveal their childish petulance and ignorant arrogance. Saraswati is the icon of learning, of wisdom. Do not our governments, legislators and others who manage the nation need wisdom? The Saraswati icon helps us to focus our Shraddha towards an adorable symbol of chaste wisdom. **If other cultures do not possess such a variety of sacred symbols, so be it. But why should India abandon her own?**

* * *

"We also have it from first hand sources that at Harvard University and elsewhere in the West, Socrates and Plato, the two icons of western culture, are now compulsory reading for undergraduate students. Why? The need to go to the roots. I know from recent personal experience how sincerely many learned white Australians are trying to retrieve, appreciate and honour the aboriginal culture of that continent, Why? To go to the roots again, **But in India many public leaders declare that by referring to the Upanishads or epics India is being pushed back a thousand years. May God save India from such idiotic iconoclasts. Vinaskale Viparit buddhih".**

সরস্বতী-বন্দনা নিয়ে কিছু কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রাবন্ধিক শ্রী প্রণবেশ চক্রবর্তী মহাশয় লিখছেন ঃ প্রকৃতির অবদানে মানুষের

আপন ঐশ্বর্যময় ও সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই আমরা সেই সদা কল্যানময়ী প্রকৃতির [illegible] রূপকে বন্দনা করে থাকি। এতেও আপত্তি? 'বন্দেমাতরম' গানে আপত্তি, সরস্বতী বন্দনায় আপত্তি, এরপর কোনওদিন যদি ভারবর্ষের নামেও আপত্তি ওঠে (কারণ, ভরত রাজার নাম থেকে এর উৎপত্তি), অথবা আপত্তি ওঠে হিন্দুস্থান নামে—তাহলে আমরা নতজানু হয়ে সেই আপত্তিকেও শিরোধার্য করে নেব? ক্লীবতা আর কাকে বলে? *(সৌজন্যে—বর্তমান, ১২.১.৯৯)।*

"নিশ্চয়ই শিরোধার্য" করে নেবো! আমরা যে সিকিউলারিষ্ট! ধর্মঠর্ম নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আমাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, কী করলে খণ্ডিত ভারতের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলমানরা (দেশবিভাগের পর যাদের ভারতনামক ভূখণ্ডে একদিনও থাকার অধিকার নেই) নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে এবং বিনাবাধায় মুসলমানী করার কাজ চালিয়ে যেতে পারে! এক কথায় বলা চলে, সর্বদিক থেকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করাই সিকিউলারিজমের (ভারতীয় সংস্করণ) মূল কথা—সংখ্যাগুরুদের স্বার্থরক্ষা করা সিকিউলারিজমের কর্মসূচীর অন্তর্গত নয়। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা যদি ধূলায় লুণ্ঠিত হয় হোক, ভবিষ্যত বংশধররা যদি মুছে যায় যাক; শুধু নির্বাচনের সময়ে (তা যে-কোন নির্বাচনই হোক না কেন) সংখ্যালঘুদের ভোটটা যেন মেকি সেকুলারিষ্টদের বাক্সে পড়ে।

*"সজ্ঞানে অজ্ঞানে একরতি দেশের কাজ যদি কোনদিন আমরা করতে পাই, সেদিন কৃতজ্ঞতা দাবীর কাবুলিওয়ালাটাকে জব্দ রাখবার মত সংযম যেন ভগবান আমাদের দেন। স্বদেশবাসীর মুখে আত্ম-সম্মানের দীপ্তি আর তৃপ্তির হাসি, এর চেয়ে বড় পুরস্কারের বস্তু দেশ-প্রেমিকের নেই। তবে রক্ত মাংসের মানুষ উপরি যেটুকু দাবী করবে তাতে বাড়াবাড়ি না থাকলেই হোলো। ভালবাসতে পারাই ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এই তো শুনে আসছি সৌভাগ্যবানদের কাছে। দেশের কাজে আত্মপ্রচারের অপচেষ্টা থেকে ভগবান যেন আমাদের রক্ষা করেন। ভালবাসার বস্তুকে শ্রীমণ্ডিত, গৌরবান্বিত করে তুলবার কাজে, ঔদাসিন্য তথা নৈষ্কর্ম্য যখনই দেখা দেবে তখনই বুঝতে হবে, এ-ভালবাসাটা মুখের, অন্তরের নয়।"* —জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার। (রাজসাহী জেল। ৬.৯.৪২ ইং। বন্দীর চিঠি। পৃঃ ১৭)।

# সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এবং ও.বি.সি.

উপরোক্ত শব্দগুলো ইংরেজী ভাষার অন্তর্গত। এদের সরকারী বাংলারূপ যথাক্রমে তপসিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যন্য অনুন্নত জাতি। কিন্তু প্রকৃত বাংলা হওয়া উচিত তপসিলী বা নথিভুক্ত শ্রেণী, উপশ্রেণী এবং অন্যন্য অনুন্নত শ্রেণী। প্রথম দুটি ইংরেজের সৃষ্টি এবং শেষেরটি স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কংগ্রেসের সৃষ্টি। বিরাট হিন্দু সমাজে বিভাজন আনার জন্যে ইংরেজরা অনুন্নত শ্রেণী সমূহের দু'টি তালিকা তৈরী করে একটির নাম দিলেন সিডিউল্ড কাস্ট এবং অপরটির নাম দিলেন সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স।

প্রথমে সিডিউল্ড (Scheduled) শব্দটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। সিডিউল্ড শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ তপশিল বা নথিভুক্ত। হিন্দু সমাজে তো বর্ণ-বৈষম্যের অন্ত নেই। তাই এদের নিয়ে পূর্বোক্তরূপে দু'টি তালিকা তৈরী হলো। এই শ্রেণীবিভাগ যে কতখানি উদ্দেশ্যমূলক (পড়ুন, বদ-উদ্দেশ্য) ছিল তার একটি নমুনা দিচ্ছি। যখন অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা প্রথম তৈরী হয়, তার মধ্যে বাংলার তিলি ও সাহা শ্রেণী দুটিকে-ও এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়। পড়ে ডঃ মেঘনাথ সাহা ও ভাগ্যকুলের কুমার বাহাদুরের হস্তক্ষেপে উক্ত তালিকা থেকে সাহা ও তিলি শ্রেণীকে বাদ দেয়া হয়। মোট কথা, যে-সব শ্রেণীর মানুষের মুখপাত্র হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউ ছিলেন না, তাদেরকেই খেয়াল-খুশী-মত পূর্বোক্ত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করে বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর ১৯৪৭ সনের পর দিল্লীর মসনদে যারা অধিষ্ঠিত হলেন, তারা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে "মণ্ডল কমিশন" গঠন করে আরো কিছু শ্রেণীর সন্ধান নিতে বল্লেন। যথাসময়ে উক্ত "কমিশন" তাদের কাজ শেষ করে যে দলিল সরকারের নিকট পেশ করলেন, তা দেখে সরকার সে দলিল কার্যকর করতে সাহস করেননি এবং বস্তাবন্দী অবস্থায়-ই পড়েছিল। কিন্তু যখন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন (১৯৯০) তখন তিনি আস্তাকুড়ের স্তুপ থেকে সেই কুখ্যাত "মণ্ডল কমিশনের" রিপোর্ট তুলে আনেন এবং কার্যকরী করেন। এদের নাম দেয়া হয় ও.বি.সি. বা Other Backward Classes. অর্থাৎ ইংরেজরা বিদেশী হয়ে যা করেননি, এমন কি কংগ্রেসও যা করেনি মেকি জনদরদীর ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিন হিন্দুসমাজের প্রতি বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মহাশয় যেভাবে দেশদ্রোহীতার কাজ করলেন দেশ তা কোনদিন ভুলবে না। নিজেদের হাতে ক্ষমতা আসার পর কোথায় দেশবাসীকে একত্রিত করার কাজে নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হবেন, আর কোথায়

তার পরিবর্তে এ-মাধ্যয়ে দেশকে বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের পথে ঠেলে দিলেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

"সিডিউল্ড" শব্দটি শুনলে বা বললে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মোটেই সুখকর বা সম্মানজনক নয়—মনে হয়, এরা অবশ্যই অন্ত্যজ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। Scheduled শব্দের অর্থ নথিভুক্ত বা তালিকাভুক্ত। হিন্দুসমাজে বিভাজন আনার জন্যেই বৃটিশরা একাজ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতির লোক বসবাস করেন—হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। মুসলমান ও খৃষ্টানদের চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে এতো শ্রেণী আছে, যাদেরকে ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। হিন্দুসমাজে এতো শ্রেণীর অবস্থান নিশ্চিতরূপে একটি অভিশাপ। ইংরেজরা সে সুযোগ নিয়েছিল। উন্নত, অনুন্নত, গিরিবাসী ও বনবাসী, যেখানেই যারা বাস করুন না কেন মূলত এরা সবাই বিরাট হিন্দুসমাজের এক একটি অংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। মুসলমানদের তো অনেক আগেই ইংরেজরা পৃথকীকৃত করেছিল। বাকী ছিল, হিন্দু সমাজের বিভাজন। তা-ও বর্ণহিন্দু, সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এই তিনভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা হলো।

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রনেতারা প্রথম দশ বছরের জন্যে সিডিউল্ড কাস্ট ও ট্রাইব্‌সদের জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দশ বৎসর পর এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেবার বিধান ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা তো হলোই না, অধিকন্তু ও.বি.সি. জাতীয় একপ্রকারের নয়া ভূত ভারতবর্ষের হিন্দুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হলো। আমরা মনে করি জাত পাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে তুলে দেয়া হোক; পরিবর্তে অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে আছেন তাদের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হোক। স্বেচ্ছায় শাসকগোষ্ঠী একাজ করবেন না, জানি। তাই সংঘবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা এ দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন।

*"ওদের (পড়ুন, ইংরেজদের) শত সহস্র কর্ম হয়তো নিন্দনীয়, কিন্তু ওদের দেশাত্মবোধে ত্রুটি ধরে না তো কেউ। ওরা দেশকে ভালবাসে সহজভাবে, তার জন্য আত্মদানও করে স্বধর্মকে মেনে। আর আমাদের দেশে এ ব্যাপারটা যেন কৃত্রিমতায় ভরা।"* — জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার, ('বন্দীর চিঠি', পৃঃ ১৭)।

# সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে; কিন্তু আজো তার কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। বিশেষভাবে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। ইংরেজ শাসনের কারণে ভারতের সর্বত্র ইংরেজী ভাষার বহুল প্রচলন ছিল এবং অন্তর্দেশীয় যাবতীয় কাজ এই ভাষার মাধ্যমই নিষ্পন্ন হতো। তাই ইংরেজ চলে যাওয়ার পরও সেই ভাষাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব মুখ্য ভাষা আছে তাদের সব কটিকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার অনেকেই পক্ষপাতি। কিন্তু কেন্দ্র তাদের এযুক্তি মেনে না নিয়ে একটা সমঝোতোর পথ বেছে নিলো এবং ঘোষণা করলো, যতোদিন পর্যন্ত দেশের লোক হিন্দীভাষায় অভ্যস্ত না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত সহযোগী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষাও দেশের সর্বত্র চালু থাকবে। তবু-ও হিন্দীর পরিবর্তে সংস্কৃতকে যারা দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবীদার ছিলেন তাদের কথায় কর্ণপাত করা হলো না। একটা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টায় (যাকে খেলাও বলা চলে) মেতে রইলেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে দীর্ঘ বাহান্ন বছর পরও কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে হিন্দীর পাশাপাশি ইংরেজী বহাল তবিয়তে বিদ্যমান আছে—এককভাবে হিন্দীর মাধ্যম যোগাযোগ স্থাপন বা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কিনা সে-ব্যাপারে-ও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মতো অদূর ভবিষ্যতে না হলেও সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সকল ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এতে জটিলতা এবং অর্থব্যয় প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পাবে, সাথে সাথে জাতীয় সংহতিও পদে পদে বিঘ্নিত হবে।

পক্ষান্তরে, যারা সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাদের দাবী মেনে নিতেন তবে বিগত বাহান্ন বছরে ইংরেজীর পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার প্রচলনও বিশেষ পরিমানে বৃদ্ধি পেতো এবং জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে দেশ ও জাতি অনেক পরিমানে এগিয়ে যেতো। আজ যেমন দেশের আপামর জনসাধারণ ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্থ নয়, অথচ এভাষাকে বাদ দিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য তেমনি সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও শিক্ষার ব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রশক্তি যদি যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন তবে আমার বিশ্বাস, বিগত বাহান্ন বছরে সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষের লিঙ্গোয়া ফ্রাংকা (Lingua Franca) হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে পারতো। কিন্তু না, এক্ষেত্রে-ও যে-ভাষা দেশের

কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শাসকগোষ্ঠী মেরুদণ্ড সোজা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারলো না। কী করে পারবে? যে-দেশের প্রধানমন্ত্রী (পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু) সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজেকে মুসলিম (Culturally I am a Muslim) বলে মনে করেন, হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষার বা পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে তিনি যে কতদূর সহায়ক হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে কি? তদুপরি রয়েছে, (১) ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী যারা সংস্কৃতকে একটি 'মৃতভাষা' বলে মনে করেন। কিন্তু ভুলে যান, ভারতের যে-ভাষাতেই (মাতৃভাষা) তারা কথা বলুন না কেন, তার সব ভাষারই জননী সংস্কৃতভাষা এবং সব ভাষা-ই এই ভাষার কাছে ঋণী। (২) এতদ্ব্যতীত রয়েছে মুসলমানদের দাবী, যদি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় তবে উর্দুকেও (যাদের মাতৃভাষা পাঁচ শতাংশের বেশী হবে না) রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। (৩) সর্বোপরি রয়েছে মুসলিম ভোটব্যাংকের হাতছানি। সুতরাং কাজ নেই সংস্কৃত সংস্কারের, আপাতত ইংরেজীকে সামনে রেখেই কাজ চলুক। "After me the deluge"-নীতি মেনেই পণ্ডিতজী অগ্রসর হয়েছিলেন। ফলশ্রুতি যা হবার তাই হলো—হিন্দীভাষা নামে মাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়ে রইলো, কার্যকরী ভাষারূপে ইংরেজীই প্রাধান্য পেলো।

এখন দেখা যাক, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করলে ফল কী দাঁড়াতো এবং জাতীয় সংহতির দিক দিয়েই বা তা কতখানি সহায়ক হতো। এব্যাপারে শ্রদ্ধেয় অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কী বলেন তা শোনা যাক। তিনি বলছেন, "...সমগ্র ভারতবর্ষের বহু বৈচিত্র্যবিমণ্ডিত নানাভিসারিণী সুষমার মধ্যে একযোগে মিলিত একটি প্রাণ-স্পন্দনের উপলব্ধি চাই এবং তাহার বাহন হইবে সংস্কৃত। ...ভারতের সকল ভাষাই এই একটি ভাষার সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে একদা ভারত - বিশ্বের 'এস্‌পারেন্টো' (Esperanto) হইতে পারিত।

"গণ-পরিষদের অধিবেশন কালে সংস্কৃত ভাষার স্বপক্ষে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, যাঁরা হিন্দু নহেন এমন সদস্যও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যাহা ভুল তাহা ভুলই। একটি ভুল সিদ্ধান্ত জাতির উপর চাপিয়া পড়িলে তাহার কুফল জাতিকে দীর্ঘকাল ভুগিতে হয়, তাহার বেগ ও উদ্বেগ দীর্ঘকাল জাতিকে সহিতে হয়। বিগত সপ্তবিংশ বর্ষকাল যদি ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতের অল্প অল্প করিয়াও চর্চা রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আজ এই মুহূর্তে একটি আসামবাসী কেরলে যাইয়া, একটি তামিলনাডুর অধিবাসী গুজরাটে যাইয়া, একজন মহীশূরের কান্নাড়বাসী উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার যাইয়া রেল স্টেশনে কথা বলিতে পারিত 'টিকিটং দেহি', রেলওয়ে স্টলে বই কিনিতে যাইয়া

বলিতে পারিত, 'অনেন পুস্তকেন নাস্তি প্রয়োজনম্, অন্যতরং দীয়তাম', হোটেলে গিয়া বলিতে পারিত 'অন্নং দেহি, দ্বিদলং দীয়তাম, অম্লরসায় অলম্'। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহার অর্থ বুঝিতে পারিত। সংস্কৃত যে কঠিন ভাষা একথা এক হিসাবে সত্য হইলেও, ইহা অতীব সহজভাষাও বটে । সহজ সরল শব্দের সংখ্যা সংস্কৃতে লক্ষাধিক হইবে। ব্যাকরণের মারপ্যাঁচকে সরলীকৃত করিবার উপায় আমাদের সকলেরই হাতে রহিয়াছে। সেই দিকে মন দিলে ভারতীয় মনীষা ছয় মাসে বা এক বৎসরে সমস্যা সমাধান করিতে পারিত।

''অতি প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত পৌরাণিক যুগের সংস্কৃতের যেমন পার্থক্য আছে, সরলীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইলে আধুনিক সংস্কৃতের সহিত মধ্যযুগের সংস্কৃতের তেমনই কিছু পার্থক্য ঘটিত মাত্র, তাহার দ্বারা শব্দগুলির ভাব-বহনের সামর্থ্য কমিয়া যাইত না। ভারতীয় সংস্কৃতি সত্যই একটি মুস্কিলে পড়িয়াছে সেইখানে যেখানে হিন্দীতে আত্মা হইবে স্ত্রীলিঙ্গ, হৃদয় হইবে স্ত্রীলিঙ্গ এবং যেখানে সংস্কৃতে আত্মা হইবে পুংলিঙ্গ এবং সংস্কৃতে হৃদয় হইবে ক্লীবলিঙ্গ।

''যে কোনও একটি নির্দিষ্ট উৎকৃষ্ট ভাষাকে সৎসংসর্গের উপলক্ষ করিয়া যখন পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতে থাকে, তখন আস্তে আস্তে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পাঁচটি ভাষার ভিতরে এমন সব সাদৃশ্যের এবং আনুরৌপ্যের সৃষ্টি হইতে পারে, যে দুই এক শতাব্দী পরে দেখা যাইবে যে,এই কয়টি ভাষা যেন একেবারেই বিচ্ছিন্ন নহে, একটি আর একটির করোলারি (Corollary) বা অনুপূরক মাত্র।

''ভারতে বিলুপ্ত ও প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃতেরই এতটা ঐশ্বর্য্য আছে, অন্য কাহারও নাই।

''বলা হইয়া থাকে, সংস্কৃত অপ্রচলিত ভাষা, বহুশতাব্দী আগেই ইহার চিতার আগুন নিভিয়া গিয়াছে; এখন আর চিতাভস্ম সমগ্র ভারতে ছড়াইবার প্রয়োজন নাই, কেন না, ভস্ম শুধু ভস্ম মাত্র, অগ্নিও নহে, মৃত্তিকাও নহে, ফসলও নহে, ইহা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে এবং কদিন পরে বিস্মৃত হইবে।

''কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তদ্রুপ বস্তু নহে। ভারতভূমির অধিকাংশ ভাষা-ভূমিকেই সংস্কৃত ভাষার মহাসাগর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। স্বভাবত যাহা হইয়া আছে, তাহার সহিত জাতির পুরুষকার সংযুক্ত হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

''দক্ষিণ ভারতে কিছু সংখ্যাক ভারতীয় এখনও গৃহসংসারে এমন কি নিভৃত শয্যায় কাহার-ও সহিত কথা কহিতে হইলে সংস্কৃতেই কহিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ গৃহস্থ, তাহারা টোলের ছাত্র বা কলেজের অধ্যাপক

নহে। তাহারা সংখ্যায় পরিমিত। সংখ্যাল্পতার যুক্তিতে সংস্কৃত ভাষার মহত্বকে অস্বীকার করা বাতুলতা।" (বিদ্যার্থী রঞ্জন, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮৩। সৌজন্যে—বিশ্ব হিন্দু বার্তা, পৌষ ১৪০৫)। দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দারা যে মোটেও সংস্কৃতভাষাকে একেবারে বনবাসে নির্বাসিত করেননি তার প্রকৃষ্ট প্রমান হলো, সেখানকার মানুষ ও বসতির নাম অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত-ঘেষা, যেমন স্থানের নাম ত্রিবান্দ্রাম, ভিজাগাপট্টম, রামেশ্বরম, তিরুভানান্তপুরম্ ইত্যাদি, মানুষের নাম যেমন, চিদাম্বরম্, কুমারমঙ্গলম, ভেঙ্কটরমন প্রভৃতি। অতি আধুনিক কালে "বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়েলকে" কেন্দ্র করে সমুদ্রোপকূলে যে "বিবেকানন্দপুরম" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নামকরণ বিবেকানন্দনগর না হয়ে হলো বিবেকানন্দপুরম। এর চেয়ে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন দেখিনা।

সুতরাং কৃষ্টি ও সভ্যতার পুনর্জাগরণ ও জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে এবং এর প্রচার ও প্রশিক্ষণের জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থাও নিতে হবে। তাই আমাদের প্রস্তাব ঃ ভারতের প্রতিটি নাগরিককে তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে। প্রাথমিক স্তরে থাকবে মাতৃভাষা যা আরম্ভ হবে একেবারে শৈশব থেকে, দ্বিতীয় স্তরে ইংরেজী ভাষা যা আরম্ভ হবে শিক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে এবং তৃতীয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা যা আরম্ভ হবে শিক্ষার চতুর্থ শ্রেণী থেকে এবং এই তিনটি ভাষারই পঠন-পাঠন চলবে স্নাতকস্তর পর্যন্ত। অতঃপর আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে কেউ কেউ যদি ইচ্ছে করেন, সংস্কৃত-শিক্ষা চালিয়ে যাবেন, তবে তাদের জন্যে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রয়োজনমত মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

*"A Martyrs' Column must be erected, without any further loss of time, in the heart of New Delhi in memory of the Hindus who were butchered and raped on 16th August 1946 in Calcutta as well as before and after 15th August 1947 throughout undivided India, and be remembered them on 16th August every year with due respect and honour."* –Kurukshetra, U.K.

# সরকারের সংস্কৃত-সংহার নীতি

যতো দুর্ভাগ্যজনকই হোক না কেন, দেশবিভাগ যখন কোনভাবেই ঠেকানো গেলো না এবং ভারতবর্ষ খণ্ডখণ্ড হলোই, তখন যারা দেশের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের নিকট একটা সুযোগ এসেছিল দেশের (পড়ুন হিন্দুর) কৃষ্টি ও সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করার। এবং তা করতে যেয়ে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হতো তা হলো সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। কারণ, ভারতবর্ষের গৌরব করার মতো যতো সম্পদ আছে তা ঐ সংস্কৃত ভাষায়ই লিপিবদ্ধ করা আছে। ভারতকে জানতে হলে, বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষার সাথে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সেদিকে মোটেই মনোযোগী হলো না। পক্ষান্তরে, মৌলানা আজাদকে করা হলো ভারত সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী যিনি মনে করেন, "কোরান শরিফে যা লেখা নেই কোন মুসলমানের নিকট তা গ্রহণীয় নয়" এবং যার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি থাকা দূরের কথা সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং যা হবার তা-ই হলো। ভারতে সংস্কৃতির ধারক যে ভাষা তা দিনের পর দিন অবহেলিত হতে হতে আজ বিলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে সরকারের অর্থানুকূল্যে আরবী, ফার্সি ও উর্দুভাষার বিস্তার লাভ করছে।

এখানে উল্লেখ্য, ভারত-সরকার আনুমানিক ত্রিশ বৎসর পূর্বে দায়সারাগোছের ডাকযোগে সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ পর্যন্ত তা চালু আছে কিনা জানিনা। ঘটনাচক্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখে সে-শিক্ষাক্রমে নিজেকে সামিল করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে-ভাবে ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে প্রকৃতপক্ষে আর কোন ভাষা শেখা যায় কিনা জানিনা, তবে প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা শেখা যায় না। সরকারের কিছু অর্থদণ্ড হয় মাত্র। বিভিন্ন রাজ্যে-ও যে সংস্কৃতশিক্ষা বিমাতৃসুলভ আচরণ পেয়ে আসছে তা বলাই বাহুল্য। তবে কোন্ রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা কতখানি আদর বা অনাদর পেয়ে আসছে তার সঠিক বিবরণ দিতে না পারলেও সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কীরূপ তার কিছু নমুনা পাঠক মহোদয়ের অবগতির জন্যে নিম্নে তুলে ধরছি। তা থেকেই তিনি বুঝতে পারবেন, সরকারের সংস্কৃত-সংহার নীতি কী পর্যায়ে যেয়ে পৌঁচেছে।

কিছুদিন পূর্বে দি ষ্ট্যাটস্ম্যান পত্রিকার এক সাংবাদিকের প্রতিবেদনে দেখেছিলাম, কলিকাতার কলেজস্ট্রীটে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত কলেজটি আছে তাতে বর্তমানে মাত্র ছয়জন অধ্যাপক আছেন; কিন্তু থাকার কথা

বাইশ জন। এ অবস্থা কেন হলো তার বিবরণ দিতে গিয়ে উক্ত সাংবাদিক বলেছেন, বেশ কয়েক বৎসর ধরেই সংস্কৃত কলেজটির যে-সব অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করেন কিংবা মারা যান তার বা তাদের শূন্যস্থানে নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করে সে-স্থান পূরণ করা হয় না। কলেজ-অধ্যক্ষের পুনঃপুনঃ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কোনরূপ ব্যবস্থা নেন না। ফলে দিন দিন ছাত্রসংখ্যাও কমে যাচ্ছে। যেখানে পঠন-পাঠনের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক নেই সেখানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কোনই প্রশ্ন ওঠে না। এমনভাবে সংস্কৃতের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী অনেক ছাত্রই তাদের অভীষ্টে পৌঁছুতে পারছেন না। এখানে উল্লেখ্য, এই কজেটিতেই একদিন স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষকতা করতেন। আরও উল্লেখ্য, এই কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজ-শাসনের আমলে। ভাবতে কষ্ট হয়, সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী যতটুকু আগ্রহ দেখিয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা ততটুকু-ও করছি না বল্লে কম বলা হয়, এর শ্মশান-যাত্রা যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি যখন গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন সংস্কৃত-পাঠ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা (Matriculation Examination) পর্যন্ত শুধু বাধ্যতামূলকই ছিল না, Additional Mathematics-এর মতো Additional Sanskrit-এর পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। আর আজ? Additional Sanskrit দূরের কথা, দশম শ্রেণী পর্যন্তও সংস্কৃত-পাঠ বাধ্যতামূলক নয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত পড়ান হয়। আবার কোন কোন স্কুলে শুধুমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ানো হয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে হিন্দি পড়ানো হয়। এক কথায়, সংস্কৃত ও হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। যেহেতু সংস্কৃত পাঠ অষ্টম শ্রেণীতেই শেষ, তাই সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের দ্বার স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ। সেই কবে সুদূর অতীতে সংস্কৃতের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল, আজও মনের মনিকোঠায় তা সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই কবে পড়েছিলাম এবং পণ্ডিত মহাশয়ের তাড়নায় বেশ কিছু শ্লোক কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছিলাম তার দু'একটি তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে পাঠক মহোদয় নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন্।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।।

কিংবা

অয়ং নিজো পরোবেতি গননা লঘুচেতষাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

এ-হেন জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক এবং বাহক যে-ভাষা তা থেকে দেশবাসীকে যারা বঞ্চিত করলো তারা শুধু প্রবঞ্চক নয়, প্রতারক-ও বটে। যে-ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকারী হয়ে যারা নিজেদের গৌরবান্বিত বলে মনে করেন না এবং তার প্রচার, প্রসার ও সমৃদ্ধির দিকে যত্নবান হন না, নিঃসন্দেহে তারা হতভাগ্য! তাদের জন্যে দুঃখ হয়। কালের গতিতে চিরদিন তারা ক্ষমতার আসনে থাকবেন না—একদিন না একদিন তাদেরকে যেতেই হবে। তখন, সেদিনের ঐতিহাসিকরা এদের কী ভাষায় চিত্রিত করবেন তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

এবার আসুন, আমরা আমাদের পূর্বকথায় ফিরে যাই। একদিন কাশীধামের মতোই নবদ্বীপধামও জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল এবং তার চর্চা হতো সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। একদিন যেই পুণ্যভূমিতে আবির্ভাব ঘটেছিলো শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই নবদ্বীপধামের সংস্কৃত কলেজটির বর্তমানে কী হাল হয়েছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে কলিকাতার দি ষ্ট্যাটস্‌ম্যান পত্রিকার এক সাংবাদিক তার প্রতিবেদনে লিখছেন ঃ

**NABADWIP SANSKRIT COLLEGE IN DIRE STRAITS**

"Nabadwip, March 11, The Government Sanskrit College at Nabadwip is on the verge of extinction, Except for the principal, Mr. Purna Chandra Acharyya, there is no other teacher. Although there are thirtyfive students on the roll, not more than three or four turn up each day. Classrooms are locked. Dust has gathered on the closed doors and windows. Weeds are growing on the campus. Years of neglect and government apathy are responsible for the sorry state of affairs at the college, according to the principal.

"The college is supposed to have a three year degree course in Sanskrit–Adya, Madhya and Upadhi, There were six teachers, including the principal, one each for Mugdhabodha (grammar), Kavya, Smriti, Vaishnab Darshan, Nabya Nayaya and Prachin Nyaya. Five teachers have already retired and there is no replacement despite repeated request, says the principal, who is worried over the sad plight of the college. He fears it will close down as soon as he retires.

"Many have attributed this condition to the state government's education policy which gradually banished Sanskrit from the school curricula and did not fill vacancies created because of retirement of Sanskrit teachers. Students are not encouraged to study Sanskrit as job prospects have become bleak. Secondly, there is dearth of teachers. 'I am actually a teacher of Kavya, but being the only teacher I have to teach all the branches,' said Acharyya.

"Earlier students from all over the country used to come here to learn Sanskrit. There were great scholars like Madhusudan Nyayacharya, Tridas Nath Smrititirtha, Banamali Charan Tarkatirtha, Rajendra Chandra Tarkatirtha and Mahamahopadhyay Chandidas Nyayatarkatirtha. Even now there are two students, Govinda Mishra and Madan Gopal Sharma from Manipur and one Lakshman Goswami from Tripura.

"What is most painful, says Kabita Modak, a final year student of Upadhi, is that examinations are not held on time. It took her seven years to sit for the Adya examination. The Bangiya Sanskrita Siksha Parishad, which is supposed to conduct the examinations, does not take it seriously, she alleged." (The Statesman, 12.3.99).

আশা করি এই প্রতিবেদনের আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এখানেই শেষ নয়। এবার শুনুন, বিদেশ থেকে ভাড়া-করে-আনা একজন ফরাসী ঐতিহাসিক ও ভারত-বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত এক অধ্যাপকের বক্তব্য। তার মতে, সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগই নাকি "ভাজপা"-র রাজনীতিতে জাতপাত প্রশ্রয় পাচ্ছে। এবারের কলকাতা বই মেলায় অশোককুমার সরকার স্মারক বক্তৃতার বিবরণ দিতে গিয়ে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক খবরটি পরিবেশন করেছেন। তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে দিচ্ছি। তা থেকেই বুঝা যাবে শুধু নিজ দেশেই নয় বিদেশের তথাকথিত ভারত-বিশেষজ্ঞদের ডেকে আনা হচ্ছে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্যে। খবরটি এভাবে পরিবেশিত হয়েছে ঃ

## বইমেলার স্মারক বক্তৃতায় এবার ঢুকলো "রাজনীতি"-ও

"নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বইমেলার ইতিহাসে এই প্রথম ইউ.বি.আই. অডিটোরিয়ামে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা হল। বৃহস্পতিবার সেখানে অশোককুমার সরকার স্মারক বক্তৃতায় ফরাসি ঐতিহাসিক ও ভারত-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্রিস্তোফ জাফ্রেলো 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং উত্তর ভারতের নিম্নবর্ণ' বিষয়ে তাঁর মতামত উপস্থাপন করেন।

"জাফ্রেলো তাঁর বক্তৃতায় কোনও সরাসরি মন্তব্য না করেও কার্যত বি.জে.পি-র বিরুদ্ধে জাতপাতের রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন। ক্রিস্তোফ 'বহু মানুষের সংগে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে' রচিত তাঁর পেপারে হিসাব দিয়ে বলেন, বি.জে.পি বরাবরই উচ্চবর্ণের দল। বি.জে.পি-র সংসদ সদস্য, বিধানসভা সদস্য ও জাতীয় কর্মসমিতিতেও উচ্চ বর্ণের মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদিও নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য তারা এখন নিম্ন বর্ণের আরও অনেক নেতাকে উপরে তুলে আনছে। তাঁর মতে, এতেও তেমন কাজের কাজ হচ্ছে না। কারণ, ওই নিম্নবর্ণের নেতারা

সংস্কৃতানুরাগী। তাঁদের কেউ কেউ সংস্কৃতে শপথও নেন। নিম্নবর্ণের মানুষরাই তাঁদের নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করেন না।

"বইমেলায় এই ধরণের বক্তৃতাকে অবশ্য রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসাবে আখ্যা দিতে রাজি নন বইমেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সম্পাদক অনিল আচার্য। তাঁর মতে, এটি একজন পণ্ডিতের আলোচনা মাত্র। বিদেশী দূতাবাসের মাধ্যমেই এই পণ্ডিতদের প্রতি বছর নির্বাচন করা হয় বলে তিনি জানান। স্মারক বক্তৃতা সভায় এ-দিন সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব তোয়াব খান।" *(সৌজন্যে—বর্তমান ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)।*

## ভাটপাড়ায় সংস্কৃত কলেজ ভবন ভেঙে টাউন হল হবে!

এক সময় পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়া সংস্কৃত-শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান ছিল। আজ তার কী অবস্থা হয়েছে এবং হতে চলেছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যাবে 'বর্তমান' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির বর্ণনা থেকে, যা প্রকাশিত হয়েছিল উক্ত পত্রিকার ১২/৪/৯৯ ইং তারিখের সংস্করণে। "ব্যারাকপুর ঃ শ্যামনগর-মুলাজোড়ের সংস্কৃত কলেজের ঐতিহাসিক ভবনটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভাটপাড়া পুরসভা। বহু মনীষীর স্মৃতিবিজড়িত এই ভবনটি ভেঙে আধুনিক টাউন হল তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন পুরসভার বামপন্থী কর্তারা। এতে বাসিন্দারা প্রচুর ক্ষুব্ধ। ভবনটির সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার এলাকার বিভিন্ন সংগঠন ও ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ। ভাটপাড়া সমাজকল্যান শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকেও জানিয়েছে।"

এর পরেও কি সরকারের সংস্কৃত-সংহার নীতির বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন আছে? যে ক'টি নমুনা তুলে ধরা হল, তা-ই কি যথেষ্ট নয়? পাঠকমহোদয় নিজেই ভেবে দেখুন।

*"শুধু কর্তব্যের চলা যে লগি ঠেলে উজান চলা—তার সার্থকতা নেই, সে-কথা বলব না; কিন্তু তাতে করে কতদূরই বা যাওয়া যায়। অথচ ভেতর থেকে চলার ইসারা যে পায় সে ত নিজে শুধু চলে না, সবাইকে চালিয়ে নিয়ে যায়।"* — জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার ('বন্দীর চিঠি', পৃষ্ঠা ১৬)।

# হিন্দুরা মিশনারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে

(দিল্লীর 'অর্গানাইজার' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ ভারতচিন্তাবিদ্ আমেরিকান পণ্ডিত ডঃ ডেভিড ফ্রলের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাম্প্রতিক ধর্মান্তরণসহ বহু বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পাঠকের অবগতির জন্য সেগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হলো।—সম্পাদক, বি.হি.বা)।

প্রশ্ন ঃ হিন্দুত্বের মধ্যে এমন কী আছে, যা আপনাকে এত আকর্ষণ করেছে?

উত্তর ঃ হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম একটি বিশাল প্রণালীবদ্ধ ও উদারমতাবলম্বী শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের বেদান্ত, যোগশিক্ষাপদ্ধতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, আয়ুর্বেদ এবং আরও বহুবিধ গ্রন্থ ও শিক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন ঃ যখন সমস্ত পশ্চিমী দেশগুলিই হিন্দুদের নিন্দামন্দ করে বলছে, হিন্দু বা ভারতবর্ষের উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নাই, তখন আপনি হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করে অন্য পথ ধরেছেন বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বেশীর ভাগ চিন্তাবিদরা এভাবে চিন্তাভাবনা করেন না। ভারতের ব্যাপারে জানবার জন্য বেশীরভাগ লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে বেদান্ত ও যোগশিক্ষা ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে জানবার জন্য প্রচুর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিম চিন্তাধারায় নিউ এজ কাল্চার প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা প্রসারিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ কোনার্ড এল্স্ট্ একবার মন্তব্য করেছিলেন, এখন হিন্দুত্বের কাছে ভয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তার ধর্মান্তরণ। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?

উত্তর ঃ ধর্মান্তরণ স্পষ্টতই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে একটি অন্যতম প্রধান আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ধারণা, হিন্দুদের মধ্যেকার অনেকেই হিন্দুত্বের দিক্ থেকে আশংকার প্রধান কারণ। কারণ, হিন্দুরা একাত্ম ভাবনার দ্বারা তাদের অধিকার, মূল্যবোধ ও জাতীয় পরম্পরা ও সাংস্কৃতিক গৌরববোধ সম্পর্কে উদাসীন থেকে এক হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখাগুলি পড়ে মানুষের এই ধারণা হয় যে, আপনি হিন্দুত্বকে দৃঢ়ভাবে জাহির করার পক্ষপাতী (Assertive Hindusim) এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে চাই, শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ

হিন্দুত্বের থেকে বরং স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হিন্দুত্বের স্বীকৃতি ও নিজেদের হিন্দু হিসাবে জাহির করাই এখনকার কালে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একজন হিন্দু দৃঢ়ভাবে হিন্দুত্বের মতবাদ, পন্থা, রীতি-নীতির কথা বলতে চাইলে হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে যেসব আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, গুণাবলী ও শিক্ষার কথা আছে, তা তাকে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে জাহির করতে হবে। এ ব্যাপারে তার কিছু সঠিক ধারণা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা থাকা চাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রথমেই বলতে চাই, হিন্দুরা এ সব ব্যাপারে উদাসীন নিষ্ক্রিয় বলে আমার ধারণা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি হিন্দুদের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তনের জন্য কোনও প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রাখতে চান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এর কারণ হচ্ছে হিন্দু সমাজ এদিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হয়ে আছে। তারা নিজেদের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখে, তার চারিদিকে তাকে ঘিরে যে বাস্তব ঘটনাগুলি ঘটছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানে না বা খবর রাখে না। তার শত্রুদের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও সে উদাসীন। সেই কারণে আধুনিক পৃথিবীর চারিদিকে যে বাস্তব ঘটনাসমূহ ঘটছে, সে সম্পর্কে তাদের অবহিত থাকা উচিত।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিশ্চয়ই ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জানেন? ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারটি আবার একবার আমাদের সামনে এসে পড়েছে। এ সম্পর্কে আপনার কী মত?

উত্তর ঃ আমার মনে হয়, খৃষ্টান মিশনারীরা যা করছে, তার প্রবণতা যথেষ্ট বিপজ্জনক। মিশনারীরা কী করছে? তারা কোটি কোটি পরিমাণ 'ডলার' ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে, হিন্দুধর্মের মত একটি উদার ধর্মকে ভারতের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের ভারতে পাঠাচ্ছে। মিশনারীরা 'সেকুলারিজমে'র প্রতিনিধি বা দূত বলে দাবী জানালেও তারা মূলতঃ পরমত-অসিহিষ্ণু, অন্যান্য রিলিজিয়নকে তারা কোন সম্মান দেয় না। তারা হিন্দুত্বকে নিন্দা করে, তাদের দেবদেবীকে নিন্দা ও অসম্মান করে, এবং যে সমস্ত জনজাতিরা দুর্বল, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে। ধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা সর্বদাই হিতকর, কিন্তু ধর্মান্তরকরণের ব্যবসা অত্যন্ত খারাপ। একটি গোষ্ঠী তার সমস্ত আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে অপর গোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করতে থাকবে, এটা আদৌ ঠিক নয়। অতএব, এই ধর্মান্তরণের ব্যাপারে মিশনারীদের কঠোর সমালোচনা করতে হিন্দুদের ইতস্ততঃ করার কোনই প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি এই গোটা ধর্মান্তরণের ব্যাপারে কোন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে বলে সন্দেহ করেন?

উত্তর ঃ সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে হিন্দুদের উপর অবাধ অত্যাচার

ও নির্যাতনের সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বা 'হেডলাইন' দিয়ে প্রকাশিত হয় না বা খুব কমই প্রকাশ করা হয়। কিন্তু একজন বিদেশী মিশনারীকে ভারতে হত্যা করা খুব ফলাও করে এমনভাবে প্রচার করা হয়, যেন হিন্দুরা খৃষ্টানদের পাইকারীভাবে হত্যা করে চলেছে। যে হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বের নিন্দা কুড়িয়েছে, এ কথার দ্বারা আমি কিন্তু সেই হত্যাকে সমর্থন করছি না। যখন কাশ্মীরে বা ভারতের অন্যত্র হিন্দুদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন এটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার মত কি সংবাদ ছিল না? বেশী দিনের কথা নয়, ৫০ জন খৃষ্টানকে ইন্দোনেশিয়ায় হত্যা করা হয়েছিল। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে প্রতিদিনই খৃষ্টানদের হত্যা করা হচ্ছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে, সাদা চামড়ার চার্চের লোকেরা কালো চামড়ার লোকেদের চার্চ নিয়মিতভাবে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে ভারতে যা ঘটেছে, তা একটি ছোট ঘটনা মাত্র। আমার মনে হয়, ভারতের সংবাদপত্রে এই সব খবর বিকৃতভাবে ছাপা হচ্ছে। এটা সকলের জানা উচিত, মিশনারীরা হাবাগোবা লোক নয়, তারা এক একটা সম্প্রদায়কে বিভাজন করে একটি সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, এইভাবে তারা সমাজে গোলমাল সৃষ্টি করে। তারা তোমাকে বলবে, "আমার ঈশ্বরই সত্য, তোমার ঈশ্বর শয়তান, তুমি সেই শয়তানের পূজা করছো, এবং যে আমার একথার সঙ্গে সম্মত হবে না, সে নরকে যাবে।" এই ধরনের ঘৃণা প্রচারের অভিযানে কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরী হবে? তাছাড়া মিশনারী কার্য্যকলাপ সাধারণতঃ আক্রমণাত্মক ও অসহিষ্ণু হয়ে থকে। অতএব, এতে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক ঘটনা। **কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একটি সংখ্যাগুরু হিন্দু পরিপূর্ণ দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অঢেল বিদেশী টাকা এখনও ভারতে প্রবেশ করে চলেছে। হিন্দু এবং ভারতের পক্ষে এই পরিস্থিতি আদৌ মঙ্গলকর নয়।** হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী পাঠায় না। তা'হলে এই সহিষ্ণু আধুনিক পৃথিবীতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই নেতিবাচক আক্রমণাত্মক প্রচারকে বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হচ্ছে কেন?

ভ্যাটিকানের প্রচারিত এই ধর্মান্তরকরণের পরিকল্পনা (Evangelization) অত্যন্ত সুসংগঠিত ও দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। আমেরিকার 'ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন' (একটি প্রটেষ্ট্যান্ট গ্রুপ) এশিয়াতে ধর্মপ্রচারে আগ্রহশীল। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ তারা কাজে লাগাচ্ছে। তাদের কৌশল অনুসারে কোন্ সম্প্রদায় তাদের ধর্মান্তরণের লক্ষ্য হবে, তারা স্থির সিদ্ধান্তে এসে তাদের কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি করছে। **দেখা যাচ্ছে, হিন্দুরাই কার্য্যত খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।** এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। এশিয়ার ভূখণ্ডে আমেরিকার খৃষ্টানদের

ধর্মান্তরণের পরিকল্পনা সর্বজনবিদিত। এটা এখন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। আমেরিকার বহু খৃষ্টান যাজকীয় সংস্থা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে, তারা অঢেল অর্থ সরবরাহ করছে। এই সব সংস্থার নিজস্ব কার্য্যক্রম এবং তা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা রয়েছে। **চার্চ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে অ-সংগঠিত হিন্দুদের উপর ধর্মান্তরণের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দুরা সংগঠিত হয়ে যখন পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, এই মিশনারীরা তখন সব 'গেল গেল' বলে চীৎকার চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছে। মিশনারীদের কিন্তু সৌদী আরব, পাকিস্থান, আফগানিস্থান ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ধর্মপ্রচার করতে বা ধর্মান্তরণ করতে দেওয়া হয় না, চীনের মত কমিউনিষ্ট দেশেও তারা দাঁত বসাতে পারে না। সেজন্য, ভারতবর্ষের মত নরম উদারমনোভাবপন্ন দেশের লোকেদের বেছে বেছে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করছে। এই কারণে মিশনারীরা তাদের কাজ প্রসারিত করার জন্য অনেক সুযোগ ও স্বাধীনতা ও সম্মান পেয়ে যাচ্ছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পায়নি।**

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন, পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলি এ ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করে এই বিষয়টিকে প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরছে?

উত্তর ঃ পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রচারের প্রবণতা অকথিভাবে খৃষ্টানদের পক্ষেই যাচ্ছে। কারণ, সেখানকার জনগণের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পটভূমিই খৃষ্টধর্ম। সেজন্য তাদের জাতি ও গোষ্ঠীর ধর্মকে তারা জোর দিয়ে প্রচার করছে। যদি একজন সাদা চামড়ার লোককে ভারতে হত্যা করা হয়, তবে সেটা তাদের কাছে বেশ বড় খবর হিসাবে দেখা দেয়।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর পূর্ব দেশগুলিতে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, 'পশ্চিমদেশই হচ্ছে চার্চ'—এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর ঃ ভাল কথা, পশ্চিমদেশ মানেই চার্চ নয়। বাস্তবিকপক্ষে, পশ্চিমের সংস্কৃতি কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ধর্মীয় নয়, কিন্তু তবুও চার্চ ধর্মান্তরণের ব্যাপারে অজস্র অর্থব্যয় করে চলেছে। এমন কি আমেরিকার এক কোটি জনসংখ্যা চার্চ পরিচালিত সংস্থাগুলিকে যে পরিমাণ টাকা দেয়, তার দ্বারা ভারতের মত একটি দেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ অর্জন করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ চার্চ এবং ষ্টেটের মধ্যে পশ্চিম দেশগুলিতে কোথায় তাদের মিল ও অমিল রয়েছে?

উত্তর ঃ চার্চ এবং ষ্টেট-এর কাজ পশ্চিমী দেশগুলিতে ভিন্নপ্রকার। কিন্তু পশ্চিমী দেশসমূহের ষ্টেট্‌গুলি সাধারণতঃ খৃষ্টধর্মকে সমর্থন করে। **যদি খৃষ্টানরা পৃথিবীর কোনও দেশে আক্রান্ত হয় তবে পশ্চিমী জাতিরা এটিকে একটি বিতর্কিত বিষয় বলে প্রতিবাদ করে। অপরপক্ষে, হিন্দুরা যদি কোন দেশে বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ ও নিহত হয়, যেমন পাকিস্তান,**

**বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে হয়ে থাকে, তখন কিন্তু ভারতের সরকার এটাকে বিতর্কিত বিষয় বলে মনে করে না, সেজন্য কোন প্রতিবাদও করে না।**

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে বহু আদর্শবাদ বা মতবাদ বা ধর্ম, যেমন -সাম্যবাদ (Communism), পুঁজিবাদ (Capitalism), ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের উত্থান ও পতন হয়েছে। আপনি হিন্দুত্বকে এর মধ্যে কোথায় স্থান দিতে চান?

উত্তর ঃ সেই অর্থে হিন্দুত্ব কোন মতবাদের মধ্যে পড়ে না। একটি আদর্শবাদ বা মতবাদ জনসাধারণকে কোন বিশেষ একটি ধর্মীয় মতবাদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসে উন্নীত করার চেষ্টা করে। সেদিক থেকে দেখলে হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম মানুষকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবার চেষ্টা করে যে, মানুষের সত্যকারের পরিচয় কী বা তাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতাই বা কী ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ বহু পশ্চিমী পণ্ডিত একথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, পরবর্ত্তী শতাব্দী 'হিন্দুত্বের শতাব্দী' বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?

উত্তর ঃ সমস্ত পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নন। সম্ভবতঃ এটা হতে পারে, কারণ, হিন্দুত্বের মধ্যে বিশ্বমানবতার উদার উপলব্ধির ধারণা নিহিত রয়েছে। এটিই একমাত্র ধর্ম বা আদর্শবাদ, যে বলছে, বিভিন্ন ধর্মীয় মত বা পথের অনুসরণ করলেও মানুষের মুক্তিলাভ করা সম্ভব। **এটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, প্রগাঢ় জ্ঞানপূর্ণ সুসম্বন্ধ শাস্ত্র, যে কখনও একটিমাত্র পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থ, একটিমাত্র ভাষা, একটিমাত্র Prophet, একটিমাত্র ঈশ্বরে বা ভগবানে কখনও সীমাবদ্ধ নয়, এই হিন্দুধর্মের অনুসরণকারীদের যে কোন পথ অবলম্বন করে ঈশ্বরলাভ করার স্বাধীনতা রয়েছে।** *(সৌজন্যে—বিশ্ব হিন্দু বার্তা, বৈশাখ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ)।*

> *"যাঁরা বিশ্বমানবতার গাছটিতে একলাফে চড়ে বসতে চান তাঁরা হয়ত অতি মহৎ, নয়তো অতি অসৎ। যাই হোন, তাঁরা আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা বিশ্ব-মানবতা-মন্দিরের পথে পথে প্রতিবেশি; সমাজ, স্বদেশ, এদের কাউকে ডিঙিয়ে যেতে মনে সায় পাইনে; কি করবো? মরণশীল আমি অমর হতে চাই বলেই তো মানুষের মাঝে বাঁচতে চাই, মরতেও চাই তারই জন্যে।"*—জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার। (বক্সা স্পেশাল জেল, ২৪/১২/৪৩ ইং, বন্দীর চিঠি, পৃষ্ঠা ২২)।

# প্রসঙ্গ ভারতীয় সংস্কৃতি

(এটি একটি চিঠি। লিখেছিলেন বিপ্লবী জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে। তারিখ ২৩/৮/৪২। প্রাপক ছিল বর্তমান লেখক, যখন সে ময়মনসিংহ জেলে নিরাপত্তা (Security Prisoner) বন্দীরূপে আটক ছিল।)

স্নেহের প্রিয়,

তোমার পত্রখানি কতখানি আনন্দ বহন করে এনেছে তা তুমি নিজেও বোধ হয় জান না, গোড়াতেই আমার 'পরে একটু অবিচার হয়ে থাকলেও। অবিচার বৈ কি। প্রিয়জনকে ভুলে যাওয়া যে বড়লোকের রোগ। নিশ্চিন্ত থেকো আমি তোমাদের কাউকে ভুলিনি, ভুলতে পারব না।

ভারতীয় সংস্কৃতির কথা লিখেছ। বিষয় বস্তুটি একই সঙ্গে আকর্ষক ও বেদনাদায়ক। বেদনা এই হেতু যে বন্দীর সকল কর্মের উপর নিষেধের যে গণ্ডীটি টানা আছে তাকে এক মূহুর্তের জন্য উপেক্ষা করবার উপায় নেই। অবস্থা বুঝতে না পেরে পাছে মনে ব্যথা পাও সেই ভয়েই অতি সংক্ষেপে কিছু না লিখে পারলাম না।

শিক্ষা এবং চর্চাদ্বারা লব্ধ উৎকর্ষকেই বলা হয় সংস্কৃতি বা কালচার (Culture)। এর মূলে রয়েছে একটি মূর্ত জীবন-দর্শন; সোজা কথায় যাকে বলতে পার একটি উন্নীত মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তিই মানুষের অমার্জিত জান্তব সত্তার নিগড় থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশকে সফল করে তুলেছে। দেহ-মনের সংস্কৃত অভিব্যক্তিতেই সংস্কৃতির পরিচয়। সংস্কৃতির চাহিদাটি মানুষের নিবিড়তম সত্তার সাথে সাথে নিভৃতে বিজড়িত। সংস্কৃতির সংগে মানুষের নাড়ীর যোগে তাই সংস্কারের গোড়াপত্তন।

মানুষের যাবতীয় আশা আকাঙ্খার মৌলিক ঐকাত্ম্যের মত সংস্কৃতির-ও রয়েছে তাই একটি সার্বিক রূপ।

সেভাবে দেখা যাবে সংস্কৃতি মানব-সভ্যতার প্রাণবায়ু স্বরূপ। সমুদ্র অভিমুখী নদ-নদীর মতো সংস্কৃতিরও একটি চরম লক্ষ্যস্থল আছে— বিশ্বমানবতা। সার্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিশ্বমানবতাই সংস্কৃতির শাশ্বত রূপ। কিন্তু সে শাশ্বত রূপটি যত কাম্য তত সুলভ নয় যে। অলস আকাঙ্খার লোভাতুর দৃষ্টিতে সে কল্পনাসুন্দরী আলেয়া। কল্যাণী স্রোতস্বিনীর পাথর-পাহাড়-ভাঙ্গা, জনপদ-গ্রাসী তাণ্ডবের মতো মহামানবের সাগর-অভিযাত্রী সংস্কৃতির পথও ভাঙ্গা গড়ার নির্মমতায় ভরা। পরিবর্তন-পরান্মুখতায় তাই সংস্কৃতির অপমৃত্যু।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সংস্কৃতি স্বভাবতই বহুমুখী। যে দেশ বা ভূখণ্ডকে আশ্রয় করে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার মাটির টানেই

সে সংস্কৃতির গৌরব; তার রসে গন্ধেই তার কান্তি পুষ্টি। যে সংস্কৃতি আপন বেদীমূলে মৃত্যুঞ্জয়ীদেরকে যথাযোগ্য সংখ্যায় আকৃষ্ট করতে অক্ষম তাকে আর যাই বলা যাক অন্তত দেশবিশেষের সংস্কৃতি বলা যায় না। বিশ্বাসীর আত্মদানে বিশ্বাসের পরিমাপ। যে সংস্কৃতির রক্ষা এবং শ্রীবৃদ্ধির কাজে কেবলমাত্র অন্ধ মমত্ব বোধে নয়—দেশ বিশেষ সর্বস্বপনে প্রবুদ্ধ, সেই সংস্কৃতিকেই তার আদর্শ মানে গ্রহণ করা চলে।

মর্যাদাহীন জান্তব অস্তিত্বের শতশত বর্ষ-বিস্তৃত দেউলে আত্মসমর্পণ করে শুধু দেহ আর আত্মার যোগসূত্রটি রক্ষা করার মাঝে সংস্কৃতির অবকাশ নেই। ভিক্ষার অন্নে উদর পূর্তি করে করে ভারত তার অন্তর শূন্য করে ফেলেছে—আপন সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলেছে। অন্তরের জিনিষকে আমরা বাইরে খুঁজে পাচ্ছি না; তাই না? আজকের আদর্শহীন নিষ্ঠাহীন দেউলিয়া ভারতবর্ষে গুটি কয় স্বদেশবাসীর আত্মত্যাগ ও পরিচর্যায় কোন-মতে-বেঁচে-থাকা সংস্কৃতিকে জাতীয় গৌরবে অনুভব না করাই তো স্বাভাবিক। ভারতীয় সংস্কৃতি আজ স্পন্দনহীন, মৃতকল্প।

ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের বুকে যে লুকিয়ে আছে সে হ'লো আমাদের সুমহান পিতৃপুরুষদের সংস্কৃতি, আর আমাদের সংস্কৃতির ইঙ্গিত বা ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্যের মূল নীতি হলো 'আমরা বাঁচব এবং (অন্যদের) বাঁচতে দেব।' Live and let live-এ নীতিতে অপরের বাঁচবার অধিকার যেমন স্বীকৃত, আপন জীবনের দায়িত্বও তেমনি সুনির্দিষ্ট। দায়িত্বহীনতাকে গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে বৈরাগ্যের নামে চালু করে নেবার অনুমোদন এতে নেই। বরং জীবনের দাবীতে সংগ্রাম-বিমুখকে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' বলে সে সাবধান করে আসছে। নির্ভীক ন্যায়-ধর্ম সে-নীতি-অনুমোদিত চরিত্রের একমাত্র মানদণ্ড। এ ন্যায়ের বিচারে, অন্যায় যে সহ্য করে আর অন্যায় যে করে, এ দুই-ই সম-অপরাধী এবং দণ্ডার্হ। 'সোয়হম'-মন্ত্রে দীক্ষিত পিতৃপুরুষদের জীবনে এই নীতিকেই প্রতিফলিত দেখতে পাই—এই তাঁদের অন্তিম ইচ্ছাপত্র। এই নীতি আমাদের ঐতিহ্যের মর্মকথা। **শুধু পুরোনো এবং পিতৃপুরুষদের সাধনালব্ধ বলেই একে গ্রহণ করার পক্ষপাতিত্ব আমাদের নেই, জগদ্ব্যাপী নরমেধ যজ্ঞের তাণ্ডব-লীলার মাঝখানে এ সংস্কৃতির প্রয়োজন অদ্বিতীয় বলেই এঁকে পুনরভিনন্দন দেওয়া।** তবেই না মানুষের এ-অশ্রুতপূর্ব অত্মদানের মর্যাদা রক্ষা পায়।

যে সংস্কৃতির পতাকাতলে সর্বস্বপন করবার মত মানুষের অভাব হয় না, সে সংস্কৃতিও দোষমুক্ত না হতে পারে; কিন্তু চরম মুহূর্তে জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না এমন একটা কিছুকে সংস্কৃতি নাম দিতে হলে তাকে মৃতের বিশষণে বিশেষিত করে নিতে হবে।

এক অসাবধান মুহুর্তে একটা মহতী সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণবেশী

শিক্ষা-সম্মানের একচেটিয়া দোকানদারদের হাতে পড়ে কী করে গোটা জাতিকে অবশেষে ধ্বংসের পায়ের তলায় ঠেলে দিতে পারে তার প্রমাণ ভারতবর্ষ।

তোমার প্রশ্ন দেখে মনে হোল, ভারতের ঐতিহ্য ভারতবাসীকে আজ আবার আলোড়িত করছে। এতে কত আশা, কত আনন্দের আলোই যেন দেখতে পেলাম। ভারতের চিরন্তন 'আমরা বাঁচবো, ও অপরকে বাঁচতে দেব'-বাণীর জয় হোক। ইতি—

রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল, তোমার শুভাকাঙ্খী
২৩/৮/৪২ ইং শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার

*"সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বেদনা বোধ হয় অপ্রকারের বেদনা। আর আত্মপ্রকাশের—আত্মপ্রচারের নয়—আনন্দের চেয়ে আনন্দও হয়ত জগতে নেই। অপ্রকাশের অন্ধদ্বারে আত্মসমর্পণই বুঝিবা মহতি বিনষ্টি। আত্মপ্রকাশের সাধনার পথেই মানুষের মৃত্যুহীন অমরত্ব।"*
—জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার। (রাজসাহী জেল, ১২/৯/৪২ ইং, 'বন্দীর চিঠি' পৃঃ ২৯)।

# ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ

"নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদিরয়েৎ।।"

আমাদের পূর্বপুরুষরা এই স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার বক্তব্য নিবেদনে প্রয়াসী হলাম। প্রথমেই বলে নিচ্ছি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের বিলাপ এবং তাঁকে উদ্দীপিত করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাথমিকভাবে কয়েকটি উপদেশের (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের) মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো।

অর্জুনের মানসিক অবস্থা বুঝতে হলে সর্বপ্রথম মনুষ্যচরিত্রের এ-দিকটির ব্যাপারে একটা সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনাত্মীয় দুরাত্মার দৌরাত্ম্য খর্ব করার জন্যে অস্ত্রধারণ করা যতো সহজ, সেই দুরাত্মা যদি অত্যন্ত নিকট আত্মীয় হয় তবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ততো সহজসাধ্য হয়না। তখন নানাপ্রকার হিতাহিত, ভালোমন্দ, শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল চিন্তার স্রোত এসে হাজির হয় এবং চিত্ত-বৈকল্যের সৃষ্টি করে। তখন তার আত্মীয়কে দুরাত্মা জেনেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যেয়ে নানাবিধ বিপরীত চিন্তার সম্মুখীন হতে হয়। অর্জুনের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটি-ই হয়েছিল। এর ভিতর কোন নীতি নিহিত ছিল না—ছিল হৃদয়ের দুর্বলতা যা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই হৃদয়-দৌর্বল্য কোন ধর্মজ্ঞান থেকে উদ্ভব হয় না, হয় হৃদয়ের দুর্বলতা থেকে। তাই অর্জুনের এই দুর্বলতা বা বিভ্রান্তির মুলোৎপাটনের প্রয়োজন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই কাজটি করেছেন। যদিও তিরস্কার-মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে তবু-ও তাঁর এই উপদেশ সর্বকালের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্জুন একটি প্রতীক মাত্র।

মহাভারত কাহিনীর শুরু থেকে উদ্যোগপর্ব পর্যন্ত কৌরবরা পাণ্ডবদিগকে নানাভাবে হেনস্তা ও অপমান করে চলছিল, এমন কি কুলবধু দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় কেশাকর্ষণ করে বিবস্ত্র করার প্রয়াসে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এক সময়, পাণ্ডবদের সপরিবারে পুড়িয়ে মারারও চেষ্টা করেছিল। সুতরাং কৌরবরা প্রকৃতপক্ষেই দুরাত্মা ও আততায়ী। পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের এতাদৃশ আচরণের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই (অন্যভাবে বলা যায়, অধর্মের উৎপীড়ন থেকে ধর্মকে পুনঃ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এর প্রস্তুতিপর্বে কিন্তু আমরা কোথাও অর্জুনের মনে কোনপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

দেখতে পাই না। দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতির জঘন্য আচরণ, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন ব্যক্তিদের শুধুমাত্র অন্নপানের বিনিময়ে কৌরবদের পক্ষাবলম্বন কোন যুক্তিতর্ক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। এ-সব ঘটনা অর্জুনের চেয়ে ভালো আর কেউ জানতেন না। তাই, আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে কীরূপে কৌরবদের পরাজিত করা যায় তার প্রচেষ্টায় অন্যান্য ভ্রাতাদের সাথে স্বয়ং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য কামনা করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের যতো সুহৃদ ছিল তাদের স্বপক্ষে আনার জন্যে চেষ্টার কোনই ত্রুটি করেননি।

কিন্তু সেই চরম মুহূর্তটি যখন সমুপস্থিত হলো অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত ও অন্যান্য রথী মহারথীদের নানাবিধ শংখনাদে দিগ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ হতে লাগলো, এমন কি স্বয়ং অর্জুন আর কালবিলম্ব না করে শত্রুপক্ষের দিকে শস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত হলেন। কিন্তু না, অর্জুনের আর তীর ছোড়া হলো না। এতোদিন যাদের প্রতি আঘাত হানার জন্যে অর্জুন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, হঠাৎ সবকিছু বানচাল হয়ে গেলো। অর্জুনের মনে হলো তিনি কি করতে যাচ্ছেন? যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন তারা সবাই যে তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয়। তাদেরকে তিনি কী করে হত্যা করেন! অর্জুনের ভাষায় শুনুন, তিনি বলছেন ঃ

"ন চ শ্রেয়োঅনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ। ১।৩১

অর্থাৎ"যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ করিতে চাহিনা, রাজ্যও চাহিনা, সুখভোগও চাহিনা। তিনি বলে চলেছেন ঃ

"পাপমেবাশ্রয়েদস্মান হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান সবান্ধবান।। ১।৩৬

অর্থাৎ "যদিও ইহারা আততায়ি (এবং আততায়ি শ্রাস্ত্রমতে বধ্য), তথাপি এই আচার্যাদি গুরুজনকে বধ করিলে আমরা পাপভাগীই হইব। অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিতে পারি না। হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব?"

শুধুমাত্র এই কথা বলেই অর্জুন ক্ষ্যান্ত হননি। আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

"যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপানয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ১।৪৫

অর্থাৎ "আমি শস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শস্ত্রধারী দুর্যোধনাদি আমাকে বধ করে তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল হইবে"।

অর্জুনের এবম্বিধ বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানগর্ভ মনে হলেও

প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বধর্ম অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্মের বিপরীত। অর্জুন নিজেই যাদেরকে আততায়ি আখ্যায় ভূষিত করেছেন তাদের বিনাশ-সাধনে নিবৃত্ত হবার পক্ষে যত যুক্তিরই তিনি অবতারণা করুন না কেন স্বাভাবিক কারণেই এসব কুযুক্তি এবং অনার্য-জনোচিত বক্তব্য, কোনক্রমেই স্বধর্মানুগ নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।। ২।২

অর্থাৎ "হে অর্জুন, এই সঙ্কট সময়ে অনার্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর, অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?" এর পরই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলছেন ঃ

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বলং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ২।৩

অর্থাৎ "হে পার্থ, কাতর হইও না। এইরূপ পৌরুষহীনতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয়-দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধার্থে) তৈরী হও।"

অতো সহজে যে অর্জুনের মোহভঙ্গ হয়নি, তা আমরা জানি। তার জন্যে আমাদের গীতার শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য তা নয়। তবু আমাদের নিকট শ্লোক দু'টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উক্ত দু'টি শ্লোকে যা বলেছেন তার মর্মার্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা দুষ্ট ব্যক্তিকে শাসন না করা কোন আর্যজনোচিত কাজ নয়, ইহার নাম ক্লীবত্ব। অর্থাৎ অত্যন্ত নিকট আত্মীয় যেমন, আচার্য, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্যালক, বন্ধুজন প্রভৃতিও যদি অধর্মোচিত আচরণ করে কিংবা আততায়ি হয় তবে তারা সবাই শাসনের যোগ্য এবং বধ্য। এদের ক্ষমা করার ভেতর কোন মহত্ব নেই, বরং নিজ নিজ দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। সুতরাং হে অর্জুন! তোমাদের প্রতি কৌরবরা সারা জীবন ধরে যেরূপ শত্রুতা করে আসছে, উৎপীড়ন-অপমান অত্যাচার করে চলেছে, তারই প্রতিকারার্থে তোমরা এই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ। এই মুহূর্তে তোমার আর ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই, নেই কোন অধিকার। তুমি স্বধর্ম রক্ষার জন্যে অধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হলো ঃ দুর্জন দুর্জনই, আততায়ি আততায়ি-ই। এদের মধ্যে কে আত্মীয়, আর কে অনাত্মীয়, তা বিচার না করে নির্দ্বিধায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার মধ্যেই প্রকৃত ধর্ম নিহিত। **মোহবশতঃ আমাদের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে না যায়,**

**অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা যেন শিরদাড়া সোজা রেখে রুখে দাঁড়াতে পারি। ধর্মের এটিই প্রথম ও শেষ নির্দেশ।**

আমাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত গীতা পাঠ করেন। কেউ দিনে এক অধ্যায়, কেউ বা সম্পূর্ণ গীতা (গীতামাহাত্ম্য সহ) পাঠ করেন। কেউ বা কোন নির্দিষ্ট দিনে সময়োপযোগী দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় অথবা দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় মাত্র পাঠ করেন। আবার কেউ বা তাও করেন না। তা বলে এরা যে কম হিন্দু বা কম ধর্মনিষ্ঠ একথা আমি মনে করিনা। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের মতো তারাও যদি ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে সম্মানের চোখে দেখেন (নাইবা করলেন প্রত্যহ গীতাপাঠ) এবং তার বাণীকে পাথেয় করে জীবনের পথে নির্ভীক হৃদয়ে এগিয়ে যান তবে তারাও আমার নমস্য। **কে দিনে কত পাতা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন, আর কে বা কারা তা করলেন না, তাতে কিছু আসে যায় না; আসে যায় ধর্মকে কে কতখানি নিজের জীবনে রূপায়িত করতে পেরেছেন তার উপর।**

প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের উপর ক্রমাগত যে আঘাত হানা হচ্ছে সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। দেশের আজ ঘোর দুর্দিন চলছে। স্বাধীন হবার পরও ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধনপ্রাণ, মান মর্যাদার উপর যেভাবে দুর্বৃত্তরা দিনের পর দিন আঘাত হেনে চলেছে তাদের প্রতি এখনো যদি সম্মিলিতভাবে প্রত্যাঘাত হানতে না পারা যায় তবে অচিরেই দেখা যাবে, ভারতভূমি থেকে হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতার বিলুপ্তি-সাধন ঘটেছে। এবং সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, বিধর্মীদের এই ষড়যন্ত্রে যারা সক্রিয় সহযোগীতা করছে তারা সবাই হিন্দু কুলোদ্ভব। এরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, পরিবর্তে নিজেদের নতুন এক নামে পরিচয় দিতে বিশেষভাবে উৎসাহী এবং আগ্রহী। তাই এই সময় বৃহৎ হিন্দু সমাজের নিকট আবেদন রাখছি, যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, পরন্তু মহান এক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বলে পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত বোধ করেন তাঁরা যেন এই সব রং-চোরাদের আসল রূপ উদঘাটন করতে যত্নবান হন এবং **নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষাকল্পে শ্রীকৃষ্ণের ''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'' মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকেন।**

## তৃতীয় অধ্যায়

# ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল কাদের স্বার্থে?

শিরনামটি দেখে অনেকেই হয়তো ভ্রুকুঞ্চন করবেন, এবং তা করাই স্বাভাবিক। কারণ ভারতীয় সংবিধানে প্রকৃতপক্ষে কী আছে তা তারা জানেন না, বা জানার আগ্রহ-ও কোনদিন তাদের মনে উদয় হয়নি। কিন্তু যখন তারা জানতে পারবেন, ভারতবর্ষের সংবিধানে কিছু ধারা সংযোজন করে সংখ্যালঘুদের প্রতি কীভাবে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং কীভাবে সংখ্যাগুরুদের (হিন্দুদের) হাজার হাজার বছরের কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তখন আতঙ্কে শিউরে উঠবেন! এক এক করে আমি সে-সব কথায় যাচ্ছি।

(ক) সংবিধানে ১৪নং ধারা (Equality before Law),১৫নং ধারা (Prohibition of Discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth), ১৬নং ধারা (Equality of opportunity in matters of public employment), ১৯নং ধারা (Protection of Certain Rights regarding freedom of speech) এবং ২১ নং ধারা (Protection of life and personal property) যুক্ত করে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এ-সব ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না, সবারই সমান অধিকার থাকবে।

(১) তবু-ও মুসলমান ও খৃষ্টানদের পীড়াপীড়িতে সংবিধানে ২৫নং ধারা যুক্ত করা হয়েছে যার মর্মার্থ "The freedom of conscience and freedom of profession, practice and propagation of religion". এই ধারাটি সংযোজনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সংবিধান রচনার খসরা কমিটির পক্ষে স্বর্গীয় কে. এম মুন্সি তখন বলেছিলেন, "Moreover I was a party from the very beginning to the compromise with the minorities... and I know that it was on this word the Indian Christian Community laid the greatest emphasis, not because they wanted to convert people aggressively, but because the word 'propagate' was fundamental part of their tenets". যে কারণেই হোক ২৫ নং ধারা না হয় সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তার প্রয়োগ-পদ্ধতি যখন "to propagate"–এর অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে "to convert"-এ এসে দাঁড়ালো তখন শাসকগোষ্ঠী কি ঘুমিয়ে ছিলেন, না পরোক্ষভাবে মদত

দিয়েছিলেন? নতুবা ভারতবর্ষে, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরও, খৃষ্টানদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলো কীভাবে? সংবিধানের এই ২৫ নং ধারা কি ১৫ নং ধারার পরিপন্থী নয়?

(২) আবার দেখুন, সংবিধানে ১৫নং ধারা বিদ্যমান থাকা সত্তেও ২৮নং ধারা সংযোজন করে হিন্দুদিগকে তাদের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রর্থনা-পদ্ধতির (religion) পঠন-পাঠন করতে মানা করা হয়েছে। এতৎসত্তেও যদি তারা করেন, তবে সরকারের অনুদান এবং স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাবে। Article 28 reads as follows :

(i) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund;

(ii) Nothing in clause (i) shall apply to educational institution which is administered by the state but has established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution;

(iii) **No person attending any educational institution recognised by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious institution that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.**

(৩) পক্ষান্তরে লক্ষ্য করুন, সংবিধানের ১৫নং ধারা মেতাবেক যেখানে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা উপেক্ষা করে সংবিধানে ৩০নং ধারা যুক্ত করে সংখ্যলঘুদের শিক্ষায়তনগুলিতে উপাসনা-পদ্ধতির (religion) পঠন, পাঠন ও প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকারী অনুদান এবং স্বীকৃতি পেতে কোন অসুবিধা হবে না।

Article 30 reads as follows :

(i) All minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish and administer educational institutions of their choice;

(ii) **The state shall not, in granting aid educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.**

পূর্বোক্ত ২৮ ও ৩০নং ধারা যথাক্রমে একদিকে পঠন-পাঠনের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, অপরদিকে সংখ্যালঘুদের উপাসনা-পদ্ধতির প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সরকারী অনুদান দেয়া হচ্ছে, তা দেয়া হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিকট থেকে আদায়-করা রাজস্ব থেকে এবং ন্যায়ত ও ধর্মত তাদের প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। এর নামই

বুঝি সেকুলারবাদ (উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা)? স্বাভাবিক কারণেই তথাকথিত সেকুলারাবাদীদের কাছে প্রশ্ন রাখছি ঃ হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতির পঠন-পাঠন এবং তার প্রচার ও প্রসারের কোনই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে শুধু সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতিই সাচ্চা, হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতির কোন মূল্যই নেই? ভাবতে অবাক লাগে, ভারতের যারা সংবিধান রচনা করেছিল তারা প্রধানত হিন্দু হয়ে, এ-ভাবে হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি চরম অবমাননা এবং ঔদাসিন্য-প্রদর্শন করেছিলেন! আশা করি, পাঠক মহোদয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, কীভাবে সংবিধানের ১৫নং ধারার অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে এবং কাদের স্বার্থে!

(খ) দেশের অখণ্ডতা ও সংহতির ব্যাপারে আমাদের সংবিধান কী বলছে, সেদিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক।

(১) ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজন করে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন রাজ্যকে দেয়া হয়নি। অথচ জম্মু ও কাশ্মীরের তদানিন্তন রাজা হরি সিং একই 'Instrument of Accession'-এ সই করে ভারতের সাথে নিজের রাজ্যকে যুক্ত করেছিলেন। শুধুমাত্র নেহেরুজীর ভ্রাতৃপ্রতিম শেখ আবদুল্লাকে খুশী করার জন্যে এই ৩৭০নং ধারা সংযোজিত হয়েছিল। এই ধারা নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো না। শুধু একটি উদাহরণ দেবো মাত্র। এই ধারা-বলে ভারতবর্ষের কোন নাগরিক জম্মু ও কাশ্মীরে একখণ্ড জমিও কিনতে পারবে না; পক্ষান্তরে সেখানকার নাগরিকরা ভারতের যে কোন স্থানে জমি বাড়ী কিনতে পারবে। কাশ্মীর সম্পর্কে আরও একটি কথা বলার আছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের অব্যবহিত পরই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে গিলগিট সহ বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। তখন পণ্ডিতজী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের পরামর্শ উপেক্ষা করে এবং মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির পরামর্শে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে ছুটে যান সুবিচারের আশা নিয়ে। কিন্তু পণ্ডিতজীর তখনো জানতে বাকী ছিল, মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি ভারতের মঙ্গলের জন্য এ পরামর্শ দেননি, দিয়েছিলেন যে চক্করে ভারত জড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে যাতে সে কোনদিন বেরিয়ে আসতে না পারে তার জন্যে। কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেলো তাই। দীর্ঘ বাহান্ন বছর ধরে ভারতের কোষাগার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা জলের মতো ব্যয় হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের ঘর ও বাইরের শত্রুর মোকাবিলা করতে। ১৯৪৭-উত্তর কালের আরও একটি বড় ঘটনা হলো, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে ওখানকার মুসলমানরা সব হিন্দুকে (তিন লক্ষ) তাড়িয়ে দিয়েছে। এবার জম্মু থেকেও হিন্দু বিতারণ-পর্ব আরম্ভ হয়েছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বিতারিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজ তাদের শেয়াল-কুকুরের জীবন যাপন করতে

হচ্ছে। আর, এর জন্যে যিনি দায়ী সেই ক্লীব পণ্ডিতজীকে সগৌরবে নবভারতের রূপকার বলে প্রচার করা হচ্ছে! এর চেয়ে জাতির আর কী দুর্ভাগ্য হতে পারে!

(২) সংবিধানের আরও একটি ধারা ২৪৪। এই ধারা অনুযায়ী হিন্দুস্থানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ডে প্রবেশের জন্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়। তবে খৃষ্টান যাজকদের জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থানুযায়ী খৃষ্টান যাজকেরা যথা ইচ্ছা তথা যেতে পারেন এবং নিয়মিত ও পরিকল্পনানুযায়ী আদিবাসী ও গিরিবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের দিকে কিছু খুদকুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ত্রাণকর্তা যীশুর প্রতীকচিহ্ন-স্বরূপ একটি ক্রশ তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে উপাসনা-পদ্ধতি-রূপান্তরকরণের কাজ তারা বিনা বাধায় করে যাচ্ছে। কারণ, খৃষ্টানরাও যে মুসলমানের মতোই সংখ্যালঘু। **হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘুদের জন্যে সমস্ত দরজাই খোলা আছে, শুধু খোলা নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্যে!**

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি জরুরী কথা বলার আছে। তা হলো, নাগাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব। নাগাল্যাণ্ড কোনদিন দিল্লীর প্রভুত্ব মানেনি এবং দীর্ঘদিন যাবত তারা তাদের এ-মনোভাব ব্যক্ত করে যাচ্ছে। তাতে-ও যখন কোন কাজ হচ্ছে না, তখন তারা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং স্বাধীন ও বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ডের জন্যে সোচ্চার হচ্ছে। এ-অবস্থা একবছর বা দু'বছরে ঘটেনি। প্রথমদিকে দিল্লীর শাসক গোষ্ঠী (অবশ্যই কংগ্রেস) নরম মনোভাব নেয়ার ফলে নাগাল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। অতঃপর এমন একটি সময় আসে যখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দমন করার জন্যে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নেয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সরকার একতরফাভাবে Cease Fire (যুদ্ধবিরতি) ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে Cease Fire শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে যা একমাত্র যুদ্ধরত দুই দেশের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে কি তবে দিল্লী নাগাল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল এবং নাগাদের সাথে পেরে না ওঠায় একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল? এর উত্তরে যিনি যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, আসল ঘটনা নাগাদের সাথে পেরে না ওঠায় তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল দিল্লীর সরকার। তাই একতরফা Cease-fire-এর পথ বেছে নিয়েছিলো। তাতে ফল হয়েছিল। প্রায় দু'বছর ধরে নাগাল্যাণ্ডে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছে। উভয়পক্ষই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, আলোচনা হবে কোথায়? নিউদিল্লী বল্লো, দিল্লীতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু নাগাল্যাণ্ডের NSCN-IM

নেতৃত্ব বল্লো, তা কী করে হয়? লড়াইটা তো দিল্লীর বিরুদ্ধে, আলোচনা যদি করতেই হয় তবে তা হবে ভারতের বাইরে অন্য কোনো-ও এক স্থানে। দিল্লীর নেতৃত্ব তাই মেনে নিল। এবং NSCN-1M-এর সাথে ভারত সরকারের সর্বশেষ আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে পি.টি.আই. যে-সব কথা বলেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পি.টি.আই.-এর দেয়া খবরটি দি ষ্ট্যাট্‌স্‌মান পত্রিকা তাদের ১০.৪.৯৯ ইং তারিখের সংস্করণে যে-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে পাঠকের অবগতির জন্যে, তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে দিলাম। "Talks with Centre held in Amsterdam : NSCN-1M appeals for support. New Delhi, April 9– The NSCN-1M has urged Nagas to put into their 'best efforts' to find an honourable solution to the Naga problem, following its latest round of talks with government representatives in Amsterdam last month. The Centre's chief negotiator, Mr swaraj Kaushal, confirmed that the four-day meeting was held from 24 March, but refused to give details. The NSCN-1M chairman, Mr Isak Chishi Swu, said the series of parleys had entered a 'serious phase'. The concerned parties wanted a lasting solution, he said. However, in a statement from 'Ooking' or roving head quarters Mr. Swu said : There can be no genuine solution if India tries to impose its will on Nagas. We have made the Indian delegation quite aware of the essentiality of reflecting the national aspiration and stand of the Naga People for any agreement to work. Mr. Swu said : Best efforts are being demanded from every Naga for bringing an honourable solution to the 52-year old problem... The Centre's talks with the NSCN-1M began during the Narasimha Rao regime and were continued by the United Front governments. While H.D. Devegowda met the leadership of the group at Zurich in February 1997, during the I.K. Gujral's stint as Prime Minister, the Centre had announced a three-month ceasefire with the group in August 1997 for the first time. The cease-fire was periodically extended for three months thrice, before the Vajpayee government announced its extension for one year last August. The other major Naga group the NSCN (Khaplang), also worked out a truce with the Army following initiatives by Naga Ho Ho, the apex tribal body and other NGOs." (The Statesman 10.4.99)

(গ) এখন সংবিধানের যে-সব ধারায় ভাষা, উপাসনা-পদ্ধতি নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে অভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা আছে, অথচ নেয়া হচ্ছে না, সে-সম্বন্ধে কিছু বলবো।

(১) সংবিধানের ৪৪নং ধারায় বলা আছে ঃ

The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. আমাদের সংবিধান চালু হয়েছে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী। কিন্তু আজও এই অভিন্ন দেওয়ানী

আইন চালু হয়নি। কেন চালু হয়নি, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের এক রায়ে সুপ্রীম কোর্ট ভারত সরকারের কাছে তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন এবং সে-ব্যাপারে ভারত সরকার কতদূর কী করলেন তা ১৯৯৬-এর মাঝামাঝি কোর্টকে জানাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এব্যাপারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ যেহেতু এই অভিন্ন দেওয়ানী আইনের সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন জড়িত, তাই এ-ব্যাপারে কিছু করা যাবে না। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ঃ কেন করা যাবে না? সংবিধানে তবে এ-ধারাটি রাখা হয়েছে কেন? ভারতের ৮৫ শতাংশ লোক এক আইন মেনে চলবে, আর ১৫ শতাংশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আইন থাকবে, এ কোন ধরণের উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা? ইংলণ্ড বা আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানরা এবং অন্যান্য উপাসনা-পদ্ধতির লোকেরা কি সে-সব দেশের আইন না মেনে চলতে পারেন? তাদের জন্যে কি সে-সব দেশে নতুন এবং ভিন্ন আইন চালু করা হয়? যদি না হয়, তবে হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মুসলমান এবং অন্যান্য উপাসনা-পদ্ধতির লোকদের জন্যেই বা করা হবে কেন? সংখ্যালঘু-তোষণ, বিশেষ করে মুসলমান-তোষণ, কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার আর-ও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন দেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত রাজীব গান্ধী। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'শা-বানু মামলায়' দেশের আইন মোতাবেক সুপ্রিম কোর্ট তাকে যথাযথ খোরপোষ দেবার জন্যে তার স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সেবারের সুপ্রিম কোর্টের আদেশও মুসলিম ব্যাক্তিগত আইনের পরিপন্থী ছিল (কোর্টের আদেশ যতোই আইন মোতাবেক এবং মানবিক হোক না কেন) তাই তদানীন্তন রাজীব গান্ধীর সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করলেন এবং দেশের প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে মুসলমানদের তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রতি চরম অমর্যাদা প্রদর্শন এবং বর্বরোচিত আচরণ করেছিলেন। এর নামই যদি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা (Secularism) হয় তবে ভগবান যেন এই বর্বরদের রক্ষা করেন।

পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে,' অভিন্ন দেওয়ানী আইন প্রচলনের বিরোধীতা করতে যেয়ে, মুসলমানদের ঔদ্ধত্য কোথায় যেয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কিছু নমুনা সর্বসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। আজমগড়ের ইমাম ওবাইদুল্লা খাঁ সাহেব বলছেন ঃ মুসলমানরা কোন বিচারালয়ের রায় মানতে বাধ্য নয়। তারা তাদের ব্যক্তিগত আইনের ব্যাপার নিয়ে কোন বিচারালয়ের দ্বারস্থ হবে না। **মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন পরিবর্ত্তনের যদি কোনপ্রকার চেষ্টা হয় তবে আর.এস.এস.-এর প্রধান সরসংঘচালক বালাসাহেব দেওরাস, তদানীন্তন বি.জে.পি. সভাপতি শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীকে "কলমা**

**পড়তে" বাধ্য করে মুসলমান করা হবে।** (Source-Constitution of India, a curse to the Hindus by sri P.N. Joshi) । এই ইমাম সাহেবই স্থানান্তরে বলেছেন ঃ **হে মুসলমানগন! তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই।... ইসলাম এখনো জীবিত এবং কোরান-ও যথাস্থানেই আছে।** কাফেররা মনে মনে ভাবছে কী? কারবালার চূড়ান্ত যুদ্ধ এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন আমাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা তা মেনে চলবো।... **আমরা কোন বিচারালয়ের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য নই। হাইকোর্ট তো দূরের কথা, সুপ্রিম কোর্টও যদি মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকেও আমরা পায়ের নীচে রাখবো।** (সূত্র— Times of India dated 27.3.1990)।

(২) সংবিধানের ৪৮ নং ধারায় আছে ঃ Prohibition of Cow Slaughter. "The article enjoins the prohibition of slaughter of any of the species of cattle." (Courtesy–Durgadas Basu-Constitutional Law of India P-132). এখানে দেখা যাচ্ছে, সংবিধানে গোহত্যা বন্ধ করার বিধান থাকা সত্ত্বে-ও বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার এ-ব্যাপারে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেনি। প্রশ্ন উঠবে ঃ কেন? উত্তর সেই একই— যেহেতু মুসলমান ও খৃষ্টানরা এর বিরোধী, তাই তাদের অখুশী করে এ আইন কার্যকরী করা যাবে না। গোহত্যা প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের নাদুয়াতুল উলেমার রেক্টর, জামাত-ই-ইসলামী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং মুসলিম পারসোনেল ল বোর্ডের সভাপতি মৌলানা আবদুল হাসান আলি নাদভির (যিনি আলি মিঞা নামে পরিচিত) একটি বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন ঃ **"সাধারণভাবে গরু কোরাবানি করা মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। অন্যান্য দেশে এই কোরবানি কাজটি ততো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও যেহেতু ভারতের হিন্দুরা গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে তাই এখানে গরু কোরবানি করা বিশেষ জরুরী"**। (সূত্র—পাঞ্চজন্য ৫.৯.১৯৯৪ ইং)।

ভারতীয় সংবিধানের কিছু ধারা নিয়ে আলোচনায় দেখা গেল, সংবিধান কার পক্ষে কথা বলছে এবং কার হয়ে কাজ করছে। আরও দেখা গেলো, যাদের হয়ে মেকি সেকুলারবাদীরা ওকালতি করছেন তারা শুধু কট্টর সাম্প্রদায়িক শক্তিই নয়, তাদের প্রতিটি কথার মধ্যে হিংস্রতা ও পৈশাচিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তাদের অবগতির জন্যে আর-ও একটি বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। বক্তব্যটি জামাত-ই-ইসলামীর আমির কাজী হোসেইন আহমদের। ১৩-পার্টির ইসলামিক ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সের সভায় বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বলেছেন ঃ **"ইসলামিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো, দিল্লীর লালকেল্লায় ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা এবং কাশ্মীরকে মুক্ত করা।"** (সূত্র—হিন্দু ওয়ার্ল্ড, ফেব্রু-মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩০-৩১)।

# ভারতবর্ষে পরিবার পরিকল্পনা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ভারতবর্ষে পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) অর্থাৎ পরিবারকে সীমিত রাখার পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই। "হাম দো, হামারা দো অর্থাৎ আমরা দুজন, আর আমাদের সন্তানও হবে দু'জন" এই প্রচারপত্র দিয়ে দেশ ভরে ফেলা হয়েছিল এবং একাজ করতে যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অদ্যাবধি প্রচুর টাকা খরচ করে চলেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তার কারণ, এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্যে যে মানসিকতা ও দৃঢ় পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন ছিল তা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কারুরই ছিল না বা আজো নেই। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। একদিকে জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে, অপরদিকে জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। প্রধানত যাদের জন্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সেই অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ আজ পর্যন্ত নিজেদের এ প্রকল্পে সামিল করেনি। পক্ষান্তরে যারা শিক্ষিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল তারা অনেকদিন আগে থেকেই অর্থাৎ ভারত সরকার কর্তৃক ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবার পরিকল্পনার প্রকল্প হাতে নেওয়ার পূর্বেই নিজেদের পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং এখনো আছেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে সংখ্যায় তারা দেশের জনসংখ্যার ১৫% শতাংশের বেশী নয়। বাকী ৮৫% শতাংশের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করার ফলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় (১৯৪৭ সালে) খণ্ডিত ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটির মতো; আর ৫৩ বৎসর পর ২০০০ সালে এ-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ কোটি কিংবা তারও বেশী। ফলে, দারিদ্র্য ও বেকারী দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজজীবন ক্রমেই বিষাক্ত ও কলুষিত হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন উঠবে ঃ সরকার তবে শিক্ষা ও পরিবার সীমিত রাখার কাজটি বাধ্যতামূলক করেনি কেন? কারণ একটাই। সংখ্যালঘু মুসলমানরা দেশের সাধারণ আইন মেনে চলতে রাজী নয়, তারা তাদের ব্যক্তিগত আইনের দ্বারা পরিচালিত; কারণ ইসলামের উপাসনা-পদ্ধতিতে নাকি পরিবার-পরিকল্পনা নিষিদ্ধ। তাই, ভোট হারাবার ভয়ে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এতোদিন পরিবার পরিকল্পনাকে বাধ্যতামূলক করেননি। কিন্তু মুসলমানদের

এ ধারণা যে অমূলক সে-কথা বলেছেন রাষ্ট্রসংঘের পদস্থ অফিসার বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ নাফিস সাদিক। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি ইসলাম-বিরোধী নয়"। তিনি ইউনাইটেড নেশন্স পপুলেশন ফাণ্ড-এর দায়িত্বে রয়েছেন। ডঃ সাদিকের বক্তব্য হলো, একদল মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পটি আটকাতে চেষ্টা করছে। যে আইন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মঙ্গল করবে তাকে আটকানোর কোন অধিকার বিরোধীদের নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। "পরিবার পরিকল্পনা" প্রকল্পকে রাজনৈতিক নেতারা যেন রাজনীতির 'ঘুটি' হিসেবে ব্যবহার না করেন, সে বিষয়েও তিনি সতর্ক করেছেন। (সূত্র—বর্তমান, ২৬/২/৯৮ ইং)।

বিগত পাঁচ দশকে খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে ভারত যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে তাল রেখে খাদ্যের যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকার "World Watch Institute" তাদের এক সমীক্ষায় আমাদের বক্তব্যই সমর্থন করেছে। "the study says, India, World Watch notes, has achieved impressive gains in its harvest but these have been largely cancelled by population growth, leaving most of its 989 million people living close to the margin." ওয়ার্ল্ড ওয়াচ আর-ও বলেছে, "এভাবে যদি ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে অচিরেই জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত চীনকে ছাড়িয়ে যাবে এবং বিপদের সম্মুখীন হবে।" (Courtesy–The Statesman dated 12.4.99 A.D.).

HYDERABAD, Dec 27. The Issue of population stabilisation, has taken the proportion of a 'national emergency'. Stating this on the occasion of the 74th National Conference of the Indian Medical Association in Hyderabad today, the re-elected general secretary of the IMA, Dr. Prem Agarwal said, the present population policy had failed to deliver goods and there was an urgent need for a revised policy in order to tackle this burning issue. He also said that the failure of the present population policy like those of the health programmes is evident from the fact that **by the year 2024, the population of India would be 200 crores** and India would become the most populace country of the world. (Courtesy–The Statesman dated 28.12.98.). IMA-র নবনির্বাচিত সম্পাদক মহাশয়ের কথা আমরা শুনলাম। এবার আমরা তার সভাপতি মহাশয়ের কিছু কথা শুনবো।

New Delhi, Jan. 14–The Indian Medical Association has recommended setting up of an apex committee under the Prime Minister, to tackle population explosion. Population explosion is the biggest threat facing the country and should be declared a national crisis said the IMA President, Mr. V.C. Patel. The organisation has chalked out a people-centred population policy

and is organising a seminar on "Population Explosion–A National Crisis" on 16th January. (Courtesy–The Statesman, dated 15.1.99).

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন প্রাবন্ধিক শ্রী এইচ. ডি. শৌরী লিখছেন, "At no stage has any programme of positive incentives and disincentives been evolved to tackle the problem of uncontrolled population. No government either at the centre or in the states, has dared to come forth with a positive declaration, for instance, that henceforth families with two or more children and adding to their members will be excluded from the benefit of rations from fair price shops. And likewise, that any benefit of any other privilege accorded through a government agency will also be limited... The nation and its leadership have to resolve **that it must be done. It can be done."** (Courtesy–The Times of India, dated 18.1.99).

শ্রী বি. কে. সহায় একজন নামকরা কলামিষ্ট (Columnist)। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "Nothing else has a chance to go right if we do not first put a brake on our rapid population growth without any further delay. **For this, the Nation will have to muster the courage and wisdom to administer to itself a better dose of compulsory family planning**...Let us realise that compelling a man–rich or poor–who has already got two children to undergo vasectomy is in no way atrocious or inhuman." (The Statesman, dated 22.10.1997). লেখকের বাধ্যতামূলক পরিবার পরিকল্পনার প্রস্তাবের সাথে আমরা একমত। তাঁর সাথে আমরা সহমত পোষণ করি আর একটি ব্যাপারেও। তা হলো, দুটি সন্তানের পর কোন দম্পতিকেই তৃতীয় সন্তানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে বাধ্যতামূলক Vasectomy-র যে প্রস্তাব লেখক মহাশয় রেখেছেন, তার সাথে আমরা একমত নই। কারণ, যদি কোন কারণে উক্ত দম্পতির একটি বা দু'টি সন্তানই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সেক্ষেত্রে তাদের আর সন্তান পাওয়ার সুযোগ থাকে না, অথচ সন্তানের জন্ম দেবার বয়স তখনো তাদের পার হয়ে যায় নি। সে-অবস্থা অত্যন্ত দুঃসহ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। সে-কথায় আমি একটু পরে যাবো। তার পূর্বে চীন-দেশে একসন্তানযুক্ত পরিবার-পরিকল্পনা কতখানি সফলতা লাভ করেছে, সে সম্বন্ধে আমরা সেখানকার প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন, তা শুনবো। "BEIJING, Oct. 13–China has defended its draconian family planning policies saying it has been the deciding factor in improving living standards and economic performance, media reports today said, reports PTI. Speaking at the inauguration of the 23rd. International Population Conference yesterday the Chinese Premier, Mr. Li Peng said policies implemented since 1970 had prevented China's polulation, already the world's largest at 1.22 billion, from increasing by 300 million. **'Co-ordination of population controls**

**with the economy, resources and the environment is the only option** for the country's modernisation,' he said. (Courtesy– The Statesman, dated 17.10.1997). এইমাত্র চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় লি পেং যে কথা বললেন, আমাদের প্রস্তাবও তাই অর্থাৎ দেশের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সাথে সমতা রেখে দেশের জনসংখ্যা সীমিত রাখতে হবে। Vasectomy বা লাইগেশনের পক্ষপাতি আমি নই; তবে Contraceptives অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ে উন্নত দেশগুলির কোন সমস্যা নেই। শিক্ষায় এত উন্নত যে, এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সজাগ। সমস্যা হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলি নিয়ে। অন্ধকারে তারা এতই নিমজ্জিত যে, নিজেদের ভালমন্দের ব্যাপারেও তারা উদাসীন। আরো মজার কথা, নিজেরা তো বুঝবেই না, কেউ যদি তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়েও দেখিয়ে দেয়, তা ও তারা সন্দেহের চোখে দেখবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসবে না।

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাব প্রসঙ্গে ফিরে যাবো। একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করছি। ধরা যাক ২০০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা একশ কোটি হবে। এই একশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে যে সব দম্পতির দুই বা ততোধিক সন্তান আছে তারা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আর কোন সন্তানের জনক-জননী হতে পারবেন না। এ আইন বাধ্যতামূলক। তবে যে-সব যুবক-যুবতী ২০০০ সালে কিংবা তারপর (কিন্তু ২০১০ মধ্যে) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তাদেরকে বলা হবে, সম্ভব হলে এই ১০ বৎসরের মধ্যে একটি সন্তানেরই জনক-জননী হও; যদি একান্তই ইচ্ছে কর, তবে সর্বোচ্চ দুটির বেশী সন্তান যেন কোনক্রমেই না হয়। সেক্ষেত্রে যুবক-যুবতীর বয়স ন্যূনপক্ষে যথাক্রমে ২১ ও ১৮ হতে হবে। যারা এ নিয়ম মানবেন না, তারা শাস্তিমূলক অপরাধের আওতায় পড়বেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কীরূপ শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে তা আমি এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে "সমাধান কোন পথে" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। এই নিয়ম ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল ভাষাভাষী ও উপাসনা-পদ্ধতির লোকের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। এর সাথে সাথে, দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আগামী দশ বছরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যাতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত দেশের কর্মক্ষম শেষ মানুষটির কর্মসংস্থান না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত ঃ

(ক) **বর্ত্তমানে যারা দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতামাতা আছেন, তারা কোনক্রমেই আগামী দশ বছরের মধ্যে, প্রয়োজনে তার পরের দশ বছরের মধ্যে কিংবা কোনদিনই আর নবজাতকের পিতামাতা হতে পারবেন না।** যারা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে এসেছে তাদের মানুষ করা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে যেমন রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব আছে, তেমনি পিতামাতারও

সমপরিমাণ দায়-দায়িত্ব আছে। পিতামাতারা যদি সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা না দেন এবং কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্যে যোগ্য করে না তোলেন তবে তারা কী-ভাবে কর্মের দাবীদার হবে?

(খ) আর যারা নতুনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন তাদেরকেও "Two-Children Parents"-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত সম্পাদক সহ যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিবেদন আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি তা একটু স্থির মস্তিকে চিন্তা করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চিত্রটি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁদের কারুর কারুর মতে আগামী শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যা ২০০ কোটিতে যেয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং আমরা দেশের শাসকগোষ্ঠীর কাছে এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন রাখছি, তাঁরা যেন সময় থাকতে, **দেশের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সাথে সমতা রেখে জনসংখ্যা সীমিত রাখার বাধ্যতামূলক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নতুবা শুধু 'শিরে সর্পাঘাত' নয়, হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে অচিরেই এবং এই হিন্দুস্থানের মাটিতেই।**

আমাদের দেশ বিরাট এবং সম্পদও বিরাট। পরিকল্পনামাফিক যদি কাজ করা যায় অর্থাৎ জনসংখ্যাকে সীমিত রাখা যায় এবং পাশাপাশি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তবে অচিরেই দেখা যাবে, দেশে তো বেকার লোক থাকবেই না, পরন্তু দেশের সম্পদ এমন বৃদ্ধি পাবে যা দেশবাসীর প্রয়োজন মিটিয়েও বহির্বিশ্বে রপ্তানী করা যাবে। এবং রপ্তানী মানেই বিদেশী মুদ্রা আহরণ। তখন আমেরিকার চোখরাঙানীর পরিবর্তে আমরা তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে পারবো।

" তদেতৎ ক্ষাত্রাস্য ক্ষত্রাং যদ্ধর্ম্মঃ তস্মাৎ ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি।
অথো অবলীয়ান বলীয়াংসমাশংসতে ধর্মেন যথা রাজ্ঞা এবম্।।
- বৃহৎ আরণ্যকোপনিষদ্।

"(Dharma) is the king of kings, none is superior to dharma, dharma aided by the power of the king enables the weak to prevail over the strong." Commenting on the above provision Dr. S. Radhakrishnan observes : 'Even Kings are subordinate to Dharma'.

## দেশদ্রোহীদের মুসলীম-তোষণ ও সংরক্ষণের রাজনীতি কি কোনদিন বন্ধ হবে না?

গান্ধীজীর (স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী) মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনের সাথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সামিল করার মধ্য দিয়ে মুসলীম-তোষণ আরম্ভ হয়েছিল এবং তার প্রথমপর্ব শেষ হয়েছিল ১৯৪৭-এর ভারত-বিভাগ দিয়ে। সে এক কলঙ্কিত ইতিবৃত্ত যার কিঞ্চিত আভাস পাঠক মহোদয় ইতিমধ্যে পেয়েছেন। সেদিন না হয় তৃতীয় পক্ষ ছিল; **কিন্তু তৃতীয়পক্ষ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর মুসলমানরা যখন নতুন-পাওয়া পাকিস্থানকে ইসলামিক রাষ্ট্র (Islamic State) হিসেবে ঘোষণা করলো তখন কেন ভারতবর্ষ নিজেকে হিন্দু-রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলো না?** তৃতীয় পক্ষের মদত ও উসকানিতে সেদিনগুলিতে মুসলমানরা ভারতবর্ষের মাটিতে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, নারীনির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজে লিপ্ত ছিল তা কি ভারতবাসী কোনদিন ভুলতে পারবে? উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশকে টুকরো টুকরো করে মুসলমানরা তাদের অংশ বুঝে নেবার পর খণ্ডিত ভারতবর্ষে কি তাদের একদিনও বাস করার অধিকার ছিল বা আজও আছে? উত্তরে বলবো ঃ না, ছিলনা বা আজো নেই। তবে এখানে একটি 'কিন্তু' আছে। সেই কিন্তুটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, পৃথিবীটা মুসলীমদের। মুসলমানদের কোরান শরীফে আছে, যদি অমুসলমানরা (কাফেররা) স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ভাল কথা, আর যদি না করে তবে তাদেরকে স্বমতে আনা প্রতিটি মুসলমানদের পবিত্র কর্ত্তব্য—তা যে ভাবেই হোক না কেন। যতদিন না পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামকে নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতি বলে মেনে নেবে ততদিন পর্য্যন্ত 'জেহাদ' চলতেই থাকবে। যতদিন না সমস্ত পৃথিবীটাকে 'দার-উল ইসলামে' পরিণত (Islamised) করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সংঘাত চলবেই। একবারে যদি সম্ভব না হয়, তবে ধীরে ধীরে অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কোনক্রমেই থেমে যাওয়া চলবে না। এই বিরাট পরিকল্পনা থেকে ভারতবর্ষ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রথম পর্বে ইংরেজদের মদতে এবং হিন্দু নেতৃত্বের (পড়ুন, কংগ্রেসের) অদূরদর্শিতার ফলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলো। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পর্ব চলছে। এ পর্বে খণ্ডিত ভারতবর্ষের মুসলমানরা যুগপৎ ভোটব্যাংকের লোভ দেখিয়ে এবং মুখে সেক্যুলারবাদের কথা আওড়িয়ে সেই একই নেতৃত্বকে বুরবক বানিয়ে তাদের

অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। **আর দেশের হিন্দু নেতৃত্ব এতোই অপদার্থ যে তারা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ (পড়ুন, মালপানি) চরিতার্থ করার জন্য দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চলেছে।** আর-ও দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের ৭৫% লোক তাদের এই অপকর্ম নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে কোরান শরীফের একটি আয়াত (অনুবাদকের টিকা সহ) তুলে ধরছি। তা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাবে, খণ্ডিত ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে মেকি-সেকুলারবাদীদের সাথে একসুরে রা মিলিয়ে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার (Secularism) কথা বলে যাচ্ছেন।

"মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করিবে খোদার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। **অবশ্য তাহাদের জুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য বাহ্যত এইরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করিলে তাহা আল্লাহ ক্ষমা করিবেন।** আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছেন, তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" (৩/২৮) [ অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি কোন ইসলাম-দুশমন দলের পাল্লায় পড়ে ও তার উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তা হলে তার প্রতি এ অনুমতি আছে যে, সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফেরদের সংগে বাহ্যত সে এরূপভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাহাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমানত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কাফেরদের সংগে বন্ধুত্বমূলক আচরণ-ভাব প্রকাশ করতে পারে। এমন কি, কঠিন ভয়ের অবস্থায়, যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে কুফরী কথা পর্য্যন্তও ব'লে যাওয়ার অনুমতি (রুখসৎ) আছে। অর্থাৎ এর জন্যে আল্লাহ্ তা 'আলা পাকড়াও করবেন না। ] **এই অর্থাৎ-এর সাথে আমরা আর-ও একটা অর্থাৎ যুক্ত করে বলতে চাই ঃ কোরান শরিফের এই আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, যতদিন পর্যন্ত তোমরা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারছ ততদিন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করবে মাত্র।**

মুসলিম-তোষণ ও সংরক্ষণের রাজনীতির দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে। প্রতিটি সভ্য দেশের সংবিধান রচিত হয় দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে নজর রেখে এবং তা প্রযোজ্যও হয় দেশের সমস্ত নাগরিকদের উপর সমানভাবে অর্থাৎ কারুর প্রতি কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং/অথবা উপেক্ষা প্রদর্শন না করে। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধান এ ব্যাপারে একান্তভাবেই একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। আমরা পূর্বেই বলেছি, যে ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল তারপর অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পর খণ্ডিত ভারতবর্ষে একটি মুসলমানের-ও

**থাকার** অধিকার ছিল না। নির্বুদ্ধিতা, ঔদার্য্য কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, দেশভাগের পর যখন মুসলমানদের এদেশে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হ'ল এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হলো তখন বৃহৎ স্বার্থে তাদের যেমন উচিৎ ছিল দেশের মূল স্রোতের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়া তেমনি শাসকগোষ্ঠীর উচিৎ ছিল দেশের স্বার্থে সকল নাগরিকের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া। কিন্তু না, জাতির দুর্ভাগ্য, তা হলো না! সেদিনের সংবিধান রচয়িতারা এবং পরবর্তীকালে আইন প্রনয়ণকারীরা তাদের নাগরিকদের জন্যে এমন কিছু বিধান ও আইন প্রণয়ন করলেন যার ফলে দেশের সংহতি ও একাত্মতা চিরদিনের মতো চুরমার হয়ে গেলো। যেমন—

(১) জম্মু ও কাশ্মীরের জন্যে সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজন করে দেশের সংহতি নষ্ট করা হয়েছে। তার ঢেউ ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর প্রভৃতি রাজ্যে যেয়ে পৌঁচেছে।

(২) সংবিধানে ৩০ নম্বর ধারা যোগ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মুসলমানদের, প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি মৃত্যুবান হানা হয়েছে।

(৩) হিন্দুদের জন্যে "হিন্দু কোড বিল" ও মুসলমানদের জন্যে তাদের "ব্যক্তিগত আইন" পাশাপাশি চলতে দিয়ে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে দেশ আবার দ্রুতগতিতে বিভাজনের পথে এগিয়ে চলেছে।

এ তো গেল সাংবিধানিক রক্ষাকবচ। এখন আমরা মুসলমানদের বেশ কিছু সংরক্ষণের দাবী এবং সাথে সাথে দেশের কিছু রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন তাদের সেই দাবীর প্রতি কীভাবে সমর্থন এবং মদত দিচ্ছে তার কিছু নমুনা পাঠকের সম্মুখে হাজির করবো।

(১) "New Delhi, April 1-The Chairman of the National Commission for Minorities Prof. Tahir Mahmood, inter alia, said that commission has decided to set up an advisory committee, headed by the Chairman, to examine the issue of **proportionate representation** of various minorities in legislative and decision-making bodies and public employment." (The Statesman 2.4. 1999).

(2) "Chennai, March 9– The Indian Union Muslim League today called for 'equal status' for minorities at the inaugural session of the organisation's Golden Jubilee celebrations. No one can ask Muslim to go to an Islamic Country, nor a Christian to go to Rome, the IUML said, since "all are equal in India". **কেন নয়, মিঃ বানাতওয়ালা? আপনারা তো আপনাদের অংশ বুঝে নিয়ে পাকিস্তান পেয়ে গেছেন। সে-দেশে আপনাদের যেতেই হবে। এ দেশে থাকা চলবে না। দ্বিতীয়তঃ বানাতওয়ালা সাহেব বলেছেন, ভারতবর্ষে সবাই**

**সমান। কোন্ কোন্ ব্যাপারে সমান তা তিনি বলবেন কি? ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল নাগরিকের জন্যে সমান দেওয়ানী আইন (Uniform Civil Code) তিনি মেনে নিতে রাজী আছেন কি?** তিনি তার সীমা অতিক্রম করে বলেছেন, "the Suffron brigade posed the greatest threat to democracy, the IUML would strive for political stability and social amity". কীভাবে, বানাতওয়ালা সাহেব বলবেন কি? নিশ্চয়ই সমস্ত অমুসলমানকে ইসলামের উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে। সাফ্রান ব্রিগেড তাদের এই পরিকল্পনায় বাধ সাধছে বলেই কি এতো বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে বানাতওয়ালা সাহেবের নিকট? ধীরে! বানাতওয়ালা সাহেব, একটু ধীরে চলনু! শুধু এতেই তিনি খুশী হতে পারেননি; আরও এক কদম বাড়িয়ে বলেছেন, "the Bihar Governor, Mr. S.S. Bhandari, was an RSS man and called for his resignation." অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্যের কে গবর্ণর হবেন বা কে প্রাধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হবেন তার জন্যে বানাতওয়ালা সাহেবদের মত বা অনুমতি নিয়ে করতে হবে। ধৃষ্টতার-ও একটা সীমা থাকা উচিত! [ উপরের উদ্ধৃতি ক'টি দি ষ্ট্যাট্স্ম্যানের ১৩/৩/১৯৯৯ তারিখের সংস্করণ থেকে গৃহীত]।

(৩) "স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লী, ৩১ অক্টোবর—লোকসভা ও বিধানসভায় মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষণের দাবী নতুন করে উঠতে শুরু করেছে। আজ এখানে মুসলিম সাংসদদের এক সভায় দেশের আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রতিনিধি না থাকার কারণে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করা হয়েছে। **প্রাক্তন সাংসদ সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের ডাকা ওই সম্মেলনে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের মতো বিভিন্ন দলের প্রায় দশজন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন, ফলে এই দাবী আলাদা একটা মাত্রা পেয়ে গেছে।** অংশগ্রহণকারী সাংসদদের দলীয় বাধ্যবাধকতার কারণে সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য মুসলিমদের জন্যে সংরক্ষণ চালু করার প্রস্তাব নেওয়া যায়নি। তবে দেশের সংসদে ও বিধানসভাগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিমদের যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নেই সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করার সিদ্ধান্তই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। সৈফুদ্দিন সোজ বা তারিক মহম্মদের মতো যে নেতারা আজকের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন এই প্রস্তাব সংরক্ষণ দাবীরই নামান্তর।.... **এর আগে সংসদে মহিলা বিল পেশ করার সময় দলনির্বিশেষে মুসলিম সাংসদরা এভাবে একজোট হয়ে তাঁদের মহিলাদের জন্যেও সংরক্ষণের দাবী তুলেছিলেন। তারপর তাঁরা আবার এভাবে একমঞ্চে এলেন।**" (আনন্দবাজার পত্রিকা—১/১১/১৯৯৮)। খবরটি পড়ে আশা করি, কারুরই বুঝতে

অসুবিধাটা হবার কথা নয় যে মুসলমানরা যে দলেই থাকুন না কেন প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা সবাই একমত। **বিভিন্ন দলে থাকার অর্থ শুধুই তাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যে, দলীয় আদর্শ বা নীতি মেনে চলার জন্যে নয়। মুসলমানরা যে দলেই থাকুন না কেন, মুসলমান মুসলমান-ই, দেশ বা দলের স্বার্থের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।**

(4) "New Delhi, Nov. 3–Muslim parliamentarians have suggested proportional representation so that all groups will be adequately represented in the parliament and the legislatures. In a resolution adopted at a meet here, they said representation for Muslims should be given in proportion to population on the basis of the joint electorate as was envisaged in the original provision of the draft constitution... the meet was addressed by senior Congress leader, Mr. Chanderjit Jadav, Jammu & Kashmir Chief Minister, Mr Farooq Abdullah and Muslim leaders from almost all political parties." (The Statesman 4.11.1998).

(5) "Calcutta, March 23,–The West Bengal Madrasah Students' Union to-day demanded 25 percent reservation for Muslims in State Government Services...of the 8251 jobs generated through State Employment Exchanges in 1997-98, only 292 had gone to members of the community, the union said." (The Statesman, 24.3.1999). **একদিকে খাঁটি মুসলমান হবো এবং সাথে সাথে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকুরীর দাবী করবো দুটো হয় না। হয় খাঁটি মুসলমান হয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যত্নবান হোন, নতুবা চাকুরী পেতে হলে যে-সব শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা একান্ত আবশ্যিক সেদিকে নজর দিন। 'Head we win and tail you lose' -নীতি চিরদিন চলে না।**

(6) "New Delhi : A meeting of the Congress Party's minorities department on Tuesday considered supporting **reservation for minorities in government jobs and some other measures to provide socio-economic protection to them. The meeting was attended by party president Sonia Gandhi** and other senior leaders... the meeting decided to oppose the alleged attempts by the Sangh Parivar to harass minorities particularly Christians, B.J.P. Government's attempt to introduce Saraswati Vandana in government schools in U.P., and the B.J.P.'s alleged attempts to interfere with educational institutions of minorities by diluting Articles 29 and 30...Also steps aimed at removing minorities' economic backwardness and providing employment opportunities in government service, including police forces.." (The Times of India, 24.3.1999).

(7) "Congress drive to woo back minorities"– এই শিরনামে দি ষ্ট্যাট্স্‌ম্যান পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি নিম্নরূপ।

"New Delhi, March 24.– The Congress chalked out an action plan for the welfare of minorities, with particular stress on Rajasthan, Orissa, Madhya Pradesh and Delhi, where it is the ruling party...In Rajasthan, the Minority Board, which was abolished by the BJP Government will be re-established. The state will also have a Urdu Academy very soon and the posts of Urdu teachers will be created in government schools and colleges. The State Government will also...revive the almost defunct Minority Financial Corporation. In Orissa..the Chief Minister has been asked to form a Minority Commission and a Minority Finance Development Corporation as soon as possible...In Delhi, a three-member Minorities Commission will be set up, as well as a Minorities Finance Commission. The Delhi cabinet has cleared both decisions... The Delhi Government will also consider demands for making Punjabi and Urdu as second languages in the state. In Madhya Pradesh, a State Minorities Commission has been formed. There have been reforms in the Madrasas and a Urdu Academy has been founded." (The Statesman, 25.3.99).

(8) "Calcutta, March 5–The Forward Bloc has demanded reservations for Muslims creating embarrassment for the Left Front Constituents. Mr. Jyoti Basu has expressed his unhappiness over the F.B's demand voiced by Mr. Kalimuddin Shams, minister for food and supplies, who belongs to the party, at a meeting recently. **Mr. Ashoke Ghosh, F.B. State General Secretary, defended Mr. Shams today and said that the demand had been ratified by his party's Central Committee,** 'We have decided to launch a campaign for the necessary amendment,' Mr. Ghosh said." (The Statesman, 6.3.99).

(৯) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন **দেশের ৪১টি জিলাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৯৭১ সেনসাস অনুযায়ী) বলে চিহ্নিত করেছিলেন** এবং সে-সব জিলাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ সুবিধা পান তার যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। **মাত্র ২০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯১-এর সেনসাস অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৭-এ। এবং ২০০১ সালের সেনসাসে যদি এ-সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায় তবে আশ্চর্যের কিছু নেই।** কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে-ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন, সে ব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রশক্তি একেবারে নির্বিকার; পরন্তু এদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তা দেখভাল করার জন্যে দেশের রাষ্ট্রশক্তি সদা-জাগ্রত। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দেখভাল করার কেউ নেই।

ইন্দিরাজীর রাজত্বকালে যেমন ৪১টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলার মানুষের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনি দ্বিতীয় পর্বের যুক্তফ্রন্ট সরকারও ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে ১৩৭ জিলার মুসলমানদের জন্যে ১৫ দফার এক বিশেষ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ১৯৯৭ সালের ১৯শে অক্টোবর দি ষ্ট্যাটসম্যান পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।

"New package for minorities announced : New Delhi, October, 18–The government to-day announced a fresh package for the welfare of minorities and pledged to recast the 15-point programme for them soon, reports PTI... The welfare Minister, Mr. B.S. Ramoowalia expressed anguish over the dwindling representation of members from the minority communities in the security forces. He would try to ensure adequate representation for them in these jobs." **অর্থাৎ নির্দিষ্ট যোগ্যতা না থাকলেও মন্ত্রীমহোদয় দেখবেন যাতে তারা সে-সব চাকুরী পান। এর নামই বোধ হয় মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা।**

(10) "Only the other day, a responsible Muslim dignitary is reported to have said, –'We are Muslims first and Indians afterward. **Muslim culture is the main stream in India and others must join it."** (Acharya Durgadas Basu, quoted in Viswa Hindu Varta, in their Pous issue 1405 B.S.) মেকী সেকুলারবাদীদের কর্ণে নিশ্চয়ই মধুবর্ষণ করছে!

(11) **"Meanwhile, it is interesting to note that the threat of another partition of India was given at a Muslim conclave held in Delhi last month, if the Muslims were not given separate representation.** Some prominent Congress leaders like Ghulam Nabi Azad and even the Chairman of the Minorities Commission took part in it." (Mr. V.P. Bhatia in ORGANISER, May 9, 1999).

কংগ্রেসের এক বিরাট মাপের মেকি সেকুলারবাদী শ্রীগোলাম নবী আজাদের নাম হয়ত অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম অনেকেই শোনেননি এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ তিনি কীভাবে রক্ষা করে চলেছেন তা-ও জানেন না। তাই পাঠকের সাথে তার একটু পরিচয় থাকার প্রয়োজন আছে। এবং সে-পরিচয় আমার কথায় না শুনে শ্রী এ. সোহেইল সিদ্দিকীর ভাষায় শুনুন ঃ

"In the year 1985-86 Prof. Tahir Mahmood came close to Rajib Gandhi and started advising him on the 'Shah Bano' controversy... Prof. Tahir Mahmood was actively involved with Milli Council till he became the chairman of minorities commission... **Secularists rewarded Tahir with the Chairmanship of Minorities**

**Commission for being anti-Hindu... Macaulites are with him for the purpose of defeating nationalist forces. By his acts he openly spreading fear amongst the Muslim minorities instead of promoting communal harmony. He is playing politics and waging war against the present government (BJP-led) at the instance of Congress party**...earlier he spread canards against Hindus and BJP in particular, on Vande Mataram, Saraswati Bandana; attacks on Christians and raid at Ali Miyan Nadvi's residence". (ORGANISER, dated 4.4.99).

(12) অতঃপর আমরা "রাজীব গান্ধী ফাউণ্ডেশনের" স্থায়ী সভানেতৃ এবং কংগ্রেসের নতুন ত্রাণকর্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল সূত্রটি যে এতো তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছেন তার জন্যে তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে মুম্বাইয়ের এক জনসভায় শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে দি ষ্ট্যাট্‌সম্যান জানাচ্ছেনঃ "Mumbai-Feb.22, –"Mrs. Sonia Gandhi to-day accused those who say India is one nation, one people and one culture of being devisive, reports PTI...This is the slogan which will destroy the nation." (The Statesman, 23.2.1998). অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে যে সব মেকি সেকুলারবাদীরা 'মিশ্র জাতীয়তাবাদ' বলে আখ্যা দেন, তাদের সাথে তিনি সহমত পোষণ করেন এবং যারা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেন তারাই দেশের সংহতি নষ্ট করছে।

(১৩) বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপবিত্র ঘোষ মহাশয় এ ব্যাপারে বলছেনঃ "মিশ্র জাতীয় সংস্কৃতি আমাদের নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের সঙ্গে বহু আগন্তুক ধারা এসে মিলেছে, যেমন গঙ্গার প্রবাহের সংগে নানা নদী ও খালের জল এসে মেলে। সে জন্যে গঙ্গাস্রোতকে মিশ্র বলা যায় না। হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত এক গঙ্গাই বহমান। ...দেশভাগ মেনে নিয়েই নেহেরু-গান্ধী পরিবার ক্ষমতায় এসেছিল। সেদিক থেকে ওই পরিবারের ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিণী হবেন সোনিয়া। সে-জন্যেই তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের বাইরে গিয়ে নিজস্ব এজেণ্ডা প্রকাশ করেছেন। প্রচারও করছেন দেশজুড়ে। **তার উদ্যোগ নতুন করে ভারত-ভাগের প্রস্তুতি কিনা তা জানতে বেশিদিন দেরি হবে না।**" (বর্তমান—২৬.২.১৯৯৮)।

(১৪) যে দেশের শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ২৫% শতাংশের বেশী হবে না, সে দেশের কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে আইন-প্রণয়নকারী সংস্থায় অর্থাৎ যথাক্রমে পার্লামেন্ট ও এসেম্ব্লিতে তাদের জন্যে ৩৩% শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উন্মাদের কাণ্ড ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তদুপরি

ব্যক্তিগতভাবে আমি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের পক্ষপাতি নই। কারণ সংরক্ষণের ফলে কখনই ভাল জিনিষটি বেরিয়ে আসে না, যা প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। যাক সে কথা। যে কথা বলবো ভেবেছি, সে কথায় ফিরে যাচ্ছি। দ্বাদশ লোকসভার শেষ অধিবেশনে যখন মহিলাদের জন্যে ৩৩% শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব এলো তখন মুলায়ম সিং যাদব ও লালুপ্রসাদ যাদবের লোকতান্ত্রিক মোর্চার সভ্যদের অসভ্য আচরণের ফলে তা পাশ করানো গেল না। তাদের দাবী, যতক্ষণ না এই ৩৩% শতাংশের মধ্যে মুসলমান মহিলাদের জন্যে আনুপাতিক হারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে তারা কোন কাজকর্ম হতে দেবেন না এবং কার্যত উপর্যুপরি তিন দিন তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পার্লামেন্টের কোন কাজ হয়নি। ফলে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলো না; যে অবস্থায় লোকসভায় পেশ হয়েছিল সে অবস্থায়ই পড়ে রইলো। কপট উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষদের মুসলমান-তোষণ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়!

Rama said to Bharat at Chitrakut on Rajdharma," ... all power Bharat, is like poison; we need the sovereign of the lord, both to exercise power and be immune from its deadly poison. In our total submission to Dharma, there's the sure promise of grace; but those that rely on power alone must perish by its poison." –Sityana by Dr. K.R.Srinivasa Iyenger. pp.166,167,168,169).

"The above advice by Rama is of eternal value for all those who exercise plitical power under any system of government. The meaning is, just as those who handle electric power should wear rubber gloves for safety, those who exercise political power must wear the hand-gloves of Dharma for being immune to the evil effects of political power."–(Justice M.Rama Jois on Rajdharma, in ORGANISER, July 14,1996).

# ফরাক্কা ব্যারেজ ও ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন চুক্তি

কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্যে ভারত সরকার ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মান করেছিলেন প্রচুর টাকা খরচ করে। শুখা মরশুমে যাতে গঙ্গার নাব্যতা বজায় থাকে এবং গঙ্গার মোহনা থেকে বানিজ্যতরী স্বচ্ছন্দে কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যারেজ নির্মানের প্রয়োজন হয়েছিল। এবং এই কাজ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনেই। তবু বাংলাদেশ বছরের পর বছর ধরে চিৎকার করে চলছিল, এতে তাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে। শুধু তাই নয়, এ-জন্যে তারা আন্তর্জাতিক দরবারে-ও নালিশ জানিয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বেশ চলছিল।

কিন্তু যেইমাত্র ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকার দিল্লীর মসনদে আসীন হলেন, অমনি বাংলাদেশ সুযোগ বুঝে আর্জি জানালো নতুন করে। যে-সব দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তাদের অনেকেরই ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মুসলমানদের, প্রতি বিশেষ দুর্বলতার কথা বাংলাদেশ সরকারের জানা ছিল। তাই তারা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিলেন। সংগে সংগে যুক্তফ্রন্ট সরকারও ভারতের মুসলমানদের সমর্থনের দিকে নজর রেখে কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাংলাদেশের আবেদনে সারা দিলেন। শুখা মরশুমে কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্যে যে-পরিমান জলের প্রয়োজন তার দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে গঙ্গার জল বাংলাদেশকে দেবার এক আত্মঘাতি চুক্তি করে বসলেন এবং তা-ও দু'চার বছরের জন্যে নয়, একেবারে ত্রিশ বছরের চুক্তি। এ-সব কিছুই সংঘটিত হয়েছিল সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসুর মধ্যস্থতায় যা ছিল একান্তই তাঁর এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ। জোতিবাবু যদি সেদিন মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ না করতেন তবে কিছুতেই ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হতো না। চুক্তি সই হবার পর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শেখ হাসিনা ওয়াজেদ দিল্লীর বঙ্গভবনে জ্যোতিবাবুর সাথে দেখা করতে যান, যা একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এভাবে অপর একটি দেশের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করা একেবারে প্রোটোকল বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের প্রতি কংগ্রেস দলের সীমাহীন এবং ন্যায়-নীতি-বর্জিত পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা বাংলাদেশের এই অন্যায় আবদার মেনে

নেননি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার জলের এই অসম ভাগা-ভাগির চুক্তি করে কলিকাতা বন্দরের উপর যে আঘাত হানলেন তাকে "পরের ধনে পোদ্দারী" বলবো, না বিশ্বাসঘাতকতা বলবো, বুঝতে পারছি না!

কলিকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই নয়, সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে প্রয়োজন। সেদিকে দৃকপাত না করে, একমাত্র মুসলিম ভোট-ব্যাংককে নিশ্চিত করার জন্যে জ্যোতিবাবুর মধ্যস্থতায় দিল্লীর যুক্তফ্রন্ট সরকার সেদিন তড়িঘড়ি করে যেভাবে বাংলাদেশের সাথে জলবন্টনের চুক্তি করলেন তা ইতিহাসে নজির-বিহীন।

সেদিন যারা এর বিরোধীতা করেছিলেন তাদের মতে, এই চুক্তি শুধু কলিকাতা বন্দরের নাব্যতাই বিঘ্নিত করবে না, সাথে সাথে হলদিয়া বন্দরও বিপদাপন্ন হবে। তখন তাদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। "নতুন-ধনী" হলে মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক তেমনি হঠাৎই যুক্তফ্রন্ট দিল্লীর মসনদে বসতে পেরে "ধরাকে সরা জ্ঞান" করলেন এবং সস্তা বাহবা কুড়ানোর জন্যে ফরাক্কা ব্যারেজের জলবন্টন নিয়ে একটি আত্মহননকারী চুক্তি করে বসলেন। ফল যা হবার তা-ই হলো। এক বছর যেতে না যেতেই গঙ্গার জল কমে যাওয়ায় কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর সংকটে পড়লো। ফলে, নতুন করে গঙ্গার মোহনায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ভাসমান জেটি তৈরী করতে হচ্ছে ভারতকে। এ-প্রসঙ্গে সম্প্রতি দু'টি খবর প্রকাশিত হয়েছে। শিরনাম সহ খবর দুটি নিম্নে তুলে দিচ্ছি ঃ

(১) "**Farakka Feeder Canal in Danger** : Calcutta, Fe, 9, – The feeder canal of the Farakka Barrage is in danger with several bank slips along unlined stretches of the 23-mile length due to a sharp fall in the water-level of the canal by aobut 7 feet, according to an official report. Those slips along stretches of the canal are said to have occured since implementation of the dry season water sharing agreement with Bangladesh in 1996-97, the report points out. Under the agreement, the discharge from the feeder canal into the Bhagirathi, on the Indian side of the barrage had to be lowered from about 35,000 cusecs to 15,000 cusecs every 10 days. The Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage had earlier warned that the water level would fall by more than 7 ft, a day if the discharge from the feeder canal was lowered from 35,000 cusecs to 15,000 cusecs in the lean season. Further lowering of discharge, the committee said, would lead to severe bank slips along the entire length of the feeder canal. This would render the entire canal completely unsafe and unstable for discharge of water in the furture, the TAC said. The water level in the feeder canal fluctuates after a cycle of every 10 days. This is because the agreement

requires that water be discharged alternately in varying quantum to either side for 10 days periods. When the Farakka Barrage was commissioned, the then Technical Advisory Committee's recommendation had permitted only six inches of lowering of the water level in the feeder canal in a day. The recommendation had been adhered to for more than 20 years till the agrement with Bangladesh was signed in December 1996. This was ensured as the feeder canal used to carry between 35,000 to 40,000 cusecs of water every day for discharge into the Bhagirathi even during the dry season through the silty sand terrain." (The Statesman, 10.2.1999).

(২) "**গঙ্গার নাব্যতা কমায় জেটি হবে মোহনায়** ঃ বিশেষ সংবাদদাতা—গঙ্গার নাব্যতা কমে যাওয়ায় আবার সংকটে পড়েছে কলিকাতা বন্দর। ...পরিস্থিতি সামাল দিতে মোহনায় একটি ভাসমান জেটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছ'মাসের মধ্যে যৌথভাবে ওই ভাসমান জেটি তৈরী করবেন কলকাতা বন্দরের কর্তৃপক্ষ, ইণ্ডিয়ান অয়েল ও শিপিং কর্পোরেশন। খরচ ধরা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। ...এবার গঙ্গার নাব্যতা এত কমে গিয়েছে যে, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে বড় ও মাঝারি জাহাজ ঢুকতে পারছে না। তাই মোহনায় ওই ভাসমান জেটি তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ...বিদেশী সংস্থাকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী করে তোলার মাধ্যমে ভূটান থেকে সংকোশ নদীর জল খাল কেটে আনার কাজে দ্রুত হাত দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।" (আ:বা:প: ২/৪/১৯৯৯)।

আমাদের বক্তব্য ঃ প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে ভাল কথা। সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকটও গঙ্গার মোহনায় ভাসমান জেটি তৈরীর খরচ বাবদ যে ২৫০ কোটি টাকা খরচ হবে তার অর্ধেক দেবার আর্জি জানানো হচ্ছে না কেন? বাংলাদেশ যদি হারাহারিভাবে জেটি তৈরীর খরচ বহন করতে রাজি না থাকে তবে বাংলাদেশের সাথে জলবন্টন চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করার অধিকার ভারতের আছে।

"The Russians were infidels and so are Indians. This is Allah's territory and we do not belong to a particular land or nation. We have to establish His rule on earth, whether it be Kashmir, Afghanistan or Bosnia." –Khan Muhammud, 35-year-old Afghan guerilla in Kashmir. (ORGANISER dated 25.7.93).

# কিছু প্রশ্ন, কিছু কথা ও কিছু ঘটনা

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে দিল্লীর মসনদে বসে মেকি সেকুলারবাদীরা (মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষরা) কীভাবে দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজকর্ম করে যাচ্ছে এবং কীভাবে সংখ্যালঘু (বিশেষ করে মুসলমান)-তোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরছি।

**(১) সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ঃ** ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রী হংসরাজ খান্নাকে (যিনি সিনিওরিটির দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন) পাশ কাটিয়ে অন্যতম বিচারপতি শ্রী মির্জা হামিদুল্লা বেগকে উক্ত কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়। এই নিয়মবহির্ভূত নিয়োগের প্রতিবাদে বিচারপতি খান্না পদত্যাগ করেন।

(২) ভারত সরকার কর্তৃক জেলা জজ মিঃ কে. এম. পাণ্ডের নিয়মমাফিক পদোন্নতি না করার জন্যে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিচারপতির অপরাধ ছিল, তিনি ১.২.৮৬ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দিরের তালা খুলে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। **এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের আইনমন্ত্রী শ্রী দীনেশ গোস্বামীর মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন ঃ রাম জন্মভূমির প্রসঙ্গ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনোভাবকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না।** (সূত্র-টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১১.৯.৯০ ইং)। এখানে আমাদের বক্তব্য ঃ বিচারপতি বিচার করে তাঁর রায় দিয়েছেন। যেহেতু সেই রায় সরকারের মনঃপুত হয়নি, তার জন্যে তাঁর পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে? যাবে, কারণ ভারত মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ (Pseudo-Secularist).

**(৩) ইংরেজী ১৯৮৬ সালের ২৮/২৯ জানুয়ারীর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে" প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে অবস্থিত প্রভু ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে ১৯৭৫ সাল থেকে প্রসাদ-বিক্রীর উপর কর বাবদ কুড়ি কেটি টাকা দিতে বলা হয়েছে।** এ খবরটি কি মোগল আমলের জিজিয়া করের কথাই মনে করিয়ে দেয় না? অনুরূপ কোন আদেশ ওয়াকফ বোর্ড, দরগা, গীর্জা কিংবা গুরুদ্বারের কর্তৃপক্ষের নিকট জারি করতে কি আয়কর বিভাগ সাহস পাবেন? (সূত্র—শ্রী পি.এন. যোশী প্রণীত সিকিউলারিজম্ ইন্ অ্যাকশন)। আমাদের উত্তর ঃ তারা সাহস করবেন না, কারণ ভারত মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

(৪) ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অগত মুসলমানদের একটি সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে, আমন্ত্রিত না হয়ে-ও, অংশ নেবার জন্য ভারত সরকার প্রয়াত ফকরুদ্দিন আলি সাহেবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। কিন্তু সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এদেরকে ফিরিয়ে দেন এই বলে যে, **যেহেতু হিন্দুস্থান মুসলিম অধ্যুষিত অর্থাৎ "দারুল ইসলাম" নয়, তাই তারা সরিয়তি মতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না, এমন কি পর্যবেক্ষকরূপেও নয়।** সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এতাদৃশ আচরণ-দ্বারা শুধু ভারত সরকারকেই অপমান করা হয়নি, প্রকারান্তরে তারা আরও একটি কথা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ "ভাইসব, যত তাড়াতাড়ি পার দেশটাকে দারুল ইসলামে পরিণত কর এবং প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন কর। নতুবা প্রতিনিধিত্ব করতে এসো না।" এ অপমান ভারত সরকার স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছিল একমাত্র মুসলমানদের খুশী করার জন্যে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। **পক্ষান্তরে, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ইউরোপে বসবাসকারী হিন্দুদের দ্বিতীয় সম্মেলন যখন ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারত সরকারের তরফ থেকে কোনরূপ সহযোগিতা করা দূরের কথা সে সম্মেলনের বিরোধিতা করার জন্যে ডেনমার্কে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসকে নির্দেশ দেয়া হয়।**

(৫) আর. এস. এস.-এর প্রধান শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ১৯৬৫ সালের মকরসংক্রান্তিতে কানপুরে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবে যোগদানের সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে আসার অনুমতি দেয়নি। ভারত সরকার অনিমন্ত্রিত হয়ে মুসলমান প্রতিনিধি পাঠিয়ে গণ্ডে চপেটাঘাত নিয়ে রাবাত থেকে ফিরে আসতে এতটুকু অপমানিতবোধ করে না, কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিকে (হোন না তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধান, হিন্দু তো বটেন) দেশে আসার অনুমতি দিতে রাজি নয়। কারণ, ভারত মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

(৬) প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেই শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং দিল্লীর জামা মসজিদের ইমামকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন অনুদান হিসেবে। কিন্তু অনুরূপ অনুদান কোন হিন্দু প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ, তিনি ও তার সরকার যে মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

**(৭) মুসলমানদের জন্যে ১৫ দফা কর্মসূচী ঃ** ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলমানদের জন্যে ১৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা সি. আর. পি. এফ., পি. এ. সি., প্রাদেশিক পুলিশ, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে ও সর্বপ্রকার সরকারী উদ্যোগে কর্মী নিয়োগের সময় বিশেষ সুবিধা-ভোগের অধিকারী। শুধু তাই নয়, কর্মনিয়োগ বোর্ডেও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে লোক নিতে হবে। এসব কাজ ঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার জন্যে "সামাজিক মঙ্গল মন্ত্রণালয়ে" (Ministry of Social Welfare) সংখ্যালঘু সেল (Minority

Cell) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই ১৫-দফা কর্মসূচী বাদে সংখ্যালঘুদের আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া যায় তার জন্যে "গৃহ মন্ত্রণালয়ে" (Ministry of Home Affairs) আরও একটি সেল গঠিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের কারিগরি বিদ্যাদানের জন্যে দশটি পলিটেকনিক (Polytechnic) স্থাপিত হয়েছে। এসব স্কুলে হিন্দুর দরিদ্রতম ছেলেটিরও প্রবেশাধিকার নেই। এতদতিরিক্ত, মুসলমান ছাত্ররা যাতে প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) পরীক্ষাগুলিতে ভাল ফল করতে পারে তার জন্যে বিশেষ শিক্ষাদানের (Special Coaching) ব্যবস্থা করা হয়েছে। (সূত্র-শ্রী পি.এন.যোশী প্রণীত সিকিউলারিজম ইন এ্যাক্শন)।

(৮) **উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে চল্লিশটি জেলা চিহ্নিত ঃ** মুসলমানদের তোষণ করতে যেয়ে ভারত সরকার দেশের চল্লিশটি জেলাকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের পরিষেবার জন্যে এই চল্লিশটি জেলার প্রতিটিতে একটি করে ব্যাঙ্ককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের ঋণদান এবং ব্যাঙ্কে নিয়োগের ব্যাপারে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রতিটি ব্যাঙ্কে একজন করে বিশেষ কর্মকর্তাও (Special Officer) নিযুক্ত করা হয়েছে। যে সব জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হলো ঃ উত্তরপ্রদেশে তেরোটি, পশ্চিম বাংলায় আটটি, কেরালায় পাঁচটি, বিহার ও কর্ণাটকে তিনটি করে, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি করে এবং হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে একটি করে। এ-কাজ করে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ যে ৪০টি মিনি পাকিস্তানের গোড়াপত্তন করলেন, তা কি তারা ভেবে দেখেছেন? (সূত্র—ঐ)। নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন। তবে সে-ভাবনা ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকদের জন্যে নয়, শুধু মুসলমানদের জন্যে। কারণ তাদের পদলেহন না করলে তারা যে মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার পথ থেকে চ্যুত হবেন, হোক না তাতে নতুন করে হাজারো মিনি-পাকিস্তানের সূচনা!

(৯) মসজিদের ইমামদের মাসোহারা কেন্দ্রের অর্থভাণ্ডার থেকে দেওয়া যাবে; কিন্তু হিন্দু পুরোহিতদের তদ্রূপ কোন ভাতা দেওয়া যাবে না। কারণ, ভারত মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

(১০) হিন্দুস্থানের সরকারী দপ্তরে কর্মরত কোন হিন্দু যদি ঘটনাচক্রেও দুটি বিয়ে করেন তবে তার চাকুরী (Service) যাবে; কিন্তু একই চাকুরিতে থেকে কোন মুসলমান যদি চারটি বিয়েও করেন তবে তার চাকুরী যাবে না। কারণ, ভারত-সরকারের মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার মহিমা অপার!

(১১) হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তানের আই. এস. আই (ISI) সংস্থা দিনের পর দিন নানাপ্রকার নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু আই. এস. আই-এর সহযোগিদের টাডা আইনে (TADA) গ্রেপ্তার করা যাবে না। শুধু কি তাই, যেহেতু এই নাশকতামূলক

কাজকর্মের সাথে যুক্ত বেশীর ভাগ অপরাধীই মুসলমান, তাই তাদের দাবী মেনে টাডা আইনকেই তুলে দেওয়া হলো। এর কারণও সেই একই, আমরা মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

(১২) যে কোন তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে হিন্দুস্থানের আড্ভানী, সিংগল কিংবা যোশীদের কারারুদ্ধ করা এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করা অত্যন্ত সহজ কাজ; কিন্তু আইনভঙ্গকারী ও আদালত-অবমাননাকারী মুসলমানদের গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, কেশাগ্রটি পর্যন্ত স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কারণ, ভারত মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ!

(১৩) ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উত্তরপ্রদেশ বিধান সভার বিরোধী দল-নেতা একটি ছবি প্রকাশ করেন। তাতে দেশের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় রাজীব গান্ধীর পাশেই একজন হিরোইন চোরা-চালানকারীকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। (সূত্র-হিন্দুস্থান টাইম্স্ ৬.৫.৮৯)।

(১৪) **ভি.পি. ও চোরাচালানকারী একই মঞ্চে ঃ** ১৯৯০ সালের মে মাসে মুম্বাইয়ের একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা "কারেন্ট" (Current) তাদের ৪০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে মঞ্চ তৈরী করেছিলেন তাতে প্রধানমন্ত্রী ও কুখ্যাত চোরাচালানকারী হাজী মস্তান একই সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। (সূত্র-নবভারত টাইম্স্ ২৫.৫.৯০ ইং)।

**(১৫) সমাজ-বিরোধীরাও কংগ্রেস ও জনতা দলের নেতা ঃ** ১৯৯০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের এক তৃতীয়াংশেরই সমাজে সুনাম ছিল না। জনতাদলের অর্ধেকই ছিল সন্দেহজনক চরিত্রের প্রার্থী। জনতা দলের তালিকায় সামাজিক অপরাধীর প্রাধান্য ছিল; আর কংগ্রেস তালিকায় ছিল অর্থনৈতিক অপরাধীর প্রাধান্য। (সূত্র-নবভারত টাইম্স্ ৭.২.৯০ ইং)।

(১৬) উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে শ্রী মোলায়েম সিং যাদব এক সভায় গর্বভরে বলেছেন, এখনো তার বিরুদ্ধে তিন ডজনের উপর ফৌজদারী মামলা (Criminal case) উত্তরপ্রদেশের আদালতে ঝুলছে। (সূত্র-নবভারত টাইম্স্, ৭.১০.৯০ ইং)।

(১৭) খবরে প্রকাশ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালুপ্রসাদ যাদব বিহারে ৭২টির মতো ফৌজদারী মামলার সাথে জড়িত ছিলেন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ দল থেকে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে হলে তাকে একজন পাকা দুর্বৃত্ত (hardened criminal) হতে হবে। (সূত্র-শ্রী পি.এন. যোশী প্রণীত সিকিউলারিজম ইন এ্যাকশন)।

(১৮) হাজি মস্তান একজন কুখ্যাত চোরাচালানকারী। সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদ লোকসভার উপনির্বাচনে এই ব্যক্তি শ্রী ভি.পি. সিং-কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তারই স্বীকৃত স্বরূপ শ্রী সিং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক চিঠি দেন। সেই চিঠি কলকাতার "দি টেলিগ্রাফ" এবং মুম্বাইয়ের 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্‌লি"তে প্রকাশিত হয়। (সূত্র-নবভারত টাইম্স্ ১৬.১০.৯০ ইং)।

(১৯) আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী শ্লোগান ছড়িয়ে আছে। তারই একটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"হস্‌কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেংগে হিন্দুস্থান,
ভাইকে দেঙ্গে খালিস্তান; জব আয়েগা আলি আলি,
ভাগ উঠেংগে বজরংবলী; উঠা শমশীর-এ-মুসলমান,
তুঝে অব কিস্‌কা ইন্তেজার হৈ; প্রিপেয়ার ফর জেহাদ,
বক্ত কী হে য়হী আওয়াজ, উঠায়ো বাবর কী তলবার।"

অর্থাৎ "হাসতে হাসতে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছি। এবার লড়াই করে হিন্দুস্থান নেবো; আর ভাইকে দেবো খালিস্তান। যেইমাত্র আলির অনুগামীরা আক্রমণ হানবে, তখন বজরংবলীরা পালিয়ে কুল পাবে না। জেহাদের (Holy War) জন্যে তৈরী হও, এবং বাবরের তলোয়ার হাতে তুলে নাও। এই হলো আজকের জিগির"। (সূত্র-ডঃ কৈলাসচন্দ্র, সংকট মোচন আশ্রম, সেকটার ৬, রামকৃষ্ণপুরম, নিউদিল্লী। "জনসত্ত্ব"-২৭.৬.৯০ ইং)। এভাবে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চালানোর জন্যেই কি সরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে? এই কি ভারত সরকারের উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা? জাতির প্রতি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেশবাসী আর কতদিন সহ্য করবে?

(২০) বেশ কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী বেশ গর্বভরে বলেছেন, সর্বপ্রথমে তিনি একজন মুসলমান, পরে ভারতীয়। অদ্যাবধি তথাকথিত কোন উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হননি। কারণ, অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার নামে মুসলিম-তোষণ। এ সব "ট্রোজান হর্সকে" দেশবাসী আর কতকাল দুধ-কলা দিয়ে পুষবে?

(২১) গত ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী কে. আর. নারায়নন কেরলের এক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় বলেছেন ঃ ভারতের আদি শংকরাচার্য পয়গম্বর হজরত মহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলাম থেকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সৌভ্রাত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সেদিনের খবরের কাগজে এ কথা ক'টি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে ঃ হায় হিন্দুস্থান! তোমার অমানিশা-রজনী প্রভাত হতে আরও বিলম্ব আছে। নতুবা, তোমার দু'নম্বর সন্তানের মুখ থেকে এরূপ প্রলাপ বাক্য বেরুবে কেন?

(২২) কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার পরই একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সি.পি.আই-এর বর্ষীয়ান নেতা শ্রী ইন্দ্রজিত গুপ্ত মহাশয় বলেন ঃ পূর্ববঙ্গ থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করছেন তাদেরকে আমি বিদেশী বলে মনে করি না। তারাও বাঙ্গালী, আমরাও বাঙ্গালী। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবার সাথে সাথেই মন্ত্রীমহোদয় তার পার্টির বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী ছড়িয়ে দেবার এমন সুযোগ যে হাতছাড়া করেন নি তার জন্যে পার্টি কমরেডরা তাকে

সাধুবাদ জানাবেন কিনা জানি না, তবে সাধারণভাবে হিন্দুস্থানের নাগরিকদের এহেন উদারপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে; নতুবা সময়কালে কোনো তাবিজ-কবচেই কুলোবে না।

(২৩) এখন আমরা উত্তরপ্রদেশের সেই কৃতী সন্তান (যার গুণগ্রাম আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি) সমাজবাদী পার্টির সভাপতি এবং তদানিন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী মোলায়েম সিং যাদবের আরও কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো।

(ক) ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ **দেশের সব হিন্দুই বিশ্বাসঘাতক; আর সব মুসলমানই দেশপ্রেমিক।** (দি ষ্ট্যাটস্‌ম্যান-১৫.১.৯২ ইং। 'বর্তমান' পত্রিকার শ্রী পবিত্রকুমার ঘোষের 'কলম' ৩০.৫.৯৬ ইং দ্রষ্টব্য)। অপর দুটি বক্তব্য সাম্প্রতিক কালের। একটু পরেই আমরা সে-কথায় যাবো। ইতিমধ্যে, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। বহুগুণের অধিকারী এই মানুষটির উপর যারা দেশের প্রতিরক্ষার ভার দিয়েছেন অচিরেই তারা যে তাদের ভুল বুঝতে পারবেন এমন নয়, এর ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দুস্থানকে বহু খেসারতও দিতে হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা যে অলীক এবং স্রেফ কল্পনা-প্রসূত নয় তা নিম্নের উদ্ধৃতি দু'টি থেকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। এত তাড়াতাড়ি যে বিষবৃক্ষের ফল ফলতে আরম্ভ করবে তা আমাদেরও ধারণার বাইরে ছিল।

(খ) একটি খবরে প্রকাশ, যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী এইচ. ডি. দেবেগৌড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী যাদবজীকে তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত বক্তব্যের জন্য তিরস্কার করেছেন। বক্তব্যটি ছিল কাশ্মীরকে নিয়ে। জুন মাসে যখন যাদবজী কাশ্মীর সফরে যান তখন তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বলেন ঃ উগ্রপন্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষ করেই জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং সেই মর্মে লোকসভায় একটি বিলও আনা হবে। (সূত্র-দি ষ্ট্যাট্‌সম্যান, ২৭.৬.৯৬ ইং)।

(গ) সম্প্রতি লণ্ডনে প্রদত্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী যাদবজীর বক্তৃতার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ **"যদিও ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্যে সমান অধিকার স্বীকৃত, তথাপি মুসলমান, খ্রীষ্টান ও শিখরা তাদের সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত। নিঃসন্দেহে বলা চলে, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা, যারা একদিন এই দেশের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ খুব মনস্তাপের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ভারতের মানমর্যাদা এবং সীমান্ত রক্ষা করতে যেয়ে সকলের চেয়ে মুসলমানরাই বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে।**

**"টাডা (TADA) আইন কেবলমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদের বিরুদ্ধে হচ্ছে না কেন?**

**"প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে এটাই আমার প্রথম বিদেশ সফর। এদেশ**

**(লণ্ডন) ত্যাগ করার পূর্বে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আমি আশ্বাস দিতে চাই এই বলে, যতদিন সমাজবাদী পার্টি থাকবে ততদিন তাদের গায় এতটুকু আচড়ও কেউ দিতে পারবে না।"** (সূত্র-সাপ্তাহিক 'অর্গেনাইজার', ৬ই অক্টোবর, ১৯৯৬ ইং)।

আশা করি, উদ্ধৃত বিবরণ ও বক্তব্য থেকে পাঠক মহোদয় বুঝতে পারছেন, তথাকথিত উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষদের আসল উদ্দেশ্য কী। তাদের প্রতিটি কথায়, কাজে এবং মননের ভেতর একটি কথাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে, তা হলো সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম-তোষণ। তাদের বিশ্বাস, মুসলমানদের খুশী রাখতে পারলেই অর্থাৎ তাদের সর্বপ্রকার দাবী (হোক না তা ন্যায়-নীতি বহির্ভূত এবং দেশ ও জাতি-স্বার্থ-পরিপন্থী) মেনে নিলেই তাদের গদি ঠিক থাকবে। আর হিন্দুর ভোট? এ ব্যাপারেও তাদের পরিকল্পনা অত্যন্ত নিখুঁত। হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের প্রশ্ন তুলে এবং ভেদ-নীতির আশ্রয় নিয়ে চিরদিন মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষরা তাদের কাজ হাসিল করতে পারবেন। কিন্তু তাদের সে আশায় ছাই পড়লো ১৯৯৬ ও ১৯৯৮-এর লোকসভার নির্বাচনে। **জাগ্রত হিন্দুসমাজ প্রমাণ করে দিলো, তাদের বাদ দিয়ে দিল্লীর মসনদে বসা যায় না। তবে হ্যাঁ, মীরজাফরের ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করে দু'চার দিনের জন্য মসনদে বসা যায় ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চিরদিন তারা দেশদ্রোহী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে।**

এবার আমাদের আরও কিছু কথা বলতে হবে। এতো শীঘ্র ধৈর্য হারালে চলবে না। আপনাদের জন্যে আরও কিছু উপহার সংগ্রহ করেছি।

(২৪) "মণ্ডল কমিশন"-কে কবর থেকে তুলে নিয়ে জাতপাতের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে বিভাজনের পথে ঠেলে দিলেন (১৯৯০) তদানিন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। আর যারা তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতাকে বাঁচাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকেই আখ্যায়িত করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে। দেশদ্রোহীদের চিনে নেবার সময় কি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরও আসেনি?

(২৫) ৬ই ডিসেম্বর তারিখটিকে ভারতবর্ষের 'চেতনা-দিবস' রূপে প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদায় পালন করা উচিত। কারণ, ১৯৯২-র ঐ দিনটি দিয়েই ভারতবর্ষের নবজাগরণ শুরু হয়েছিল এবং যথাসময় রামমন্দিরও রামের জন্মস্থান অযোধ্যাতেই নির্মিত হবে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, প্রতিটি জাতিরই উত্থান এবং পতন আছে। পতনের দিনে বাধ্য হয়ে তাকে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে হয়। আবার উত্থানের দিনে তারা তাদের সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেলে। এই তো ইতিহাস। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ব্যতীক্রম হবে কেন?

(২৬) "সম্প্রীতির পূজোয় কর্তা জার্জিস-শেখ নুর, দেবেন অঞ্জলিও"- এই শিরনামে আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের ২.১০.৯৭ তারিখের সংস্করণে খুব ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর ছেপেছেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, "বর্ধমান জেলার শক্তিগড় অঞ্চলের উত্তর বাজার গ্রামের

দুর্গাপূজায় এবার মুসুলমানরা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পূজা কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দুই মুসলমান। এবার পূজোয় তারা অঞ্জলিও দেবেন।'' আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট খবরটি বিশেষ আনন্দের কারণ হতে পারে, কেননা তারা ''আগমার্কা মেকি সেকুলারবাদী'' এবং মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষদের ধ্বজাধারী। **কিন্তু আমরা এ খবরটি ''হিন্দুর আত্ম-মর্যাদার উপর বিশেষ আঘাত হেনেছে'' বলেই মনে করি।** সংবাদটির অপর অংশে প্রকাশিত হয়েছে, ''নিয়মিত নামাজপড়া বাহান্ন বছরের শেখ নুর মহম্মদ জানালেন, ''আমাদের পাড়ার মুরুব্বিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' আমরা পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট এ অংশটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বলছি, তারা (মুসলমানরা) সব জেনে বুঝেই 'কাফেরদের' পূজার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করেছেন, কোনপ্রকার সম্প্রীতির কারণে নয়। কারণ তারা দেবদেবী বিশ্বাস করে না। একথাটি পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু তারা বুঝেও বুঝেন নি। **তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ কোন খবর ছাপা না হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। এ-মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলার বা করার সুযোগ নেই।**

(২৭) কলিকাতার হকার উচ্ছেদের ব্যাপারেও হিন্দু-মুসলমানদের জন্যে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে কলিকাতা কর্পোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজাবাজার, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি অঞ্চলের হকারদের (যারা প্রধানত মুসলমান) উচ্ছেদ করা হয়নি, করা হয়েছে হাতিবাগান, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের হকারদের, যারা প্রধানত হিন্দু। একাজ করা হল কোন যুক্তি বলে?

(২৮) ভারতে প্রথম গীর্জা এবং প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেরালায়। তখন সেখানে রাজত্ব করতেন হিন্দু রাজা। হিন্দুরা যদি অসহিষ্ণু হতেন তবে সেখানে কখনই গীর্জা বা মসজিদ স্থাপন করা সম্ভব হত না। হিন্দুরা সব সময় বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আপনজন বলে মনে করে, কারুর প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। **''বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়, আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'', অতি সংক্ষেপে এই হল হিন্দুর হিন্দুত্ব।**

(২৯) মুসলমান ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে নীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েরই সংগ্রামের হাতিয়ার ''ঘৃণা''। ঘৃণাকে মূলধন করেই তাদের জয়-যাত্রা। কমিউনিষ্টরা পৃথিবীর মানুষকে প্রলিতারিয়েট ও বুর্জুয়া শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, আর মুসলমানরা ভাগ করেছেন বিশ্বাসী ও কাফের নামক দু'শ্রেণীতে। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক—পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগ্যপণ্যের অধিকারী হওয়া এবং সে-অধিকার করায়ত্ব করার জন্যে বল প্রয়োগ করা; কোনরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, যদিও মুখে তারা অহরহ গণতন্ত্রের কথা বলেন।

(৩০) মেকি সেকুলারবাদীরা যখন মুসলমান ও খৃষ্টানদের কোন উপাসনা-পুস্তক বা কোন অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন তখন তারা পবিত্র কোরান শরিফ, পবিত্র বাইবেল কিংবা পবিত্র ঈদ, পবিত্র মহরম, পবিত্র ক্রিষ্টমাস এইভাবে

উল্লেখ করেন; পক্ষান্তরে হিন্দুদের কোন উপাসনা-পুস্তক কিংবা অনুষ্ঠানের কথা যখন উল্লেখ করেন, তখন তারা সে-সব উপাসনা-পুস্তক বা অনুষ্ঠানের পূর্বে "পবিত্র" শব্দটি কখনই উচ্চারণ বা ব্যবহার করেন না। কী অদ্ভুত মানসিকতা! কী অধঃপতন!

(৩১) দেশটা ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। সে ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়ে মেকি সেকুলারবাদীরা দেশবাসীকে গত ৫০ বৎসর ধরে বিভ্রান্ত করেছেন। আর একদিনও যাতে না করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে যেয়ে যে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার তা করতে হবে।

(৩২) নিজেদের পিতৃপরিচয়, বংশ-পরিচয় দেয়া কিংবা কৃষ্টি ও সভ্যতার কথা বলার নামই কি সাম্প্রদায়িকতা? আর সে-সব পরিচয় গোপন রেখে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মোসাহেবী করার নামই কি সেকুলারবাদ (Secularism)?

(৩৩) **ভারতবর্ষ চিরদিনই ধর্মের পক্ষে। যেদিন ভারতবাসী ধর্মকে ত্যাগ করবে বা তার প্রতি উদাসীনতা ও দ্রোহ প্রদর্শন করবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে।** আর যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা জোর গলায় উচ্চারণ করছেন তারা এর প্রকৃত অর্থ জানেন না। তাদের অবগতির জন্যে বলছি ঃ ইংরেজী সেকুলারবাদের (Secularism) বাংলা প্রতিশব্দ কখনই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়—উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতা অথবা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উপাসনা-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু ধর্ম কখনই ভিন্ন হতে পারে না। বিশেষভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা বেশ ভালভাবে মনে রাখতে হবে, উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্ম এক জিনিষ নয়। ধর্ম এক, অদ্বিতীয় এবং অবিভাজ্য; পক্ষান্তরে উপাসনা-পদ্ধতি বহু এবং খণ্ড খণ্ড। ধর্ম কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়—এ সম্পদ সমস্ত মানবজাতির।

(৩৪) **"সব ধর্মের মূল কথা এক" একথা যারা বলেন তারা গোড়াতেই ভুল করেন। কারণ ধর্ম অনেক নহে, ধর্ম একটাই; তবে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উপাসনা-পদ্ধতি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। এইসব উপাসনা-পদ্ধতি ধর্ম নহে, কিছু আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র।**

(৩৫) বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক হিন্দু মন্দিরের পরিচালনার ভার গ্রহণ অথবা প্রনামী অর্থের উপর শুল্ক ধার্য করা অবাধে চলছে। পক্ষান্তরে, একই কারণে কিংবা বেনিয়মের কারণেও 'ওয়াকফ সম্পত্তি' অধিগ্রহণ কিংবা তাদের উপর কোন আইনসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এরূপ বৈষমামূলক আচরণ কেন করা হচ্ছে? তারা কি দেশের আইনের ঊর্ধ্বে?

(৩৬) শিল্পের নামে মুম্বাইয়ের তথাকথিত নামকরা শিল্পী এম. এফ. হুসেন-এর হিন্দুর দেবদেবীর অবমাননা এবং একশ্রেণী বিকৃত-রুচির হিন্দুর (তাকে) সমর্থন হিন্দুস্থানের হিন্দুরা আর কতদিন সহ্য করবে?

(৩৭) **আজ ভারতবর্ষের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মোক্ষলাভের লোভটা**

**আপাতত শিকেয় তুলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের বাস্তববাদী হয়ে আত্মরক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নতুবা ইহকাল পরকাল, দুই-ই যাবে।**

(৩৮) Each and every paisa of foreign money that gets entry into the country in the name of social service, expansion of education, feeding the destitutes and disabled and in many other names must be accounted for most rigidly. If they are very much disturbed with these distressed people of India, let them take away these distressed people to their respective countries and bring them up according to their own design, but not in this country.

(৩৯) **সৌদি আরবে অন্য কোন উপাসনা-পদ্ধতির লোকের মন্দির বা প্রার্থনাগৃহ নির্মান নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, অমুসলমানদের সেদেশে বসবাস করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। ভারতেই-বা অনুরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না কেন?**

(৪০) যে পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে বহুবার ভারত আক্রমণ করেছে এবং অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ও আই. এস. আই-এর দ্বারা ভারতের সর্বস্তরে সবসময় নাশকতামূলক কার্য চালিয়ে যাচ্ছে তাকে ২০০০ কোটি টাকা অনুদান দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের একজন মুসলমান-দরদী হিন্দু নেতা। কারণ, আণবিক বোমা ফাটাবার জন্যে বিশ্বের বহুদেশ অর্থনৈতিকভাবে সে-দেশকে বয়কট করেছে যার ফলে পাকিস্তান অর্থকষ্টে পড়েছে। কয়েক গণ্ডা মুসলমান ভোটের জন্যে যিনি এই প্রস্তাব দিয়েছেন তার নাম মহামান্য মৌলানা মোলায়েম সিং যাদব।

(৪১) **দেশ-ভাগের পরও ভারতের মাদ্রাসা ও মকতবে শিক্ষা দেওয়া হয় ঃ " মুসলমানরা রাজার জাত। নতুন করে তাদের আবার ভারত-জয় করতে হবে"। আর সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করে চলেছে রাজ্য বা কেন্দ্রের সরকার।** পক্ষান্তরে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কৃষ্টি ও সভ্যতা পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রচার বা প্রসারের কিছুই করা হয় না। এর পরও দেশবাসী একই শাসকগোষ্ঠীকে বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত করে আসছে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ আর কতকাল উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত হয়ে থাকবে?

(৪২) একটা বিষয় লক্ষণীয়, ভারতের মুসলমানরা তাদের কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময় সর্বদা এবং সতত আরবী শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার করেন—নিজেদের স্বাতন্ত্র্য (Identity) বজায় রাখার জন্যে। পক্ষান্তরে ভারতের হিন্দুরা, পাছে তারা সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট হয়, এই ভয়ে সংস্কৃত শব্দ সযত্নে পরিহার করেন। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে!

(৪৩) বিগত ৫০ বৎসর ধরে কংগ্রেস তো বটেই ১৯৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার দিল্লীর মসনদে বসলো তখন সংস্কৃত ভাষার উন্নতির কথা মুখেও আনলো না; পরন্তু, দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে একটি উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলো। জয় হোক মেকি সেকুলারবাদের।

(৪৪) মেকি সেকুলারবাদের (উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার) নামে মুসলমান-তোষণ আর কতদিন চলবে? একটি উদাহরণ দিচ্ছি। **প্রতিবছর হজ যাত্রীদের পেছনে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে তা কাদের টাকা? উত্তর ঃ হিন্দুদের থেকে ট্যাক্স বাবদ যে টাকা আদায় হয় সে টাকা থেকে হজ যাত্রীদের অনুদান দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, গঙ্গাসাগর যাত্রীদের থেকে উল্টো তীর্থকর আদায় করা হয়। এর চেয়ে জাতির দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!**

(৪৫) সৈয়দ সাহাবুদ্দিন সাহেব তার পত্রিকার নাম রেখেছেন "Muslim India" আমাদের প্রশ্ন ঃ "Indian Muslim" নয় কেন? তিনি কি মনে করেন, ইতিমধ্যেই ভারত দার-উল ইসলামে (Islamised) পরিণত হয়েছে? সৈয়দ সাহেবকে অত্যন্ত বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তার বা তাদের মত যারা আছেন তাদের দিবাস্বপ্ন অচিরেই ভঙ্গ হবে।

(৪৬) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে শতকরা কতজন সংখ্যালঘু মানুষ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন বা হন? উচ্চাসনেই বা আছেন শতকরা কয়জন? পক্ষান্তরে, ভারতের দিকে দৃষ্টি ফেরান, দেখবেন রাষ্ট্রের সর্বস্তরে (দেশের সর্বোচ্চ আসন সহ) কতজন সংখ্যালঘু নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষের মেকি সেকুলারবাদীরা আর কতদূর আত্মহননের পথে এগিয়ে যাবেন?

(৪৭) ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে মেকি সেকুলারবাদীরা নানাবিধ শ্লেষাত্মক আখ্যায় ভূষিত করে চলেছেন, যেমন সঙ্ঘপরিবার, নিকারওয়ালা, সাফ্রান ব্রিগেড, লোটাস ব্রিগেড ইত্যাদি। তারা হয়ত জানেন না, জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান যখন প্রথম আক্রমণ করেছিল তখন আক্রমণকারীদের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্যে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর. এস. এসের স্বয়ংসেবকরা। তখনও জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর দান করেন নি। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের যেখানেই যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে এবং দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয় সেখানেও, সরকারী সাহায্য আসার পূর্বেই, পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে এই সঙ্ঘ-পরিবারের স্বয়ংসেবকরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। সেখানে তারা কোন জাতপাত কিংবা হিন্দু-মুসলমান বিবেচনা না করেই সবার জন্যে সহায়তা ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বিগত ৫০ বছরের খবরের কাগজগুলির পাতা উল্টালেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

(৪৮) ৬ই মে ১৯৯৯ ইং তারিখের টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়ায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। শব্দ-দূষণ আইন ভঙ্গ করে মসজিদের দুই ইমাম মাইক্রোফোন ব্যবহার করায় কলিকাতা পুলিশ আইন মোতাবেক তাদেরকে নগর-আদালতে সোপর্দ করেছিল। গত বুধবার মহামান্য আদালত পুলিশের আর্জি বাতিল করে দিয়েছেন। খবরটি বিনা মন্তব্যে হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ

"Calcutta : A City Court on Wednesday discharged two imams against whom police brought charges of making azaan calls from

mosques over microphones in violation of the High Court order (PTI)." এ-প্রসঙ্গে দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। একটি শব্দদূষণ আইন অমান্য করার দায়ে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি কোর্টের বৈষম্যমূলক আদেশ, অপরটি সর্বশ্রী ইদ্রিশ্ আলি ও কলিমুদ্দীন সামস্-এর মুসলমানদের প্রতি প্রকাশ্য জনসভায় (৭ই জুলাই ১৯৯৮) কোর্টের বিরুদ্ধে "জেহাদের" আহ্বান।

(a) "Calcutta, Dec. 9, -The Environment Bench of the Calcutta High Court comprising Justice G.R. Bhattacharya and Justice Nure Alam Choudhury, today fined 10 Durga Puja Committees and one Kali Puja committee of Calcutta Rs. 1000 each for violation of the Court's sound control order by the use of loudspeakers." (The Statesman, 10.12.98).

(b) "নিজস্ব সংবাদ-দাতা ঃ আজান মামলায় ৮ জন ইমাম এবং তাঁদের কৌঁসুলিকে কলিকাতা হাইকোর্ট আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করল। আগামী ৫ই আগষ্ট তাঁদের আদালতে হাজির হয়ে জানাতে হবে, কারাদণ্ড অথবা অন্য কী শাস্তি তাঁরা পেতে চান। শুক্রবারেও ইমামেরা আদালতে হাজির হননি। এই নিয়ে উপর্যুপরি চারদিন তাঁরা আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও হাইকোর্টের পরিবেশ বেঞ্চে এলেন না।" (আ: বা: প: ১৮/৭/৯৮ ইং)।

**প্রথম অপরাধীদের বেলায় কোর্ট সরাসরি শাস্তির আদেশ দিলেন, দ্বিতীয় অপরাধীদের বেলায় কোর্ট আসামীকে কোর্টে হাজির হয়ে 'তারা কী শাস্তি নেবেন' তার অপেক্ষায় রইলেন। এ বৈষম্য দুই আসামীপক্ষ দুই উপাসনা-পদ্ধতির লোক বলেই কি করা হলো?**

দ্বিতীয় ঘটনা সর্বশ্রী ইদ্রিশ আলী ও কলিমুদ্দিন সামস্-কে নিয়ে। প্রথম জন প: ব: কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক ও কলিকাতা হাইকোর্টের একজন কৌসুলি; দ্বিতীয়জন পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন প্রতাপশালী লোক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী। এঁরা দু'জনেই আজানের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করছেন বলে কলিকাতা হাইকোর্টের শব্দদূষণ বেঞ্চকে দায়ী করেছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসভায় "জেহাদের" ডাক দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সরকার বা কোর্ট কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

(৪৯) "Protesting against the Calcutta High Court's order restricting the use of loudspeakers for azaan, nearly 10,000 demonstrators from different parts of the City converged at Esplanade. They were also protesting against "anti-Islamic" move of granting a visa to 'the enemy of Islam', Salman Rushdie, and what is perceived as the Union Government's bid to make the education system 'Pro-Hindu' by introducing 'Vande Mataram' in primary schools". (The Times of India, Feb, 23, 1999).

(৫০) প্রাসঙ্গিক বিধায়, দি স্ট্যাটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়-র অংশবিশেষ নিম্নে তুলে দিচ্ছি। "For anyone to suggest that

religious observances are being interfered with is to be deliberately and maliciously wrong. As an officer of the Court Mr. Ali had no business attending a meeting on the maidan where he joined other speakers in calling for a jihad against the court orders. **This is the grossest of gross contempt and having given him an opportunity to reply to the rule issued, their Lordships will be justified in making an example of him when the Court hears the matter again on 5 August..... No further examples are needed to say that the time has come to treat all citizens equally. Without a doubt the requirement of community or caste or creed on official documents must be abolished; being a citizen of India is distinction enough."** (The Statesman 19 July, 1998).

(৫০ক) সৈয়দ সাহাবুদ্দীন সাহেব সম্প্রতি বলেছেন ঃ ভারতবর্ষ দার-উল হারাব কিংবা দার-উল ইসলাম কোনটিই নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হলো শান্তির দেশ। তাই যদি হবে তবে বেশীর ভাগ মুসলমানই পাকিস্তানের দাবী তুলেছিলেন কেন? শান্তির দেশকে তারা অশান্তিতে পরিণত করলেন কেন?

(৫০খ) **"Though addressed to the British 'Quit India' movement was meant more to impress Indian ears to steal thunder from Netaji's Anti-raj appeal and save the Congress.... "(Mr. V.P. Bhatia in the weekly ORGANISER dated 28.8.93).**

(৫০গ) সম্প্রতি একটি কথা উঠেছে, চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমার পাকিস্তানী কিনা। কারণ, সে পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মোরারজী দেশাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছিল, কেন তিনি পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিলীপকুমার পাকিস্তানী কিনা কিংবা মোরারজীভাই সেদেশের জন্যে কোন ভাল কাজ করেছিলেন কিনা তার প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। সুতরাং সে-ব্যাপারে কোন কথা বলবো না; তবে একটি কথা অবশ্যই বলবো ঃ পাকিস্তান বিনা কারণে কাউকে কোন দান বা সম্মানে ভূষিত করে না।

(৫১) **কাশ্মীরকে পৃথিবীর ভূস্বর্গ বলা হয়। সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর (পৃথিবীর জান্নাত) যতদিন না পাকিস্তানের অধিকারে যাচ্ছে ততদিন সেদেশের সাথে ভারতের স্থায়ী মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হবে না। "রোজ কেয়ামতের" (Day of Reckoning) পূর্বেই যখন "জান্নাতের স্বাদ" পাবার সুযোগ আছে, সে-সুযোগ বিশ্বাসীরা (মুসলমানেরা) কখনই হাত-ছাড়া করবেন না।**

(৫২) খণ্ডিত ভারতে প্রতিদিন একটি করে সংস্কৃত টোল উঠে যাচ্ছে; পক্ষান্তরে, একটি করে মাদ্রাসা বা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং তা হচ্ছে সরকারী অনুদানে। বর্তমান ভারতবর্ষে এরূপ মক্তব-মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের উপর।

(৫৩) আবার আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে মেকি সেকুলারবাদী কংগ্রেস ও বেশ কিছু দল। সেবার তৃতীয় পক্ষ ইংরাজ ছিল। এবার কোন তৃতীয় পক্ষ নেই। তাই সাবধান বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন বোধ করছি। সংরক্ষণ, কোটা, বিশেষ সুবিধা দেবার রাজনীতি থেকে এখনই বিরত হোন। নতুবা হালে পানি

পাওয়া যাবে না। সংখ্যালঘু-তোষণের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তার সংকেত-ধ্বনি কি মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষদের (Pseudo-Secularists) কর্ণকুহরে পৌঁচুচ্ছে না?

(৫৪) দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ইরাণী তাঁর ২৬.৫.৯৮ তারিখের ক্যাভিয়েটে (Caveat) লিখছেন, "সঙ্ঘ পরিবারের লোকেরা তাদের আসল চরিত্র কোনদিন পাল্টাতে পারবেন না, যেমন চিতাবাঘ তাদের গায়ের রং পাল্টাতে পারে না।" ঠিক একই কথা আর একজন নামীদামী কলামিষ্ট শ্রী এ. জি. নুরাণী দি ষ্টেটসম্যানের পাতায় একাধিকবার বলেছেন। এখানে আমাদেরও প্রশ্ন ঃ তাঁরা কি তাঁদের নিজস্ব চরিত্র পাল্টাতে পেরেছেন বা কোনদিন পারবেন?

(৫৫) "When the issue of partition was hotting up. Jawaharlal Nehru in one of the meetings has dismissed Jinnah's demand for partition of India as a "fantastic nonsense", to which Jinnah retorted that Pakistan had become an established fact, even when the first Hindu of this land had been converted to Islam some twelve hundred years ago when Turks invaded this country. What he was seeking was nothing but a political recognition of this reality. And he would forcibly obtain the same." (Courtesy_ G.S. Nair in ORGANISER dated 18.4.1999). And ultimately, all we know, he proved that his (Jinnah's) demand of Pakistan was not "fantastic Nonsense".

(৫৬) ভারত সরকারের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর চিকিৎসার জন্যে অদ্যাবধি ৬ কোটি টাকার উপর ভারত সরকার ব্যয় করেছে এবং আগামী দিনগুলিতে আরও কত খরচ করতে হবে জানা নেই। সেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং লণ্ডনের এক নার্সিংহোম থেকে টেলিফোন যোগে কাশ্মীরের ন্যাশানেল কনফারেন্সের একজন এম. পি.-কে বাজপেয়ী সরকারের আস্থাভোটের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন (১৬.৪.৯৯)। এভাবে তিনি রোগশয্যায় থেকেও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন কার স্বার্থে বা প্রয়োজনে?

(৫৭) গত ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বাসে চড়ে লাহোর গিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি পাকিস্তানের "Minar-e-Pakistan"-ও পরিদর্শন করেছিলেন। পাকিস্তানের মুসলমানরা তাঁর এই কাজ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয় **যেহেতু একজন কাফের "মিনার-এ পাকিস্তান"-এ গিয়েছিলেন তাই সে স্থান অপবিত্র হয়েছে বলে বালতি বালতি গোলাপজল দিয়ে সে-স্থান ধৌত করে স্থানটির পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করেছে।** তাদের এই কাজটি ভারতবর্ষের মেকি সেকুলারবাদীরা কীভাবে দেখছেন বা ভাবছেন তা জানার অপেক্ষায় রইলাম।

(৫৮) মুসলমানদের মহরম পর্ব একটি দুঃখজনক ঘটনা। ঐ দিনটিতে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান প্রতিবছর শোক দিবস হিসাবে পালন করেন। নিঃসন্দেহে

এটি একটি মানবিক কাজের অভিব্যক্তি। কিন্তু সেই দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের নকল মহড়া দেন তখন তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। তবে আজমগড়ের ইমাম ওবাইদুল্লা খাঁ সাহেব যখন বলেন, **"Don't worry, O Muslim....... Islam is still alive and the Quran is still there! What do these Kafirs who are laughing, sincerely think? The crucial battle of Karbala is yet to be fought"** (Courtesy_Times of India dated 27.3.90), তখন আশা করি, কারুরই বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়, মহরম উপলক্ষে (যা মূলত শোক দিবস হিসেবে পালন করা উচিত) যে নকল যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয় তা কারবালার শেষ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই দেওয়া হয়।

(৫৯) গত ৩০.৪.৯৯ তারিখের দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে দিলাম। "GUWAHATI, April 29, –Police dealt a severe blow to the Ulfa's publicity apparatus here last night by arresting a senior functionary, Jitenjit Gogoi, alias Jayantajit Gogoi. They also arrested an accomplice, Gitika Bora, and seized several sophisticated publicity and communication equipments....Police said, interrogations have revealed that the Ulfa has connections with several intellectuals and media-persons in the state." খবরটির শেষাংশের দিকে পাঠক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, কোন গুপ্ত সংস্থাই তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে না যদি না তাদের সঙ্গে উপর মহলের পরোক্ষ যোগাযোগ থাকে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়ছে। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত (কুখ্যাত বলবো না) হাজি মস্তান মির্জা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, **"আমার চোরা-চালানের কারবার একদিনও চলতে পারতো না যদি না আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিদের সহযোগিতা আমি পেতাম।** আমি আরও জানাচ্ছি, দিনের আলোতে সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে যারা চোরাচালান বন্ধের কথা উচ্চগ্রামে ঘোষণা করেন, তারাই আবার রাতের অন্ধকারে পার্টি চালাবার জন্যে আমার কৃপাপ্রার্থী হন।

(৬০) **পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিষ্ট সরকার গঙ্গাতীরে ভাগবত সঙ্ঘের মন্দির উচ্ছেদ করিয়াছেন অথচ পাশের মসজিদ অক্ষত। তাঁহারা হিন্দুর পূজায় মাইক বন্ধ করিয়াছেন, অথচ মসজিদ হইতে মাইকে আজান বন্ধ করিতে অক্ষম। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত ঘরছাড়া, অথচ বসনিয়া বা কোসোভোর মুসলমানরা গৃহহীন হইলে কমিউনিষ্টদের ভল্‌গা বা ইয়াঙ সিকিয়াং-তে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের অশ্রুজলের বান ডাকিয়া যায়।" (সূত্র— মাসিক "বিশ্ব হিন্দু বার্তা" বৈশাখ ১৪০৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ)।**

(৬১) Sri K. R. Malkani M. P., in his acceptance address of Dr. Hedgewar Pragna Samman of 1999, awarded and organised by Shree Burrabazar Kumarsabha Pustakalaya at University Institute Hall,

Calcutta on April 18, 1999 said, "No wonder Andre Malraux, the finest product of twentieth century Europe, said : **'There is no country like India' and the 'Gita is the Bible for the real revolution'. And he told Nehru : 'India does not belong to you Mr. Nehru, though you say so; it belongs to me. India is the World's Holy Grail....Keep India from duality. Let the great Shankaracharya guide India.'** This was Greek to Nehru. But it evokes an immediate and powerful response in the Indian Mind. As Ameury Riencourt noted in his The Soul of India : **'Indian masses will only give their heart-felt allegiance to that party and ideology that appears to be a true emanation, more or less modernised no doubt, of some aspect or other of timeless Hinduism'.** It was 'Gandhism yesterday' and it can only be the 'redoubtable RSS' tomorrow." (Courtesy : ORGANISER dated 2.5.99 AD).

(৬২) "The clashes in India are not between the Hindus and the Christians, but between the Christian missionary activists and the Hindus who see it as an assault on their culture and national identity. **This is aggravated by actions like John Paul II's recent proclamation in Manila : 'A great new harvest of faith will be reaped in this vast and vital continent'; and by Father Monanchin's 'Christianisation of Indian civilisation is to all intents and purposes an historical undertaking comparable to the Christianisation of Greece;" (N.S. Rajaram, ORGANISER dated 2.5.99 AD).**

(৬৩) এতোদিন কংগ্রেস সহ্ দেশের সব মেকি সেকুলারবাদী (Pseudo-Secularist) দল ও সংবাদপত্রগুলি ভাজপা-কে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে চিহ্নিত করে আসছে; কারণ "তারা হিন্দুত্বের কথা বলে এবং আরো বলে যতদিন সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু থাকবে ততদিন ভারত উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষই (Secular) থাকবে," **এবার স্বয়ং কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী একই কথা বলছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও এ-মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। দেরীতে হলেও, মেকি সেকুলারবাদী কংগ্রেস ও তার নেতৃত্ব যে এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকার করেছেন তার জন্যে তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।**

(৬৪) এবার আমরা একটু পেছনের দিকে তাকিয়ে তিনজন নামকরা মুসলমান ব্যক্তিত্বের কিছু কথা ও কাজ তুলে ধরবো। তাদের একজন খিলাফৎ আন্দোলন-খ্যাত আলিব্রাদার্সের মহম্মদ আলি, অপর দু'জন হলেন কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান, যথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও জনাব আসফ আলি সাহেব। তারা কতখানি জাতীয়তাবাদী এবং তারা তাদের ইসলাম সম্বন্ধে কী মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রমাণ মিলবে নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্য ও বিবরণ থেকে। **এর পরও যদি আমাদের সম্বিত ফিরে না আসে তবে শুধু একটি কথাই বলার আছে, ভগবান যেন হিন্দুস্থানের হিন্দুদের রক্ষা করেন।** গান্ধীজী সম্বন্ধে মহম্মদ আলির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন ঃ

মিঃ গান্ধীকে আমি মুসলমানের মধ্যে নিকৃষ্টতম মানুষটির চেয়েও নিম্নমানের বলে মনে করি। তার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ঃ কোনো পরিস্থিতিতেই কোন মুসলমানের পক্ষে অপর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সম্ভব নয়, তা সে যে দেশেরই হোক না কেন। (Vide-A.K.R. Hemmady in weekly "ORGANISER" dated August 4, 1996). এবার শুনুন মৌলানা আজাদের বক্তব্য ঃ কোরানে উল্লেখ নেই এমন সব ভাবধারা, তা যে কোন সূত্র থেকেই উদ্ভূত হোক না কেন, ইসলাম-বিরুদ্ধ। একথা রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।.... কোন মুসলমান যদি তার কাজের জন্য কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের মদত কামনা করে তবে সে তখন আর মুসলমান থাকে না অর্থাৎ মুসলমান বলে গণ্য হয় না। (Vide-Gandhi, Pan Islamism, Imperialism and Nationalism by Nanda. P-114, Quoted in English weekly ORGANISER dated 21.5.95). আর একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান আসফ আলি সাহেব সম্বন্ধে শ্রী জি.এস. হিরন্নাপ্পা, সাপ্তাহিক পত্রিকা আর্গেনাইজারের ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় যে বিবরণ দিয়েছেন তা রীতিমত রোমহর্ষক। শ্রী হিরন্নাপ্পা প্রশ্ন তুলেছেনঃ দেশবাসী, বিশেষ করে কংগ্রেস, তার প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল তিনি কি তার যোগ্য ছিলেন? প্রশ্নকর্তা নিজেই উত্তর দিচ্ছেন ঃ না, তিনি তার যোগ্য ছিলেন না। কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, ভারতছাড় (Quit India) আন্দোলনের (আগষ্ট, ১৯৪২) প্রাক্কালে কংগ্রেস তাকে ওয়াকিং কমিটির একজন সদস্য করে নেয়। জাতির সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধূরন্ধর রাজশক্তি আসফ আলির সহযোগিতা কামনা করে দূত পাঠালো। আশ্চর্যজনকভাবে আসফ আলি তাতে সারা দিলেন এবং কংগ্রেসের সব পরিকল্পনা বৃটিশের নিকট ফাঁস করে দিলেন। তার জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ছিল বহিরঙ্গ। আসফ আলির এই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী মিঃ ম্যাক্সওয়েল জিংকিনের স্মৃতিচারণ (Maxwell Zinkin's Memoir) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব গোপন করে রেখেছিল। জিঙ্কিন সাহেব ছিলেন গৃহমন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ আমলা। পরবর্তীকালে তিনি স্যার (Sir) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আসফ আলি সাহেব ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জিংকিনের নিকট থেকে গোপনে মাসোহারা পেতেন। মিঃ জিংকিনের স্ত্রী মিসেস তায়া জিঙ্কিন (Taya Zinkin) লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকার প্রতিবেদক ছিলেন।

# অনুপ্রবেশ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং আই. এস. আই-র নাশকতামূলক কার্যকলাপ

যে সব দেশ বিচ্ছিন্নতাবাদ, অনুপ্রবেশ এবং দেশের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে সদা-জাগ্রত নয় তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তদুপরি দেশের যারা বুদ্ধিজীবী এবং কর্ণধার তারা যদি তাৎক্ষণিক কিছু লাভের আশায় এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত জোগায় তবে তো কথাই নেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ দুটি ব্যাপারই সমভাবে প্রযোজ্য। একদিকে তারা যেমন দেশের স্বার্থ-রক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত উদাসীন, অপরদিকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে তারা পারেন না এমন কোন কাজ নেই।

অনুপ্রবেশ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (সংক্ষেপে আই. এস. আই), কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যিনিই ভারতে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশ করছেন তিনিই ভারতের মাটিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছেন, আবার তিনিই পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (সংক্ষেপে আই. এস. আই)র হয়ে নাশকতামূলক কাজ করে যাচ্ছেন বা সে-কাজে যারা লিপ্ত আছে তাদেরকে সাহায্য করছেন। এদের কর্মক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই বা কোন গণ্ডী নেই। এই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যেমন বাংলাদেশী আছে, তেমনি আছে পাকিস্তানী ও আফগানিস্তানের তালীবানরাও। এবং সব চেয়ে মজার কথা হলো, ভারতবর্ষের যারা বিগত ৫০ বৎসর ধরে কর্ণধার ছিলেন তারা এতোদিন এসব কিছু দেখেও দেখেন নি, জেনেও জানতে চান নি। কারণ যাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল, তারা ছিলেন একপ্রকার মেরুদণ্ডহীন জীব এবং যাদের মানসিকতা ছিল দাসসুলভ। এক টুকরো মাংসখণ্ড তুলে ধরলে তাদরে দিয়ে এমন কাজ নেই যা করিয়ে নেওয়া যেতো না, দু'টুকরো হলে তো কথাই নেই; তাদের জরু-গরু পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারতেন। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের দু'দুবার (১৯৬৫ ও ১৯৭১) সুযোগ পেয়েও ক্লীবের মতো হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। মুম্বাইয়ের লাগাতার বিস্ফোরণে (১৯৯৩) শত শত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে ও হাজারের উপর মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে কোয়েমবাটুরে লালকৃষ্ণ আদবানীর এবং অতি সাম্প্রতিক কালে (১৯৯৯ মে) দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। **দেশের বিভিন্ন স্থানসহ ১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় রেলওয়েতে যে-হারে (নাশকতামূলক কার্যকলাপের ফলে) দুর্ঘটনা বেড়ে**

**চলেছে তাতে যদি দেখা যায়, একদিন ভারতে রেলওয়ের চাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।** এক কথায়, দেশের ভেতরের পঞ্চম বাহিনীর সহযোগিতায় বিদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এমন একটি শক্তিশালী চক্র সৃষ্টি করেছে যাদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তারা যে কোন মুহূর্তে দেশের যে কোন স্থানে অনাসৃষ্টি ঘটাতে পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটিয়েও চলেছে। এর জন্যে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। প্রতিদিনের সংবাদপত্রগুলির পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য বহন করছে। তবু দু'চারটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি। ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ঘটছে প্রধানতঃ তিনদিক দিয়ে—ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তান এবং ভারত-নেপাল সীমান্ত পার হয়ে। আকাশ-পথও তাদের জন্যে খোলা আছে।

(১) "জয়ন্ত ঘোষাল, নয়াদিল্লী, ১০ ডিসেম্বর ঃ গোটা দেশে এখন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। আর এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আছে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক বিশেষ টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট থেকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে।......রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিবছর এই অনুপ্রবেশকারীদের ভরণ-পোষণের জন্য যোজনা খাতে খরচ হয় ১৫০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই প্রতি বছর ১০০০ কোটি টাকা এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বহন করতে হয়। টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে আরও বলা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের বহু এলাকা এই অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নেওয়ায় 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড' বলে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে আজ আর কিছুই নেই।

'টাস্ক ফোর্স পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামের মতো রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে অনুসন্ধান চালায়। এই রিপোর্টটির কপি আদবানি হালে হাতে পেয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাস্তা তৈরীতে ১৭৭০ কিলোমিটারের জন্য অনুমোদন থাকলেও রাজ্য তা করে উঠতে পারেনি। এখনও ৪৯৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়নি। ৩১শে জুলাই পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুসারে সীমান্তে বেড়া দেবার কাজও রাজ্য শেষ করতে পারেনি। অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও ৫৪ কিলোমিটার দূরত্বের বেড়াজাল রাজ্য করে নি।

"আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, এই অনুপ্রবেশকারীরা কলকাতা থেকে দিল্লী-মুম্বাই পর্যন্ত চলে আসছে। ভারত-পাক সীমান্তে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার বাংলাদেশী ধরা পড়ছে। প্রতি বছর অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা তিন লাখ করে বাড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ (ক) এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চরিত্রেই আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছে। (খ) মুসলীম-মৌলবাদী শক্তি এই অনুপ্রবেশকারীদের কাজে লাগাচ্ছে। (গ) অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে রাজনীতিও হয়। যেমন হয়েছে অসমে।" (বর্তমান, ১১.১২.৯৮)।

বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়—দেশের বিভিন্ন

স্থানেও ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি কাশ্মীরেও তারা জেহাদে অংশগ্রহণ করছে। তার প্রমাণ নিম্নের ছোট্ট একটি খবর থেকেই জানা যাবে। এ ব্যাপারে বেশী উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

(২) "SRINAGAR, March 23,–At least four Bangladeshi nationals were killed when Indian and Pakistani troops exchanged fire at Jahwal post in Arina scetor this morning, an official spokesman said. Pakistani troops began unprovoked firing on Indian positions early today and the Indian side retaliated. The bodies of Bangladeshi nationals were recovered from the area later,-UNI." (The Statesman, 24.3.1999).

(৩) "জয়ন্ত ঘোষাল, নয়াদিল্লী, ২৩শে জানুয়ারী ঃ গোটা দেশে যেভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বাড়ছে তাতে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু সীমান্ত এলাকাকে বাংলাদেশে মিশিয়ে দেবার দাবী তোলা হতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সূত্র থেকে আসা তথ্য ও অসমের রাজ্যপাল যেসব রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তা থেকেই কেন্দ্র এই আশঙ্কা করছে।

"পশ্চিমবঙ্গ থেকে নানা সূত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর কাছে রিপোর্ট এসেছে যে বঙ্গোপসাগরের তীরে জম্বু নামে এক দ্বীপ পুরোপুরি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কব্জায় চলে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার অধীন এই বদ্বীপ। এই অনুপ্রবেশকারীরা এখানে একটি পৃথক গ্রাম পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে। তারা গ্রামটির নাম দিয়েছে চারশ বিশ গ্রাম।

"এদিকে অসমের রাজ্যপাল লেফট্যান্যান্ট জেনারেল এস. কে. সিন্‌হা গত ১৬ ডিসেম্বর অনুপ্রবেশ নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পাঠান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরীর ষড়যন্ত্র পুরোদমে চলছে। নিম্ন অসমের জেলাগুলিতে যে হারে বাংলাদেশী মুসলিম-অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে অচিরেই বাংলাদেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের মিশে যাবার দাবি উঠতে পারে। তিনি এই রিপোর্টে আরো বলেছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্রোত এইসব জেলাগুলির জনচরিত্র ও জনসংখ্যার অনুপাতই বদলে দিচ্ছে। অঞ্চলটি দ্রুত মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চলে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এই অনুপ্রবেশের ঢলকে রাজ্যপাল নিম্ন অসমে এক নিঃশব্দ অভিযান বলে রিপোর্টে আখ্যা দিয়েছেন।

"আবার সুন্দরবন এলাকায় একের পর এক দ্বীপ অনুপ্রবেশকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। চারশ বিশ গ্রামটিতে ১১০টি এরকম পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। এরা রেশন কার্ডও করে ফেলেছে। পুরুষ ও নারীর অনুপাত ৫ ঃ ৯। আরও খবর এসেছে যে এইসব দ্বীপ থেকে প্রতি বছর ৩০০ কোটি টাকার মাছ বেআইনিভাবে পাচার করা হচ্ছে। এখানকার বাংলাদেশীদের অধিকাংশই কাকদ্বীপের ঠিকানায় রেশন কার্ড যোগাড় করে ফেলেছে। এমনকি ২২টি শুঁটকি মাছের 'ফার্ম' তৈরী করেছে এরা। জম্বু দ্বীপটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কিন্তু এখানে

বসবাসকারী বাংলাদেশীরা দু'দুটো ভিডিও পার্লার খুলেছে। জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে তাদের ঘরে। সম্প্রতি রাজ্যের বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মনও নাকি স্বীকার করেছেন যে এক ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ চলেছে। কিন্তু এখানে এসে থাকার বা মাছের ব্যবসা করার অনুমতি কাউকেই দেওয়া হয়নি।

"কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আজই গোয়ান্দা সূত্রে এই রিপোর্ট এসেছে। কেন্দ্র রাজ্যকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবার আর্জি জানিয়েছে। খুলনা, চট্টগ্রাম ও যশোর থেকেই এই মাছের কারবারীরা এদেশে চলে এসেছে। কেউ কেউ অবশ্য থাইল্যাণ্ড থেকেও এসেছে।

"আবার অসমের রাজ্যপাল তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, আন্তর্জাতিক মৌলবাদীরা এই 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' তৈরীর দাবী ওঠানোর পেছনে কাজ করে চলেছে।..... তিনি আরও বলেছেন, রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের যে কেবল উৎসাহিত করছে তাই নয়, সাহায্যও করছে।.... অসমের রাজ্যপাল বলছেন, 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' তৈরীর ষড়যন্ত্র সফল হলে শুধু অসম নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল রাজেশ্বর রাও-ও একদা পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রায় একই কথা বলেছিলেন।" (বর্তমান, ২৪.১.১৯৯৯)।

(৪) "The Congress leader, Mr. V.N. Gadgil, today came out strongly against the infiltration of Bangladeshis into India and spoke of **Islamic fundamentalism as being the biggest threat to India's security.** The question is whether India is a sovereign state or a Dharmasala where anybody can come and go as they please, the senior Congress leader, Mr. Gadgil told reporters here today.

".....Every year, around two lakh foreigners enter the country illegally and settle down here. A senior Army Officer has estimated that there are at least seven states where Hindus are in a minority–J & K, Punjab and five North-eastern states, Mr. Gadgil said.

**"The ISI has spread its wings in every part of the country with the help of local Islamic fundamentalist forces, Mr. Gadgil said, adding that Bangladeshi infiltrators included a large number of anti-social elements."** (The Statesman, 6.10.1998).

(৫) "**লোকসংখ্যার চেয়ে রেশনকার্ড বেশি।** দেবদাস অধিকারী, কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী ব্লক কৃষ্ণগঞ্জে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ব্যাপক হারে। তার চেয়ে দ্রুত এই ব্লকে রেশন কার্ডের সংখ্যা বাড়ছে। এই ব্লকের রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে প্রশাসন এতটাই উদার যে লোকসংখ্যার চেয়ে রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশী। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের গোটাটাই প্রায় বাংলাদেশ সীমান্ত। এই ব্লকের মাজদিয়া, বানপর, গেদে সীমান্ত দিয়ে চাল, চিনি, গরু, মোষ, পেঁয়াজ,

ঘড়ি, সাইকেল, টিউবলাইট, মোটর সাইকেল বাংলাদেশে যাচ্ছে অবাধে। ওপার থেকে মালপত্তর তেমন না এলেও মানুষ আসছে বিনা বাধায়, অর্থাৎ অনুপ্রবেশ ঘটছে যথেচ্ছ হারে।....." (বর্তমান ১০.৪.১৯৯৯)।

(৬) "**এই অবাধ সীমান্তের সুযোগ টেনে আনছে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের ও চোরাকারবারীদের।** আজ আমরা বুঝতে পারছি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের ও আই. এস. আই-এর একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-সব অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যেমন অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছেন, তেমনি শিক্ষিতরাও আছেন। আছেন কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শীরা। বলতে গেলে সব ধরণের মানুষ রয়েছেন। এদের ঢোকার পর প্রথম কাজ-ই হ'ল কোন রাজনৈতিক দাদাকে ধরে রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা। তারপর সময়মত ভোটার লিষ্টে নাম তোলা। শিক্ষিতদের আরও সুবিধে আছে। কোনরকম একটা স্কুলকে ধরে প্রাইভেট মাধ্যমিক পাশ করে নেওয়া।

"পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক হাল-হকিকৎ তো নতুন করে কিছু বলার নেই। এ রাজ্যে বাজেটের ৩৮% শতাংশ খরচ হচ্ছে বেতন ও ভাতায়, ২০ বছর আগে যেটা ছিল ২০% শতাংশ। ওদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা ধুঁকছে। বেকারত্ব বাড়ছে। শিল্পের অন্তিম দশা। শিল্প-বাণিজ্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বেশীর ভাগ উন্নয়ন প্রকল্প অর্থের অভাবে বন্ধ। এমন কি অর্থের অভাবে রাস্তাঘাট সারানো হয় না। হাসপাতালে বেড বাড়ে না। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ঠিক করা হয় না। সেখানে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার মতো বছর বছর ১০০০ কোটির ছয়লাপ। ওই সুবাদে সন্ত্রাসবাদী ও গুপ্তচরদের অবাধ প্রবেশ। কটা ভোটের জন্য আর কত নীচে নামব আমরা? দেশটাকেই ছারখার করে দেব নাকি?" (শ্রী অমিতাভ মজুমদার, বর্তমান, ২২/১২/১৯৯৮)।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এসব কথায় কোন আমলই দিতেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ণধাররা। বলতেন, অনুপ্রবেশ কোথায় দেখছেন? ওপারেও বাঙ্গালী, এপারেও বাঙ্গালী, আসা যাওয়া তো চলতেই পারে। অথবা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে সুর মিলিয়ে বলতেন অভাবের জন্যে বাংলাদেশীরা ভারতে যাবে বা আসবে কেন? ভারত কি বাংলাদেশের চেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ যে কাজের সন্ধানে ভারতে যাবে বা আসবে? যদি যেতেই হয়, তবে পশ্চিম এশিয়ায় কিংবা পশ্চিমের ধনী দেশগুলির কোন-না-কোন দেশে যাবে। যারা অনুপ্রবেশের কথা বলেন তারা বিদ্বেষবশত এসব কথা বলেন কিংবা কল্পনার রাজ্যে বাস করছেন ইত্যাদি। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি। দেখেও না দেখা, শুনেও না শোনার ভান করা আর বেশীদিন চালিয়ে যেতে পারলেন না। ঘটনা-প্রবাহের চাপে শেষ পর্যন্ত সি.পি.আই.-এর মুখপত্র 'কালান্তর' মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে।

(৭) "নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বুধবারের 'কালান্তরে' রাজ্যে 'মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের তৎপরতা বাড়ছে' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, বিভিন্ন

মৌলবাদী দলের সহযোগি ছাত্র সংগঠনও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। বস্তুত সি. পি. আই.-এর এই দৈনিক মুখপত্রে রাজ্যে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন এবং আই. এস. আই-এর তৎপরতা নিয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দেওয়া হয়েছে।......

"কালান্তরের এই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, মুসলিম মৌলবাদী দলগুলি তাদের কর্মতৎপরতার জন্য রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি জেলাকে বেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং নদীয়া। এইসব জেলায় সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশী মৌলবাদীদের মাধ্যমে আই. এস. আই. তাদের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে।.... **একেবারে শুরু থেকেই মুসলিম শিশুমনকে সাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলতে তারা বেসরকারী মাদ্রাসা, মক্তবের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু এন. জি. ও. (Non-government Organisation) রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয়।**

"সি. পি. আই-এর মুখপত্রে আরও লেখা হয়েছে, বীরভূমের সদর-সিউড়ির কাছে মৌলবাদী মুসলিম সংগঠন জামাত-ই-ইসলাম সংখ্যালঘুদের জন্য দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরী করেছে। **আফগানিস্তানের মৌলবাদী সংগঠন তালিবানের এক নেতা বিদ্যালয় দুটির দ্বারোদঘাটন করেছে। এমনকি জেলার আহমেদবাজারে তারা ৩-৪টি মিটিংও করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।** কালান্তর লিখছে, দিন কয়েক আগে হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফে তিনদিনের উরস (Urs) উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে মুসলিম মৌলবাদী দলের এজেন্টরা বহু আপত্তিকর ও উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক, লিফলেট বিলি করেছে। বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় এগুলি ছাপা হয়েছিল।

"সি.পি.আই.-মুখপত্রে লিখেছে— এ রাজ্যে তারা কোরাণের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশ করে নিজেদের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করছে বলে বহু মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। 'কালান্তরের' ভাষায় সদ্য সমাপ্ত কলকাতা বইমেলায় এমন অনেক ষ্টলের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে এই ধরণের কোরাণ ছিল। এ কাজে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তা আই. এস. আই. যোগাচ্ছে বলে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাংলাদেশের এক প্রকাশন সংস্থা অভিযোগ করেছে।

"কালান্তরে" লেখা হয়েছে, সম্প্রতি জামাত-ই-হিন্দ নামে এক মৌলবাদী সংস্থার অসম ও বাংলার রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল বহরমপুরে। সেখানে আগামী পরিকল্পনার বহু ছক কষা হয়েছে বলে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।..... এখন কথা হচ্ছে, এই বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে মৌলবাদীদের কারা অর্থ সাহায্য করছে। এই বিষয় আই. এস. আই-র নাম যেমন চলে আসে,

পাশাপাশি বিভিন্ন এন. জি. ও-র মাধ্যমে আরবি অর্থের অবাধ অনুপ্রবেশ এই রাজ্যে ঘটছে।" (বর্তমান, ১১/৩/১৯৯৯)।

'কালান্তর' প্রশ্ন তুলেছেন ঃ এসব কাজে টাকা আসে কোথা থেকে? উত্তরে একটি অত্যাধুনিক রিপোর্ট তুলে দিচ্ছি ঃ

(৮) "জয়ন্ত ঘোষাল, নয়াদিল্লী- ৯ মে ঃ ১৯৯৯ সনের প্রথম তিন মাসে এদেশে বিদেশী সাহায্যের বন্যা বয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, **১৯৯৮ সালের এই অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা আর ১৯৯৯ সালে প্রথম ৩ মাসেই বিদেশী টাকা এসেছে ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ।**" (বর্তমান ১০.৫.১৯৯৯)

(৯) "নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যে যে মৌলবাদী তৎপরতা ক্রমশই বাড়ছে, রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তা স্বীকার করে নিলেন। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধবাবু বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশী মৌলবাদী শক্তি রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে। ওইসব অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে মৌলবাদী সংগঠনগুলি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তো বটেই, এমন কি কলকাতাতেও আসছে। পুলিশমন্ত্রী বলেন; আমরা অনেক অনুপ্রবেশকারীকেই চিহ্নিত করেছি। পরিস্থিতির উপর নজরও রাখছি। তবে এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, তা বলব না।" (বর্তমান, ১১.৩.৯৯)।

(১০) **'অবৈধ বসবাস এক কোটি বাংলাদেশির, মানল রাজ্য'**—এই শিরনামে আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮.৮.৯৮ ইং সংস্করণে একটি খবর প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে দিচ্ছি। "**অনিন্দ্য জানা, নয়াদিল্লী, ১৭ই আগষ্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ এককোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন এবং সংখ্যাটা বিপজ্জনক ভাবে বাড়ছে বলে রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকে স্বীকার করে নিয়েছে।**.... রাজ্য সরকারের অফিসাররা বলেছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তারা মোট ১৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাংলাদেশি হিসাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। তাই আপাততঃ চিহ্নিত না হওয়া অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটির সামান্য বেশী, কিন্তু মন্ত্রকের এক পদস্থ অফিসারের কথায়, রাজ্য প্রশাসনের লোকেরা বলছেন, কিছুদিন আগেই মাইক ব্যবহার করে আজান বন্ধের ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে শাসক বামফ্রন্ট বিপাকে পড়েছে। **আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা যাচ্ছে না সংখ্যালঘু ভোটারদের কথা ভেবে। তারপরে বাংলাদেশি ইস্যুতে শাসকদল সহানুভূতি না দেখালে তাঁদের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে টান পড়বে। তাই যতদিন না শাসকদলের সবুজ সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না।**"

এ প্রসঙ্গে দি ষ্ট্যাট্সম্যান পত্রিকার দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

(11) **"Politics of Influx : Time for a little honesty of purpose.** At long last the state government has woken up to the threat of infiltration Bangladesh. Buddhadev Bhattacharjee, the Home (Police) Minister, frankly admits that the influx has assumed serious proportions and 'crossed all limits' which is a welcome admission; the government did not acknowledge the problem earlier, His admission that 'we don't know how to cope with the influx' is a surprise. Jyoti Basu had termed The Statesman's serialised expose The Quiet Influx–of the problem in 1981, as 'bunkum and the paper's fertile imaginations running wild'. His Ostrich-like attitude was guided by electoral considerations. **Illegal migrants were welcomed by the Marxists, they were a natural ally.** Ration cards were issued and names included in electoral rolls with no question asked.

"..... But does Buddhadev Bhattacherjee and his party have the will to fight the problem? Expression of intent or passing the blame to the BSF is not enough. A clear message is needed. There is time to act purposefully. It may soon be too late." (Excerpt from the editorial of The Statesman dated 1.11.1998).

(12) **"Playing with fire : Myopic CPI-M and Infiltration.** Had it not been for the vigilance exercised by the passengers of the Sealdah-bound Bongaon local, all 58 Bangladeshi infiltrators arrested by the police at the Barasat Railway Station last week would have by now reached their final destinations. **Left to themselves the Barasat police may not have bothered to apprehend the Bangladeshis. They know about the empathy that Jyoti Basu, Buddhadev Bhattacherjee and other Stalwarts of the left Front government have for the infiltrators because of the weight they add to vote blanks.** Repeatedly Jyoti Basu has tried to dismiss the issue as 'non-existent'. He had once called this newspaper's serialised reports highlighting the magnitude and the gravity of the problem as 'baseless, highly irresponsible and a result of the paper's fertile imagination running wild'.

**".... Is he (Buddhadev) ignorant about the way his own party panchayat functionaries make money while enrolling the names of infiltrators in the voters' list? Even Ershad's Ministers, declared fugitive by Dhaka, have been allowed to stay with bags of cash and do business. Myopic Marxists have already turned the state into a safe haven for the unwanted and the criminals.** This, as much as anything else, could be their as well as West Bengal's undoing. " (Excerpts from the editorial of The Statesman dated 21.5.1999).

(১৩) **'ভারতীয়ত্বের প্রমাণ মেলেনি মুম্বাই থেকে বিতাড়িতদের'**, এ শিরনামে একটি খবর প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার ২৪.৮.৯৮ তারিখের সংস্করণে। সংবাদটির প্রতিবেদক ছিলেন শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী। মুম্বাই থেকে বিতাড়িতদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তদন্ত করে যেসব তথ্য পেয়েছে তাতে মহারাষ্ট্রের

উপমুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ মুণ্ডের দাবীর যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের হাতে এখনও পর্যন্ত এমন কোন তথ্য নেই যার জোরে এটা প্রমাণ করা যায় যে মুম্বাই থেকে বিতাড়িতেরা পশ্চিমবঙ্গবাসী। উল্টে উলুবেড়িয়া স্টেশনে মুম্বাই পুলিশের হেফাজত থেকে (জুলাই, ২৩) ৩৪ জনকে ছিনিয়ে নেওয়ার দায়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। কারণ তিনি আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে গিয়েছেন।

"অন্যদিকে, মুম্বাই পুলিশ কিছুদিন আগে বাংলাভাষীদের কাছ থেকে দু'হাজার রেশন কার্ড পায়।.... পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তদন্তে জেনেছে, ওই রেশন কার্ডগুলি বীরভূম জেলার রামপুরহাট থেকে দেওয়া হয়েছিল। .... উল্লেখ্য, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী কলিমুদ্দিন শামস বীরভূমের নলহাটি থেকে বিধানসভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি উলুবেড়িয়ায় ৩৪ জনকে (অনুপ্রবেশকারী) ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার পর বলেছিলেন, দলের বিধায়ক রবিন ঘোষ, ওই ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে 'ইন্টার ন্যাশানাল ফিগার' হয়ে গিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী এই কথাও বলেছিলেন যে, বাংলাদেশীরা কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আসবে কেন? টাকার জন্য যেতে হলে তারা পশ্চিম এশিয়ায় যাবেন।"

(১৪) আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, "Deportees from Mumbai have no valid Papers" : (The Statesman, 8.8.1998). "Calcutta, Aug. 7- None of the Bengali speaking Muslims sent back from Mumbai recently have so far been able to provide any evidence to prove they are Indian citizens, a senior police officer has told The Statesman. When contacted, the Inspector General of Border Security Force (North Bengal), Mr. Bhupinder Singh, said : **'the main problem now is the multiplication of the existing number of Bangladeshi in India. We can always attempt to check infiltration, but what about the people already living on Indian soil?** Mumbai police alone have deported 8,000 illegal immigrants to Bangladesh in the last decade. Officials say that several of them have managed to sneak back to Maharashtra, Delhi and areas in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh.

"Most of them work as 'agricultural labourers, pimps, maid servants and try their hands at all kinds of odd jobs and all kinds of subversive activities for money.' A military intelligence officer in Calcutta said."

(১৫) জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা নিয়ে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই। ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সেখানে যা চলছে তাকে নিশ্চিতরূপেই বলা চলে একটি 'অঘোষিত যুদ্ধ।' এতদিন কাশ্মীরী জংগী এবং পাকিস্থানী. সেনারা সেখানে ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। ইদানিং তার সাথে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, আফগানিস্তানের তালিবানরা যুক্ত হওয়ায়। বর্তমানে কারগিল সেক্টারে যা চলছে তা রীতিমত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ স্থানীয়ভাবেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না আর

এক দফা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে তা অনতিবিলম্বেই বুঝা যাবে। দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা তাদের ২২.৫.১৯৯৯-এর সংস্করণে একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। "New Delhi : Most of the infiltrators occupying large portions of territory in the Dras-Batalik region in the Kargil sector have been identified as Afghans, possibly Taliban militia, highly-placed sources have said.

"We have confirmed information that almost all of them are Afghans, they have been conversing over their radio sets mostly in Pushto and even in Persian, said a source. There has been some conversation in English also indicating that they could be led by some Pakistani Officers."

(১৬) **"Demonstration against Kuldip Nayar in New York",** এই শিরোনামে ইংরেজী সাপ্তাহিক ORGANISER-এর ১৬.৫.১৯৯৯-এর সংখ্যায় শ্রী এন. কার্চারিয়া একটি বিবরণ পেশ করেছেন। তাতে তিনি, অনান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলেছেন ঃ "Kuldip Nayar, the controversial columnist, was heckled, booed and Jeered by a strong group of protestors in New York on April 9. The protestors distributed a fifteen page information sheet describing the anti-Hindu and anti-India proclivities of pseudo-secularist like Nayar who are disguising their tendentious activities under the garb of secularism, progressivism and such other catchy phrases to mislead and devide the Indian society.

"The pamphlet, inter alia, contained excerpts from an editorial, in The Pioneer, dated July 31, 1998. The editorial had identified Shri Nayar as a member of a small cligue of anti-nationalist propagandists whose political aim is the decapitation of Indian's pride and its eventual dismemberment. It is a matter of great regret and shame that this eloquent propagandist for Inter Service Intelligence of Pakistan is occupying an exalted status in Indian Parliament and media.....

**"The demonstrators demanded that Shri Nayar be disqualified from Rajya Sabha and prosecuted for his tendentious statement that 25 Hindus were murdered in Doda by Pakistan–sponsored terrorists in retaliation of what India is doing in Karachi.**

"In this connection, it should also be noted that Kuldip Nayar and his ilk are stridently championing the US state Department's case against India over the Pokaran blasts. **The editorial has also aspersions on the bonafide of Nayar and said that Nayar's nationlism can no longer be taken for granted.**

(১৭) এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। **Ultras front plans to seek foreign help to 'free' N-E.** এই শিরোনামে দি ষ্ট্যাটসম্যান পত্রিকার ২৭.৫.১৯৯৯-এর সংস্করণে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেটি হুবহু তুলে দিলাম। "Agartala, May 25- The Union of Seven Sisters of South-East Asia, a joint front of six prominent North-east rebel groups, plans

to request neighbouring countries to help free the North-east from 'India's colonial rule'. The joint front floated after discussions among leaders of rebel groups in the first week of March, comprises the National Security Council of Nagaland, The Peoples Revolutionary Organisation of Kangleipak, The Peoples Democratic Front, The political wing of the All Tripura Tiger Force, The United Liberation Front of Assam, The United National Liberation Front and The Revolutionary Peoples Front.

"In a message faxed to local dailies, the USSSEA praised the Indo-Burma Revolutionary Front, which it claimed had already extended moral and material support to North-east insurgents.

"The Front also announced that it would seek international mediation on the issue of 'Violation of human rights by the Armed forces in the North-east.' The USSSEA was stated to be keen on forging alliance with other insurgent outfits in the country, including those of Jammu and Kashmir. The NLFT has been left out of the front for its rivalry against the All Tripura Tiger Force, the message said."

ভারতবর্ষে পাকিস্তানের আই. এস. আই-এর (Inter Service Intelligence) জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার একটা আভাষ পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত কিছু বিবরণ থেকে। এসব কোন নতুন ঘটনা নয়, ভারতের মাটিতে আই. এস. আই-এর তাণ্ডবনৃত্য ঘটে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। তবু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কিছু তথ্য হাতের কাছে থাকা ভাল।

(১৮) "ISI shifts focus to Jammu : Army. Jammu : Lt. Gen. D.S. Chauhan, Commander of 16 corps in charge of operations here, said on Saturday that Pakistan Inter-service Intelligence (ISI) had shifted its focus to the region." (The Times of India, 17.1.1999). আই. এস. আই. ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু-নিধন ও বিতাড়ন-পর্ব শেষ করার পর এবার জম্মু থেকেও হিন্দুদের বিতাড়ন শুরু করেছে। তবেই তাদের আশা পূর্ণ হয়।

(১৯) "According to Maulana Azad Madni, Chief of the Jamiatul Ulema, **the Islamic Madarsas have become centres of ISI (Inter Service Intelligence) activities in Inda. During a speech on February 7, at Bangalore Mr. Madni further said, the ISI trains the students and teachers of these Islamic schools for anti-national activities** (Mr. V.P. Bhatia in ORGANISER dated April 18, 1999)."

(২০) **"রাজু আল-উম্মাকে বিস্ফোরক যুগিয়ে পেয়েছিল বহু টাকা।"** নিজস্ব প্রতিনিধি : কোয়েমবাটুর বোমা-বিস্ফোরণ মামলায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ধরা পড়া ফৌজি জওয়ান কারাটে রাজু বিস্ফোরক সরবরাহের জন্য ৫৫ হাজার টাকা পেয়েছিল বলে গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে প্লাষ্টিক বিস্ফোরক সরবরাহের জন্য তাকে এই বরাত দিয়েছিল তামিলনাড়ুর নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন

আল-উম্মা। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বি. জে. পি-নেতা এল. কে. আদবানী-কে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আল-উম্মা সংগঠনের নেতাদের গোপনে ওই শক্তিশালী বিস্ফোরক রাজু সরবরাহ করেছিল সেনাবাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার থেকে চুরি করে।

"গোয়েন্দা অফিসাররা জানান, ৯৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে কোয়েম্বাটুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১৮ জন মুসলমান মারা যাওয়ায় আল-উম্মা সংগঠনের নেতারা এর বদলা নেওয়ার পরিকল্পনা করে। প্লান অনুযায়ী তারা বি. জে. পি. নেতা এল. কে. আদবানিকে এবছরের ১৪ ফেব্রুয়ারীর জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করবে বলে ঠিক করে। শক্তিশালী বিস্ফোরকের খোঁজে আল-উম্মার সভাপতি এস. এ. বাসা কেরালার জঙ্গী সংগঠন পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা আবদুল নজরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আবদুল নজরই '৯৭-এর ডিসেম্বরে এ বিষয়ে রাজুর সঙ্গে বাসার যোগাযোগ করিয়ে দেয় কেরালার ক্যুরাঙ্গপল্লীতে। **শুধু বিস্ফোরক সরবরাহ নয়, অসম রাইফেলস-এর জওয়ান রাজু আল-উম্মার ক্যাডারদের জঙ্গী প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেবে বলেও বাসা-কে কথা দিয়েছিল।** বিস্ফোরক সরবরাহ করার জন্য রাজু প্রথমে নগদ ৩০ হাজার এবং পরে ডিমাণ্ড-ড্রাফ্‌টে ২৫ হাজার টাকা নেয়।" (বর্তমান- ৩০.৭.১৯৯৮)।

(২১) "অতনু ভট্টাচার্য, নয়াদিল্লী, ৯ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেসের সরোজ খাপার্দে, জনতা দলের ওবেইদুল্লা খান আজমি, বি. এস. পি.-র জয়ন্ত মালহোত্রা প্রমুখ এম. পি.-র একাধিক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি বলেন, সব পাকিস্তান নাগরিকই যে এদেশে ঢুকে পড়ে আই. এস. আই-এর জাল বিছোচ্ছে তা কিন্তু নয়। আই. এস. আই. আমাদের দেশের মধ্যেই এজেন্ট খোঁজে। সে কারণেই সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসাগুলি স্থাপন করা হচ্ছে। **এরকমই এক এজেন্ট হল সম্প্রতি ধৃত রমেশ শর্মা। দাউদ ইব্রাহিমের এজেন্ট হিসাবে সে কাজ করত।** মুম্বাই বিস্ফোরণের প্রধান অভিযুক্ত দাউদ ইব্রাহিম যে আমাদের দেশের রাজধানী শহরেও রমেশ শর্মার মত এজেন্ট পেয়েছে তা খুবই উদ্বেগের বিষয়। **আর একাজ সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, আমলাদের শীর্ষ স্তরের মদতে।** আদবানি বলেন, একারণেই আমি সি. বি. আই.-কে নির্দেশ দিয়েছি যে কীভাবে এ জিনিষ সম্ভব হল তা খতিয়ে বের করতে হবে।" (বর্তমান- ১০.১২.১৯৯৮ ইং)।

(২২) "কোয়েম্বাটুরে লালকৃষ্ণ আদবানির জনসভায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল চলতি বছরের গোড়ার দিকে। উদ্দেশ্য ছিল আদবানিকে হত্যা করা। তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন ভাগ্যক্রমে। কিন্তু বহুলোক বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল। ওই বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হল মৌলবাদী আল-উম্মার নেতা সিদ্দিক আলি। পুলিশের জেরার মুখে সে জানিয়েছে, **ভারতের ভিতরে চারশ মানব-বোমা ছড়িয়ে আছে।**

"শ্বেত পত্রের খসড়া থেকে জানা গিয়েছে, আই. এস. আই-এর মদতে সাত হাজারেরও বেশী পাকিস্তান জঙ্গী ভারতে ঢুকেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিশ হাজার ভারতীয় মুসলিম যুবককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আই. এস. আই। ওই যুবকদের শেখানো হচ্ছে 'কুরবান আলির মতবাদ।' কুরবান আলি ছিলেন পাকিস্তান জঙ্গীদের নেতা। তিনি বেঁচে নেই। তার তত্ত্ব হল, সাবেক পাকিস্তান যেমন ভেঙ্গে গিয়েছে, ভারতও তেমনি ভেঙ্গে যাবে। তবে পাকিস্তানের মতো ভারত শুধু দু'টুকরো হবে না। বহু টুকরো হবে।

'শ্বেতপত্র বলছে, পাক জঙ্গীরা ভারতে নিয়ে এসেছে বাহান্ন হাজার কেজি আর. ডি. এক্স। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে আই. এস. আই. এবং দাউদ ইব্রাহিমের যৌথ প্রয়াসে মুম্বাইয়ে মনুষ্য-ইতিহাসের বৃহত্তম অন্তর্ঘাতমূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র পৌনে তিনশ কেজি আর. ডি. এক্স। পুলিশ ইতিমধ্যে দেশের নানা জায়গা থেকে চুয়াল্লিশ হাজার কেজি আর. ডি. এক্স. উদ্ধার করেছে। **আর. ডি. এক্স-এর সঙ্গে রমেশ শর্মার যোগাযোগও ধরা পড়েছে। কিন্তু ওই যোগাযোগ সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের ফাইলটি উধাও করে দেওয়া হয়েছে। সি. বি. আই. এই উধাওয়ের ব্যাপারটি এখন তদন্ত করছে।**

"৯ নভেম্বর দিল্লীতে হয়েছিল ক্রাইম কনফারেন্স। সারা দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসাররা এসেছিলেন ওই সম্মেলনে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পুলিশ কর্তারা গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি দুজনই হাজির হয়েছিলেন সম্মেলনে। বিভিন্ন রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসাররা ওই সম্মেলনে বলেছিলেন, আই. এস. আই. এবং দাউদ ইব্রাহিম পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর ভারতের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার অতি ঘনিষ্ঠ মাফিয়াদের সাহায্যে সারা ভারতে জাল বিস্তার করেছে। আই. এস. আই. এবং দাউদ ইব্রাহিমকে এদেশে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন এদেশেরই কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের কাছের লোকেরা।

"ক্রাইম কনফারেন্স স্বীকৃত হয়েছে, আই. এস. আই. পূর্বভারত দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোক ঢোকাচ্ছে। তারা এই কাজে মাফিয়াদের সাহায্যই বেশি নিচ্ছে। মোলায়েম সিং এবং চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ মাফিয়ারা নেপাল থেকে আই. এস. আই. এবং দাউদ-এর লোকদের এদেশে ঢুকতে সাহায্য করছে। নেপাল থেকে ড্রাগ পাচারেও তারা জড়িত।" (শ্রী পবিত্র কুমার ঘোষ, বর্তমান ২৪.১২.৯৮ ইং)।

# মেকি সেকুলারবাদীরা (Pseudo Secularists) কি কোরান শরীফ ও বাইবেল পাঠ করেছেন?

ভারতবর্ষের সেকুলারবাদীরা যদি মেকি না হয়ে সাচ্চা হতেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতেন তবে আমাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার নামে তারা যখন সংখ্যালঘু-তোষণ করেন এবং সংখ্যাগুরুদের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন তখন তাদের সে-সব কাজকে কোন মানদণ্ড দিয়েই নিরপেক্ষ বলা যায় না। এবং যেহেতু তাদের সকল কাজ পক্ষপাত এবং একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট তাই নিঃসন্দেহে তারা মেকি। দ্বিতীয়ত যাদের জন্যে এই মেকি সেকুলারবাদীরা নিজেদের সবকিছু জলাঞ্জলি দিচ্ছেন, তাদের মানসিকতা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে তারা কতটুকু জানেন? আর, যদি জেনেও না জানার ভান করে দেশবাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপথে পরিচালনা করে থাকেন তবে সে তো জঘন্যতম অপরাধ। এবং এই অপরাধ তারা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ করে যাচ্ছেন। তাই তাদের মুখোশ কিঞ্চিত পরিমানে হলেও, খুলে দিয়ে দেশবাসীকে সজাগ থাকার জন্যে কোরান শরিফ ও বাইবেল থেকে কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ইসলাম ও খৃষ্টান উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে মিল আছে। কোন্ কোন্ ব্যাপারে তারা সহমত পোষণ করেন এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে করেন না, প্রথমে আমরা সেসব কথা তুলে ধরবো; অতঃপর কর্তব্য-অকর্তব্যের ব্যাপারে তাদের স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতির পুস্তক কী বলে তার কিছু অংশ তুলে ধরবো।

(১) উভয়প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির লোকেরা পৃথিবীটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—এক যারা তাদের স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, আর দুই যারা করেন না। এদের উভয়ের যে-কোন একটিকে যারা মেনে নেন তারা বিশ্বাসী বলে অভিহিত হন, আর যারা এর কোনটিকেই বিশ্বাস করেন না, তারা অবিশ্বাসী। এভাবে তারা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর সংগা নির্ধারণ করেছেন। এখানে বিশ্বাসী বলতে আল্লাহ-এ বিশ্বাসী বুঝতে হবে, অথবা গড এবং তদীয়পুত্র যীশুখৃষ্টে বিশ্বাসী বুঝতে হবে। এই দুই উপাসনা-পদ্ধতির লোকের বাইরে যে বিরাট এক মানবগোষ্ঠী আছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং হিন্দু বলে পরিচিত তাদেরকে পূর্বোক্ত দুই উপাসনা পদ্ধতির বাইরে রাখা হয়েছে। এদেরকে 'কাফের বা Infidel' বলা হয়।

(২) উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস

পরিবর্তন করে স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত-করণে (prselytisation) বিশ্বাসী। তথাকথিত অবিশ্বাসীরা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি ত্যাগ করে ইসলাম কিংবা খৃষ্টান উপাসনা-পদ্ধতিতে নিজেদের সামিল করেন তো ভাল; আর যদি না করেন, তবে তাদেরকে জোরপূর্বক স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিতে সামিল করতে হবে। এ কাজ করতে যেয়ে মুসলমানরা 'জেহাদ' ঘোষণা (যুদ্ধ ঘোষণা) করেন এবং খৃষ্টানরা ক্রুসেড বা ইনকুইজিসনের (Crusade or Inquisition) পথ অবলম্বন করেন। মোট কথা, ইসলাম ও খৃষ্টান উপাসনা-পদ্ধতির লোকেরা মনে করেন পৃথিবীটাকে আল্লাহ তা 'আলা এবং গড (God) স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুগামীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। যে কোন ভাবেই হোক, তোমরা পৃথিবীর যত-যাবতীয় মাল-পানির অধিকার নাও। আর যদি জেহাদ বা ক্রুসেডে প্রাণ হারাও তবে তোমাদের জন্যে যথাক্রমে জান্নাত (বেহেশত) ও হেভেনের (Heaven) দরজা খোলা আছে। পৃথিবী জয় করে তার সর্বপ্রকার ভোগ্যসামগ্রী ভোগ কর আর মৃত্যুর পর জান্নাত ও হেভেনের অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবনের অধিকারী হও।

**(৩) উভয় সম্প্রদায়ই বস্তুবাদ (Materialism) এবং ভোগবাদে (Consumerism) বিশ্বাসী।**

(৪) উভয়ই নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক বা উপাসনা-পদ্ধতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে।

**(৫) উভয় সম্প্রদায়-ই অসহিষ্ণু অর্থাৎ অন্য কোন উপাসনা-পদ্ধতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে না।**

(৬) খৃষ্টানরা পবিত্র আত্মায় (Holy Ghost) বিশ্বাস করেন, মুসলমানরা আল্লাহ-র ফেরেস্তায় (Feresta)।

(৭) খৃষ্টানরা শেষ বিচারের দিনে (The Day of Reckoning) বিশ্বাসী, মুসলমানরা 'রোজ কেয়ামতে' (শেষ বিচারের দিনে)।

(৮) উভয়ই 'স্বর্গ-নরক এবং জান্নাত-জাহান্নামে' বিশ্বাসী। বিশ্বাসীরা স্বর্গ বা জান্নাতে যাবে এবং চিরদিন সেখানে রাজার হালে বসবাস করবে; অবিশ্বাসীদের নরক বা জাহান্নামের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।

(৯) উভয় সম্প্রদায়ই উপাসনা-পদ্ধতির ভিত্তিতে মানব সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং নিজ নিজ উপাসনা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে সদা-সক্রিয়।

(১০) উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ একজন বলে মনে করেন। মুসলমানরা যাঁকে ইব্রাহিম বলেন, খৃষ্টানরা তাঁকে অ্যাব্রাহাম (Abraham) বলেন।

(১১) জেরুজালেম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র স্থান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধু এরাই নয়, ইহুদীরাও জেরুজালেমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

(১২) উভয় সম্প্রদায়ের প্রার্থনাগৃহ মোটামুটি একইভাবে নির্ম্মিত।

(১৩) উভয়ই সম্মিলিত প্রার্থনায় (Congregation) বিশ্বাসী। প্রতিদিন যদি

সম্ভব নাও হয় তবে খৃষ্টানদের নিকট রবিবার এবং মুসলমানদের নিকট শুক্রবারের সম্মিলিত প্রার্থনা বাধ্যতামূলক।

(১৪) উভয় সম্প্রদায়ই তাদের মৃতদেহ কবর দেয় এবং মৃতরা তাদের কবরে শেষ-বিচারের দিনে পুনরুত্থানের (Resurrection) জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন।

(১৫) খৃষ্টান ধর্মযাজক ও মুসলমান ইমাম-উলেমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রায় একই প্রকার।

(১৬) উভয় সম্প্রদায়ের নর-নারীর খাদ্যাভ্যাস প্রায় একই রকম। শুধু ব্যতিক্রম শুকরের মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে। মুসলমানরা শুকরের মাংসকে হারাম (Prohibited) মনে করেন। তবে এরও ব্যতীক্রম আছে। মুসলমানরা যদি এমন অবস্থায় পড়েন যেখানে শুকরের মাংস ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যই পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাণরক্ষা করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু খাওয়া যেতে পারে, কোনক্রমেই লোভের বশবর্তী হয়ে পেটভরে খাওয়া যাবে না। (সুরা-৫/আয়াত-৩)।

(১৭) **উভয়েই ভীতি-প্রদর্শন ও নিষ্ঠুরতায় বিশ্বাসী।**

এতো মিল থাকা সত্ত্বেও এদের ভেতর যে-সব ক্ষেত্রে অমিল আছে তাদের মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

(ক) মুসলমানরা একসাথে বহুবিবাহে বিশ্বাসী, খৃষ্টানরা তাতে বিশ্বাসী নয়।

(খ) মুসলমানরা স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন, খৃষ্টানরা বিশ্বাসী।

(গ) মুসলমানরা তাৎক্ষণিক তালাকে (Divorce) বিশ্বাসী, খৃষ্টানরা নিয়মমাফিক তালাকে (Divorce) বিশ্বাসী।

এখন আমরা কোরাণ শরীফের কিছু আয়াত তুলে ধরবো, বিশেষ করে সেইসব আয়াত যাতে ইসলামের অনুগামীদের প্রতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে। কোন্ কোন্ কাজ তাদের করণীয় এবং কোন্ কোন্ কাজ করণীয় নয়। কপট উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষরা (Pseudo-Secularists) কান পেতে শুনুন।

(১) "(একথা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে) তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে, ইহকাল পরকাল উভয় স্থানেই তাহার যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এই ধরণের সকল লোকই জাহান্নামী হইবে এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করিবে।" (সুরা-২/আয়াত ২১৭) অর্থাৎ একবার ইসলাম গ্রহণ করলে তার পক্ষে ফিরে তাকাবার অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। যদি কেউ ত্যাগ করেন তবে তার অবস্থা হবে কাফেরদের মত অর্থাৎ কাফেরদের সাথে তারাও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে।

"পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা খোদার জন্যে ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়াছে এবং খোদার পথে জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই খোদার অনুগ্রহ লাভের

আশা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। আল্লাহ্ তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করিবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দানে তাহাদিগকে ধন্য করিবেন।" (সুরা ২/আয়াত ২১৮)। এই আয়াতে উদ্ধৃত জিহাদ শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনুবাদকারী বলছেন ঃ **জিহাদের অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজের পূর্ণশক্তি, সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। জিহাদ মাত্র যুদ্ধের সমার্থবাচক নয়।** জিহাদ বলতে মাত্র যুদ্ধ বোঝায় না। যুদ্ধের অর্থ প্রকাশ করতে কেতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়। জেহাদের অর্থ এর থেকে ব্যাপক। জেহাদ অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে যুদ্ধ-সহ সব রকমের চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রাম বর্তমান আছে।

আমাদের সংযোজন ঃ এক কথায়, পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যৎ-যাবতীয় কাজ বা উদ্যোগের নামই জেহাদ। এবং জেহাদ উদ্‌যাপনে যারা সামিল হবেন, আল্লাহ-র দরবারে তাদের সকল দোষ ত্রুটি মাপ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ নিজে তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন।

(২) "তোমরা মুশরিক নারীদিগকে কখনও বিবাহ করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করিয়া থাক। (অনুরূপভাবে) নিজেদের কন্যাদিগকে মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এই ব্যক্তিকেই তাহারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে।" (সুরা ২/আয়াত ২২১)।

আমাদের সংযোজন ঃ এখানে ঈমানদার শব্দটির অর্থ ইসলামে বিশ্বাসী বুঝতে হবে।

(৩) **"হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলিয়া দিতে চাও?" (সুরা-৪/আয়াত ১৪৪)।**

(৪) "হে নবী, মু'মিন লোকদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্য্যশালী হয় তবে তাহারা দুই শতকের উপর জয়ী হইবে। আর যদি একশত লোক এইরূপ থাকে তাহা হইলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে। কেননা উহারা এমন লোক, যাহারা জ্ঞান রাখে না।" (সুরা ৮/আয়াত ৬৫)।

আমাদের সংযোজন ঃ জ্ঞান রাখে না-র অর্থ বুঝতে হবে, অপদার্থ কিংবা যুদ্ধের ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞানই নেই।

(৫) **"অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাহাদের পাও; এবং তাহাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাহাদের খবরা-খবর লওয়ার জন্যে শক্ত হইয়া বস।** অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহা

হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সুরা-৯/আয়াত ৫)। অনুবাদকারীর মন্তব্য ঃ এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চারমাসকে বুঝাচ্ছে মোশরেকদের যার অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়-কালের মধ্যে মোশরেকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিল না। এই জন্যে এই মাসগুলিকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

আমাদের সংযোজন ঃ হারাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। এই আয়াতে হারাম মাস বলতে নিষিদ্ধ চারমাস বুঝতে হবে। মনে হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুশরিকদের (অমুসলমানদের) চার মাস সময় দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে তারা মুসলমান হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেবে। এবং এই চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যদি দেখা যায়, তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত হলো না তখন তাদের বিরুদ্ধে পূর্বোক্তি মতে ব্যবস্থা নেয়ার কথা কোরান শরীফে বলা হয়েছে। মনে হয়, আজও এ নিয়ম চালু আছে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে হয়তো নানাকারণে এ নির্দেশ হুবহু কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। তওবা = অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থী; যাকাত = অর্থবিত্ত দান।

(৬) "এই সাদকা সমূহ মূলত ফকীর ও মিশকীনদের জন্যে, আর তাহাদের জন্যে যাহারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং **তাহাদের জন্যে যাহাদের মন জয় করা হইল উদ্দেশ্য**। সেই সঙ্গে ইহা গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লহর পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে; ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ফরয। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।" (সুরা ৯/আয়াত ৬০)।

আমাদের সংযোজন ঃ 'সাদকা' শব্দের অর্থ 'দানের মাল'। এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে, যাকাতের অন্যতম প্রাপক হলো 'তাহারা যাহাদের মন আজো জয় করা যায়নি,' অর্থাৎ এখনও যারা নিজেদের ইসলামের উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেনি। সুতরাং অর্থবিত্ত এবং মালপানি দিয়ে কাফেরদের মন জয় বা খরিদ করার বিধান কোরান শরীফে আছে।

(৭) **"হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাহাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর।...."** (সুরা-৯/আয়াত ৭৩)।

(৮) **"হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের নিকট রহিয়াছে। তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখিতে পায়।" (সুরা-৯/আয়াত ১২৩)।**

(৯) **"অতএব হে নবী, কাফের লোকেদের কথা কস্মিন কালেও মানিও না, আর এই কুরআনকে লইয়া তাহাদের সহিত বড় জেহাদ কর।" (সুরা-২৫/আয়াত ৫২)।**

(১০) "যাহারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও পরকালের দিনের প্রতি

ঈমানদার, তাহারা তো কখনই তোমার নিকট আবেদন করিবে না যে, জান-মালসহ জেহাদ করার দায়িত্ব হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভাল করিয়াই জানেন।" (সুরা-৯/আয়াত ৪৪)।

(১১) "**প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তা 'আলা মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের হৃদয়-মন এবং তাহাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাহাদের প্রতি (জান্নাতদানের ওয়াদা) খোদার যিম্মায় একটি পাকা পোখ্‌ত ওয়াদা তওরাত ইনজীল ও কুরআনে। আর খোদার অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পুরণকারী আর কে আছে?** অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুণ, যাহা তোমরা খোদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছ। ইহাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সুরা-৯/আয়াত ১১১)।

আমাদের সংযোজন ঃ ইসলামিক জীবনচর্যায় এই আয়াত দুটির (৯/৪৪ এবং ৯/১১১) গুরুত্ব অপরিসীম। এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ক্ষণিকের জাগতিক জীবনের সুখশান্তির বিনিময়ে জান্নাতে (বেহেশ্‌তে) চিরস্থায়ী সুখশান্তি ও মাল্‌পানি দেবার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) করছি। সেখানে তোমরা চিরযৌবন নিয়ে অন্তকাল ধরে বাস করবে। জান্নাত থেকে কোনদিন তোমরা বহিস্কৃত হবে না। এর বিনিময়ে তোমাদের শুধু একটি কাজ করতে হবে। তা হলো, কোরান শরীফে বর্ণিত আমার নির্দেশনামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। **জান্নাতে আল্লাহ তা 'আলার অনুগামীরা কী কী সম্পদের অধিকারী হবেন তার বিস্তৃত বিবরণ কোরান শরীফে দেয়া আছে। সে-সব বিবরণ থেকে আমরা মাত্র কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি।**

(ক) "...যাহারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে ও নির্যাতিত হইয়াছে এবং আমারই জন্য লড়াই করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে তাহাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে এমন বাগিচায় স্থান দিব যাহার নীচ হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। খোদার নিকট ইহাই তাহাদের প্রতিফল; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র খোদার নিকটই পাওয়া যাইতে পারে।" (সুরা-৩/আয়াত-১৯৫)।

আমাদের সংযোজন ঃ মনোরম বাগিচা ও ঝর্ণাধারা-র কথা কোরান শরীফে অন্তত ১০০টি আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে।

(খ) "(তাহাদিগকে বলা হইবে) খাও ও পান কর স্বাদ ও মজা সহকারে তোমাদের সেইসব কাজের প্রতিফলরূপে যাহা তোমরা করিতেছিলে।" (সুরা-৫২/আয়াত-১৯)।

(গ) "তাহারা সামনা-সামনি বসানো আসন সমূহে ঠেস লাগাইয়া বসিবে। আর আমরা সুলোচনা হুরদিগকে তাহাদের সহিত বিবাহ দিব।" (সুরা ৫২/২০)।

(ঘ) "আমরা তাহাদিগকে সর্বপ্রকার ফল ও গোশত— যে জিনিষই তাহাদের মন চাহিবে—খুব বেশী বেশী দিয়া যাইতে থাকিব।" (৫২/২২)

(ঙ) "তাহারা পানপাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আগাইয়া আগাইয়া গ্রহণ করিতে থাকিবে। সেখানে কোনরূপ হল্লা কোলাহল বা চরিত্রহীনতা হইতে পারিবে না।" (৫২/২৩)।

(চ) "আর তাহাদের সেবাযত্নে সেইসব বালক দৌড়াদৌড়ী করিতে নিযুক্ত থাকিবে যাহারা কেবলমাত্র তাহাদের জন্য হইবে। ইহারা এমন সুন্দর সুশ্রী, যেমন লুকাইয়া রাখা মুক্তা।" (৫২/২৪)।

(ছ) "নেক্‌কার লোকেরা (জান্নাতে) শরাবের এমন সব পাত্র পান করিবে যাহার সহিত কর্পূর সংমিশ্রণ হইবে।" (সুরা-৭৬/আয়াত ৫)।

(জ) "ইহা একটি প্রবহমান ঝর্ণা হইবে, যাহার পানির সঙ্গে আল্লাহ্‌র বান্দাহরা শরাব পান করিবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই উহার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া লইবে।" (৭৬/৬)।

(ঝ) "তথায় তাহারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়া বসিবে। তাহাদিগকে না সূর্য্যতাপ জ্বালাতন করিবে, না শীতের প্রকোপ। (৭৬/১৩)

"জান্নাতের ছায়া তাহাদের উপর অবনত হইয়া থাকিবে এবং উহার ফলসমূহ সর্ব্বদা তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে, তাহারা ইচ্ছামত উহা পাড়িতে পারিবে। (৭৬/১৪)।

"তাহাদিগকে তথায় এমন সুরাপাত্র পান করানো হইবে যাহাতে শুঁটের সংমিশ্রন থাকিবে।" (৭৬/১৭)। অনুবাদকারীর টিকা ঃ আরববাসীরা মদের সংগে শুঁটমিশ্রিত পানির সংমিশ্রন খুব পছন্দ করতো। এ কারণে বলা হয়েছে তাদের সেখানে সেই ধরণের শরাব পান করানো হবে যাতে শুঁটের সংমিশ্রন থাকবে।

"ইহা হইবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, উহাকে 'সালসাবীল্' বলা হয়।" (৭৬/১৮)।

"তাহাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোযাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকিবে। তাহাদিগকে রৌপ্যের কংকন পড়ানো হইবে এবং তাহাদের খোদা তাহাদিগকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাইবেন।" (৭৬/২১)।

'ইহাই হইল তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবানরূপে গৃহীত হইয়াছে।" (৭৬/২২)।

(ঞ) "নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকেদের জন্য একটা সাফল্যের মর্যাদা রহিয়াছে।

"বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর

"ও নবোদ্ভিন্ন সমবয়স্কা মেয়েরা,

"এবং উচ্ছসিত পান-পাত্র।" (সুরা ৭৮/আয়াত ৩১-৩৪)।

(ট) 'ইহা ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোন!) মুত্তাকী লোকেদের জন্য নিঃসন্দেহে অতি উত্তম পরিণাম রহিয়াছে, (সুরা ৩৮/আয়াত ৪৯)।

(ঠ) "চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহ যাহার দুয়ারগুলি তাহাদের জন্যে উন্মুক্ত হইয়া থাকিবে।" (৩৮/৫০)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতে 'জান্নাত-সমূহ", অর্থাৎ একাধিক জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। 'জান্নাত' কি একটি নয়, 'জান্নাত' অনেক?

(ড) "তাহাতে তাহারা হেলান দিয়া আসীন হইয়া থাকিবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চাহিয়া পাঠাইবে।" (৩৮/৫১)।

(ঢ) "...এই সব জিনিষ এমন যাহা হিসাবের দিন দান করার জন্যে তোমাদের নিকট ওয়াদা করা যাইতেছে।" (৩৮/৫২)।

(ণ) "আর তাহাদের নিকট লজ্জাবনতা সমবয়স্কা স্ত্রী থাকিবে।" (৩৮/৫৩)।

আমাদের সংযোজন ঃ "হিসাবের দিন" অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন।

(ত) "ইহা আমাদের দেওয়া রেযক, ইহা কখনই ফুরাইয়া যাইবে না।" (৩৮/৫৪)।

উদ্ধৃতি আর বাড়াবো না। নতুবা একটি পুরো পুস্তকের আকার ধারণ করবে। এখন আমরা অন্য কথায় যাবো। এ তো গেলো বিশ্বাসীদের অর্থাৎ কোরান-শরীফে যারা বিশ্বাসী তাদের জান্নাতের পুরস্কার-প্রাপ্তির বিবরণ। আর যারা কোরান শরীফে বিশ্বাস করেন না তাদের জন্য যে-সব ব্যবস্থা আছে তার কিছু বর্ণনা দেবো (অবশ্যই কোরান শরীফে বর্ণিত)। এ-তালিকা-ও দীর্ঘ। তবে আমরা উদাহরণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করবো।

(অ) "আমার এই বান্দাহর প্রতি যে কিতাব নাযিল করিয়াছি, তাহা আমার প্রেরিত কিনা সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জাগিয়া থাকে তবে উহার অনুরূপ একটি সুরা রচনা করিয়া আনো। এই জন্য তোমাদের সকল সমর্থক ও একমতের লোকদিগকে একত্র কর, এক আল্লাহ ভিন্ন আর যাহার যাহার সাহায্য চাও তাহা গ্রহণ কর; তোমারা সত্যবাদী হইলে এই কাজ অবশ্যই করিয়া দেখাইবে।" (সুরা-২/আয়াত ২৩)।

(আ) "কিন্তু তোমরা যদি তাহা না কর—নিশ্চয়ই তাহা কখনো করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর যাহা সত্যদ্রোহী লোকেদের জন্যে নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হইয়াছে।" (সুরা-২/আয়াত২৪)।

অনুবাদের টিকা ঃ অর্থাৎ সেখানে মাত্র তুমিই দোযখের জ্বালানি (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং সেখানে তোমার সেই উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন হবে যাহাদেরকে তুমি উপাসনা ও প্রণিপাত করতে।

আমাদের সংযোজন ঃ কোরান শরীফে ২ নম্বর সুরার (সুরা-আল-বাকারার)

২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর আয়াত খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি আয়াতের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরান শরীফের মূল সুরটি ধরা আছে। আমরা সে আলোচনায় যাবো না। ২৪ নং আয়াতে-ও যাবো না; কারণ ইতিপূর্বেই তার মর্ম বিভিন্ন আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াত নিয়ে দুচার কথা বলবো। ২৩ নম্বর আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের চ্যালেঞ্জ (বাংলা প্রতিশব্দ পেলাম না) জানিয়ে বলছেন ঃ 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে কোরান শরীফে বর্ণিত উহার অনুরূপ একটি সুরা রচনা করিয়া আনো।' পরের ২৪নং আয়াতেই তিনি বলেছেন ঃ জানি তোমরা তা পারবে না, এবং যেহেতু তোমরা পারবে না, তাই তোমাদের স্থান হবে জাহান্নামে অর্থাৎ নরকাগ্নিতে। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীরা-ও নরকে যাবে এবং সেই আগুনের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু তাতেও আমরা যাবো না; শুধু একটি কথাই বলবো ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তাঁরই সৃষ্ট সামান্য মানুষের প্রতি এরূপ চ্যালেঞ্জ থ্রো (Challenge Throw) করা এবং ফলের অপেক্ষা না করে, পরক্ষণেই তা ফিরিয়ে নিয়ে শাস্তির বিধান দেয়া তাঁর শক্তি ও মর্যাদার উপযুক্ত কাজ হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

(ই) "আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকর' (উপদেশ-নসীহত) হইতে বিমুখ হইবে, তাহার জন্য দুনিয়ায় হইবে সংকীর্ণ জীবন, আর কেয়ামতের দিন আমরা তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব।" (সুরা-২০/আয়াত ১২৪)।

আমাদের সংযোজন ঃ অন্ধ করিয়া উঠাইব-র অর্থ হল শেষ বিচারের দিনে (কেয়ামতের দিনে) সকল বিশ্বাসীদের যখন কবর থেকে তুলে আনা হবে তখন তদ্রুপ অবিশ্বাসীদেরও কবর থেকে তুলে আনা হবে। তুলে আনার সময় তাদেরকে অন্ধ করে দেয়া হবে।

(ঈ) "নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেইসব ম'বুদ—যাহাদের তোমরা পূজা উপাসনা করিতে—জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমাদেরও সেইখানে যাইতে হইবে।" (সুরা-২১/আয়াত-৯৮)।

'ইহারা যদি প্রকৃত খোদা হইত তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেখানে যাইত না। অতঃপর সকলেই চিরদিন সেইখানে থাকিতে হইবে"। (২১/৯৯)।

"সেখানে তাহারা কানফাটা অর্তনাদ করিতে থাকিবে। আর অবস্থা এই হইবে যে, সেখানে তাহারা কোন আওয়াজই শুনিতে পাইবে না।" (২১/১০০)।

(উ) "সেইদিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হইবে আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘিরিয়া আনিব যে তাহাদের চক্ষু (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হইয়া যাইবে"। (সুরা ২০/আয়াত ১০২)।

"যে সব লোক আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে

তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহন করিতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালা সমুহ কার্য্যকরী করার পন্থা কৌশল খুব ভাল করিয়া জানেন।'' (৪/৫৬)।

(ঙ) ''কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কণ্ঠ কড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।'' (সুরা ৭৬/আয়াত ৪)।

আমাদের সংযোজন ঃ আল্লাহ্ কীভাবে কাফেরদের শাস্তি দিবেন তা নিয়ে বহু আয়াত আছে। আমরা তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ দু'চারটি আয়াত উদ্ধৃত করলাম।

শেষ বিচারের দিন কাফেরদের এবং তাদের দেবদেবীর কী পরিণতি হবে তার কিঞ্চিত বিবরণ দেওয়া হলো। এখন জাগতিক জীবনে অ-মুসলীমদের প্রতি কীরূপ আচরণ করা হবে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

**''যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকেদের বিরুদ্ধে, যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহাকে হারাম করে না, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না (তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাক) যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হইয়া থাকিতে প্রস্তুত হয়।'' (সুরা-৯ আয়াত-২৯)।**

আমাদের সংযোজন ঃ এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, ইসলামের একটি স্তম্ভ বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়; কিন্তু একটি শব্দ এবং দুটি বাক্যাংশের বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'দ্বীন' শব্দটির অর্থ বিশ্বাস বা 'উপাসনা-পদ্ধতি'। 'তাহারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে'—'জিযিয়া' শব্দটির অর্থ আমরা অনেকেই জানি, ইহা এমন একটি কর বা রাজস্ব যা একমাত্র অমুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জীবনের বিনিময়ে এই কর দিতে হয়। তবে এই 'জিযিয়া' কর লোক মারফৎ কিংবা অন্যভাবে পাঠালে চলবে না; দিতে হবে নিজেদের হাতে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে। তা-ও না হয় দেয়া গেলো, জীবন বলে কথা! কিন্তু এতে-ও ইসলাম সন্তুষ্ট নয়। জিযিয়া তো প্রাণের বিনিময় মূল্য। ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলমানদের বসবাস করার জন্যে কিছু দিতে হবে না? নিশ্চয়ই দিতে হবে এবং তা হলো 'ছোট হইয়া থাকিতে হইবে।' **এভাবে যারা জীবনযাপন করে তাদেরকে 'জিম্মী' বলা হয়। কীভাবে ছোট হয়ে থাকতে হবে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া গেলো।**

(১) নতুন করে তারা কোন উপাসনার স্থান বা গৃহ নির্মান করতে পারবে না।

(২) পুরানো কোন উপাসনা গৃহ, যা মুসলমানরা নষ্ট করে দিয়েছে তার মেরামতির কাজ কিংবা নতুন করে নির্মান করা চলবে না।

(৩) তাহাদের উপাসনাগৃহে যদি কোন মুসলিম মুসাফির থাকতে চায় তবে তাতে আপত্তি করা চলবে না।

(৪) যদি কোন মুসলিম তাহাদের গৃহে থাকতে চায় তবে তাকে তিন দিন থাকতে দিতে হবে। তদুপরি, সে-ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে আরও বেশীদিন থাকতে দিতে হবে।

(৫) তাহাদের মনে কোন বিক্ষোভ পোষণ করা চলবে না এবং বিরোধী পক্ষের প্রতি কোনপ্রকার সহানুভূতি প্রর্দশন করা কিংবা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

(৬) তাহাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলামের উপাসনা-পদ্ধতিতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া চলবে না।

(৭) প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(৮) তাহাদের সভা-সমিতিতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

(৯) মুসলমানের মতো তাদের পোষাক পরিচ্ছদ পড়া চলবে না।

(১০) মুসলিম নামের অনুরূপ কোন নাম তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারবে না।

(১১) জিন ও লাগাম লাগানো ঘোড়ায় তারা চড়তে পারবে না।

(১২) তারা কোন অস্ত্র রাখতে পারবে না।

(১৩) সিলমোহর-অংকিত কোন আংটি তারা হাতের আঙ্গুলে পড়তে পারবে না।

(১৪) খোলা জায়গায় তারা মদ্যপান বা বিক্রয় করতে পারবে না।

(১৫) তারা এমন পোষাক পড়বে, যা দেখলেই যেন বুঝা যায় তারা নিম্নবর্ণের এবং মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন জাতের মানুষ।

(১৬) নিজেদের রীতি-নীতি এবং আচার-আচরণ তারা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে পারবে না।

(১৭) মুসলমানের বাড়ীর ধারে কাছে তারা নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারবে না।

(১৮) তারা তাদের মৃতদের মুসলমানের কবরস্থানের কাছে আনতে পারবে না।

(১৯) তারা তাদের পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি প্রকাশ্যে উদযাপন করতে পারবে না এবং মৃতদের জন্যে উচ্চস্বরে শোক প্রকাশ করতে পারবে না।

(২০) তারা মুসলিম দাস-দাসীদের ক্রয় করতে পারবে না। (From 'Pan Islamism Rolling back' by P.N. Joshi, P-142-43).

**নারীজাতির প্রতি কোরান শরীফের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ**

(ক) "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্রের মতো, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—যে ভাবে তোমরা ইচ্ছা কর—নিজেদের ক্ষেতে গমন কর।..." (সুরা-২/আয়াত ২২৩)।

(খ) "পুরুষ স্ত্রীলোকদের পরিচালক এই কারণে যে, আল্লাহ তাহাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে।..." (৪/৩৪)।

(গ) "তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারাই ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, তাহাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চারিজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে তবে তাহাদিগকে (স্ত্রীলোক) ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখ যতদিন না তাহাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ নিজেই তাহাদের জন্য কোন পথ বাহির করিয়া দেন।" (৪/১৫)।

**পিতা মাতার প্রতি কোরান শরীফের নির্দেশ ঃ**

(অ) "তোমার খোদা ফায়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, (এক) তোমরা কাহারও-ই ইবাদত করিবে না—কেবল তাঁহারই ইবাদত করিবে। (দুই) পিতা মাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তোমাদের নিকট যদি তাহাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাহাদেরকে 'উহুঁ' পর্য্যন্ত বলিবে না। তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না। বরং তাহাদের সহিত বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে কথা বলিবে।" (সুরা-১৭/আয়াত ২৩)।

(আ) "আমরা মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়াছি যে তাহারা যেন নিজেদের পিতামাতার সহিত নেক্ আচরণ করে। তাহার মাতা কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভে রাখিয়াছে এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াই তাহাকে প্রসব করিয়াছে। তাহার গর্ভধারণে ও দুধ পান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হইয়াছে।..." (সুরা ৪৬/আয়াত ১৫)।

(ই) **"হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে-ই যালেম হইবে।" (সুরা-৯/আয়াত-২৩)।**

আমাদের সংযোজন ঃ প্রথম দুটি আয়াতে (১৭/২৩ এবং ৪৬/১৫) আল্লাহ তা'আলা-র পরই পিতামাতার স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় আয়াতটিতে (৯/২৩) বলা হয়েছে, তারাও যদি ইসলামে বিশ্বাসী না হয় এবং অন্য কোন উপাসনা-পদ্ধতি বেছে নেয় তবে তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখবে না। যদি কেউ রাখে, তবে সে বাতিল বলে গণ্য হবে।

**বিপদকালে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করা যেতে পারে ঃ**

"মু'মীনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এইরূপ করিবে খোদার সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। **অবশ্য তাহাদের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যহ্যতঃ এইরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করিলে তাহা আল্লাহ ক্ষমা করিবেন।**

আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছেন, তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" (সুরা-৩/আয়াত ২৮)।

আমাদের সংযোজন ঃ এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। সাধারণভাবে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যেন অমুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখে। যারা রাখবে তারা খোদার সাথে দুষমনি করবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ। তবে যদি বিপদে পড়ে, তবে কাফেরদের সাথে লোকদেখানো বন্ধুত্বের ভান করা যেতে পারে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাদের এ কাজ খোদা মাপ করে দেবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ মুসলমানরা নিজেদের বিপদ-মুক্ত মনে না করবে ততক্ষণ তারা এই অভিনয় করে যাবে; তবে যে-মুহূর্তে তারা মনে করবে নিরাপদ, তখনই তারা অমুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যাতে তারা নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতি ত্যাগ করে ইসলামকে গ্রহণ করে।

**গণতন্ত্রের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ**

"খুব ভাল করিয়া জানিয়া রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসুল বর্তমান। সে যদি বহুসংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মানিয়া লইতে শুরু করে তাহা হইলে তোমরা নিজেরাই কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফাঁসিয়া যাইবে।" (সুরা ৪৯/আয়াত ৭)।

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতটিতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে ঃ আমার প্রতি যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে আমার রসুল অর্থাৎ প্রতিনিধি যিনি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান, তার প্রতিও তোমাদের সমপরিমান বিশ্বাস থাকা উচিত এবং তার কথা শুনে চলা উচিৎ। এর পরিবর্তে, সে যদি তোমাদের কথা মানিয়া লইতে শুরু করে অর্থাৎ বহুসংখ্যক লোকের মতামত নিয়ে চলতে থাকে তবে তোমাদের মঙ্গল হবে না। আরও একটু পরিস্কার করে বলা যায়। **আমার রসুলকে যদি তোমাদের বেশী সংখ্যক লোকের মত নিয়ে (যা 'গণতন্ত্রের' মূল কথা) সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য কর তবে তোমরা নিজেরাই ফ্যাসাদে পড়ে যাবে।**

* * *

এতোক্ষণ আমরা কোরান শরীফ নিয়ে কিছু কথা বল্লাম। এবার বাইবেল নিয়ে কিছু কথা বলবো। সম্প্রতি আমার হাতে একটি ছোট বই এসেছে ঃ নাম "The Bible in the Balance" by Charles Smith, Editor of the "Truth Seeker". তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই বাইবেল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য শেষ করবো। তারও আগে বাইবেল সম্পর্কে তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে দিচ্ছি ঃ

1. "The Bible is a barbarous book, written in a barbarous age for the barbarous people"–Dean Farrar. অর্থাৎ বাইবেল হলো একটি বর্বর কিতাব, রচিত হয়েছিল বর্বর যুগে এবং বর্বরদের জন্যে।

2. "It has been said, that anything may be proved from the Bible, but before anything can be admitted as proved by the Bible, the Bible must be proved to be true." –Thomas Paine. অর্থাৎ কথিত আছে, সব কিছুরই প্রমাণ মিলবে বাইবেলে; কিন্তু বাইবেলে যে সব কিছুর প্রমাণ মিলবে তা স্বীকার করে নেয়ার পূর্বেই জানা প্রয়োজন, বাইবেল নিজে কতখানি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

3. "People whose education is derived from the Bible are absurdly mis-informed as to be unfit for public employment, parental responsibility or the franchise"–George Bernard Shaw. অর্থাৎ বাইবেল থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা অদ্ভুত রকমের অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছেন। তারা সরকারী চাকুরীর অযোগ্য, পিতামাতার দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত, এমন কি ভোটাধিকারের-ও অযোগ্য।

এবার শুনুন চার্লস স্মিথ্ (Charles Smith) বাইবেল সম্বন্ধে কী বলছেন ঃ

I. Satan provokes David to number Israel. 1 Chron. 21:1 God moves him to number them. 2. Sam. 24:1. If both accounts ae true, God and Satan are the same person.

II. 'With God all things are possible.' Matt. 19:26
'He could not drive out the inhabitants of the Valley, because they had chariots of iron.' Jud. 1:19

III. Paul and James clash over justification. Paul (Rom. 3:28). 'A man is justified by faith without the deeds of the law.'
James (James 2:24): 'By works a man is justified, and not by faith only.'

IV. The doctrine of Trinity was smuggled into the First Episode of St. John. 5:7: 'For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and these three are one.'

V. Who was the father of Joseph - Jacob (Matt.) (1:16) or Heli (Luke 23)?

VI. God instructs Moses how to make a perfume, with death to imitators. Ex. 30:34-8.

VII. To build a temple, David gives more gold and silver than England and America possesses today. 1. Chorn. 22:14.

VIII. Aron by stretching out his hand covers Egypt with frogs. The magicians produce another layer of frogs. En. 8:6-7.

IX. A human body disappears into the sky. Luke 24:51.

X. 'Sons of God' co-habit with dauthers of men producing, giants. Gen. 6:44. 'Sons of God' should read 'Sons of the Gods.' Because the Hebrew word Elohim is plural meaning Gods and not God.

XI. Heaven is a solid roof, supporting reservoirs of water. Gen. 1:8. 'The windows of heaven were opened.' Gen. 7:11. Sky is 'strong, and as a molten looking glass.' Job. 37:18.

XII. The earth has foundations (Ps. 104:5), pillars (1 Sam. 2:8) and four corners (Rev. 7:1).

XIII. Jesus holds disease caused by devils (Luke 4:33-41) and declares serpents and poison will not harm believers. (Mark 16:18).

XIV. **The world created in six days. Gen. 1.** The subterfuge of the scripture-twisting-Moderist that 'days' means 'epochs' is indefensible. The six periods of mosaic creation correspond in no manner with evolutionary formation of earth. Modernism is intellectual mush. It lacks honesty. Evolution undermines religion.

XV. Genesis contains two accounts of creation. The first includes Chapter 1 and the first three verses of Chapter 3; The second account comprises the remainder of Chapter 2. They contradict each other. In the first, trees are created before man; in the second, after man. In one, man and woman are made at the same time; in the other, woman is an afterthought.

Mr. Charles Smith continues: That the Fall of Man is fiction, is tacitly taught in nearly every American high school by teaching Evolution. Civilization rose and fell before the Jews ever heard of the creation myth given in Genesis. 'Evolutionist' Christian, did man fall before or after becoming an ape? Also, with which man does the Bible genealogy going back to Adam become ficticious? **Evolution ousts the Bible from the schools.**

XVI. Two contradictory reports of the Flood are intermingled in chs. 6, 7 and 8 of Genesis. According to one (7:2), clean beasts went into the Ark by sevens; the other by twos (7:8-9). Flooding the world to destroy men is like burning a barn to kill rats.

A ship 150 yds. long 25 wide and 15 high (Gen. 6:15) holds pairs, or sevens, fourteen, of every living thing. The Ark has three stories, but only one 27 in. window for ventilation (16). The Black Hole of Calcutta was nothing compared to the Ark. The water was five and one-half miles high over all the earth. Gen. 7:20. Where did it go? Eight persons handled the World's greatest menagerie. The carnivorous animals required tons of flesh daily. The Flood story was copied from an old Babylonian myth,

Bishop Colenso, translating the Bible for savages was jolted out of Orthodoxy by the honest question of his native assistant. This limerick immortalises the event:

**"To the heretic Bishop of Natal,**
**Whose doubts of the Deluge were fatal**
**Said an infidel Zulu,**
**'Do you believe that, you fool, you?'**
**'No, don't,' said the Bishop of Natal."**

Confess, O Priests, the Flood is fiction.

XVII. **Three Ten Commandments:** The first Ten Commandments is in Ex. 20; the second Ex. 34; and the third; Deut. 5. They are contradictory.

As a moral code, the commandments are defective. The first four have no moral value. The first three deal with relations to God, not Man. The Bible God commanded the breaking of all the commandments, except those involving himself. He gave orders to steal (Ex.3:21-2), kill (Ex. 32:27), commit adultery (Hosea 1:2) and **incited the Jews to appropriate the property of their neighbours** (Deut 20:10-7).

**The first commandment reflects upon God as conceited: the second prohibits the arts of painting, sculpture and photography:** the third says that God is jealous (jealousy is a vice) and that He visits the iniquity of the fathers upon children - manifest injustice: the fourth, establishing the Sabbath because God rested on the seventh day (first Ten Commandments) or because 'he delivered his people on that day' (Third Ten Commandments), is broken by all but a few Jews: the fifth gives a selfish and false reason for honouring parents: and **the tenth classes wives with asses and other chattels, and recognizes slavery. The Hebrew word translated 'servant' means 'slave'.**

**The Ten Commandments do not restrain wife, child and slave-beaters, religious persecutors, liars (except in court) or tyrants.**

The Decalogue needs debunking.

XVIII. Thomas Jefferson found in the gospel history of Jesus: 'a groundwork of vulgar ignorance, of things impossible, of superstitions, fanaticism and fabrications.' Mem. Cor. & Misc., ed. by T. J. Randolph, vol. 4, p.325.

XIX. **Sermon on the Mount:** The Sermon on the Mount (Matt. 5,6,7) consists largely of romantic nonsense. Its good doctrines were not original. Non-resistance to evil (5:39-42), improvidence (6:19-34) and dependence on prayer (6:6) are anti-social. Jesus - thinking ignores reality. It does not work. This sermon is a literary composition. It was never preached.

XX. **Reason condemned:** "Of the tree of the knowledge of good and evil, thou shall not eat of it." (Gen. 2:17). **"Beware lest any man spoil you through philosophy" Col. 2:8.**

Buckle: "The clergy, with a few honourable exception, have in all modern countries been the avowed enemies of the diffusion of knowledge."

XXI. Is the Bible a safe Moral Guide?

God establishes slavery. Lev.25:44-46. Ex. 21:2-6.

A man may sell his daughter. Ex.21:7.

God directs slave - branding. Ex. 21:6.

God orders slave-capturing expeditions. Deut. 20:10-15.

**The New Testament sanctions slavery.** 1 Tim. 6:1, Titus 2:9, Eph. 6:5, 1 Pet. 2:18.

The Rev. Alexander Campbell: "There is not one verse in the

Bible inhibiting slavery, but many regulating it. It is not then, we conclude, immoral."

The Abolitionists were infidels. Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation nullified "God's law." The civil war was a contest between Bible morality and social morality. Jefferson Davis was a Christian, Lincoln was not.

আমাদের সংযোজন ঃ এখানে "Abolitionists" বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা আমেরিকায় "দাসপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন।"

XXII. Witchcraft: "Thou shall not suffer a witch to live." Ex. 22:18.

Three hundred thousand persons have been killed because of that text.... Joan of Arc was put to death as a witch.

Sir Wm. Blackstone: "To deny witchcraft is at once flatly to contradict the revealed word of God in various passages both of the Old and New Testaments."

Martin Luther: "I should have no compassion on these witches: I would burn them all."

XXIII. **Poligamy:** The Patriarchs of the Old Testament were polygamists. The New Testament nowhere prohibits a plurality of wives, notwithstanding polygamy flourished in Palestine. Monogamy came from pagan Rome, not Jerusalem.

XXIV. **Improper Literature:** The Bible contains baser matter than that for which men and women have been imprisoned. Chapters 19 and 38 of Genesis are the worst.

XXV. **Intolerance: Liberty of thought is alien to the Bible. A father must slay his own daughter, wife, son or friend, for a difference of religion. Deut. 13:6-19.** The New Testament is no better. "I would they were even cut off which trouble you." Gal. 5:12. **The inquisition** carried out the spirit of that text. Death for heresy. Ex. 22:20. Death for adultery. Lev. 20:10. Death for eating fat. Lev. 7:25.

**Elijah slays 450 priests for differing from him in religion. 1 Kings 18:40.**

**Jefferson: "In every country and in every age the priest has been hostile to liberty."**

আমাদের সংযোজন ঃ Inquisition শব্দটির সাধারণ অর্থ অনুসন্ধান বা সরকারী তদন্ত। কিন্তু এখানে এই শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে দমন করবার জন্যে স্থাপিত বিচারালয়। আমাদের প্রশ্ন ঃ "বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে দমন করিবার জন্যে" এই অধিকার রোমান ক্যাথলিকরা কোথা থেকে পেলেন অথবা তাদেরকে এ অধিকার কে দিল বা দিলেন? তারা বলবেন ঃ God দিয়েছেন। আবার আমাদের প্রশ্ন করতে হবে ঃ "গড (God) কি কেবলমাত্র রোমান ক্যাথলিকদেরই সৃষ্টি করেছেন, না সমস্ত মনুষ্যকুলের-ই (বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির

মানুষেরই) সৃষ্টিকর্তা?" দ্বিতীয়ত ঃ এই ইনকুইজিসনের (Inquisition) নামে অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতির মানুষদের রোমান ক্যাথলিক উপাসনা-পদ্ধতি মেনে নেবার জন্যে যে প্রকার অ-মানবিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হতো বা পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো, এককথায়, তাকে 'নারকীয়' বল্লেও কম বলা হয়।

XXVI. **Tyranny:** The Bible contradicts the Declaration of Independence. It enjoins unquestioning obedience to rulers - 'the powers that we are ordained to God... they that resist shall receive to themselves damnation?' Rom. 13:1-2. Slavish submission is also taught in 1 Pet. 2:13-4.

"The just powers of government are derived from the consent of the governed." Washington, Jefferson, Paine and Franklin are burning in hell, if the Bible is true.

XXVII. **The Patriarchs: Abraham debauches his maid-servant (Gen 16:4) and turns her and his and her child out into the wilderness (21:14).**

Lot offers his daughters to a mob (Gen. 19:8).

Jacob cheats his brother. Gen. 27:19.

**Gideon has "many wives" Judges 8:30**

Moses orders innocent women and children killed, and command his officers: "**..... all the women children that have not known man by lying with him, keep alive for yourselves." (Num. 31:17-8).**

David was God's favourite. Read his record: "And he brought out the people..... and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon." 1 Chron. 20:3. Tortures prisoners in a brick Kiln. 2 Sam. 12:31. Slays and mutilates 200 Philistines and buys a wife with their foreskins. 1 Sam. 18:27. David was on a cultural level with scalping savages. Lives by massacre and robber. 1 Sam. 27:8-5; Blackmails, 25:8, **maintains a harem. 2 Sam 5:13, locks up 10 concubines for life, 2 Sam 20:3**

XXVIII. **Cannibalism:** A strain of cannibalism appears in the Bible. See Jer. 19:9, Deut. 28:53-7. Lam. 4:10 & 2 Kings 6:28-9. **"Except ye eat flesh of the Son of man and drink his blood, ye have no life in you." John 6:53.**

Catholics take that literally, Protestants perpetuate the idea if not the practice.

XXIX. **The Diabolism of God:** Assassinates at midnight the first born of every Egyptian family. Ex. 12:29-30. Kills a baby to punish its father for murder. 2 Sam 12:14-8. Kills men for not worshiping him. Ex. 22:20.

1 Sam. 15:2-3 God speaking: "Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and sukling." Why this cruelty? Because the Amalekites had wronged the Israelites 400 years before. **Confess**

**Christians, that a God who gives such a command is unworthy of worship.... Condemns all men for the sin of one in acquiring knowledge. Rom. 5:12.**

Thomas Jefferson pronounces the Bible God "a being to terrific character - cruel, vindictive, capricious and unjust". ('Memoir. Cor. & Mis.,' ed. by T. J. Randolph. V. 4, page 326) and **the Jewish priests "a blood thirsty race." (Ibid. p.327).**

XXX. **Character of Christ: "He that believeth not shall be damned." Mark 16:16. "These shall go away into everlasting punishment." - Matt. 25:46. "Depart from me, ye cursed, into overlasting fire." Mat. 25:41. "Cast into hell, into the fire that never shall be quenched." Mark 9:45.**

These declarations discredit the being who uttered them, the book containing them and the Church endorsing them. The Eternal Torturer deserves not the worship, but the execration of mankind.

Christian persecutors thus defended their infamies: **"If the all-wise God punishes his creatures with tortures infinite in cruelty and duration, why should not his ministers, so far as they can, imitate him?" The Inquisition is man's nearest approach to God's hell. If hell is fictitious, O Modernists, so is heaven.** They are the theological Siamese twins.

XXXI. **Human Sacrifice:** God gives law governing human sacrifice. Lev. 27:28-9. God commands Abraham to sacrifice Issac. Gen. 22:2. The order was revoked, but the text has driven thousands to insanity and murder.

XXXII. **Insane Sex Ideas: Motherhood is sinful, especially, if the baby is a girl. Lev. 12:1-5.**

Eunuchs and virgins are superior to fathers and mothers, according to the New Testament. Jesus: "There be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake." Matt. 19:10-12.

The doctrine of the Virgin Birth brands every natural mother as impure.

There are in heaven 144,000 virgin men whom woman has never "defiled". Rev. 14:1-4. Sex insanity. Probably written by an impotent.

Jesus preached no divorce. Mark. 10:2-12 and Luke 16:18.

Genesis 3:16: "Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception: in sorrow thou shalt bring forth children."

XXXIII. **Injustice to women: Women should be in subjection because Eve was deceived.** 1 Tim. 2:11-4. What suffering that fable has caused!

**Women may be captured, violated, and then turned out of**

**doors. Deut. 21:10-4.** No civilised states would tolerate such infamy. See Deut. 24:1-3 and Num. 31:18.

"As the Church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing." Eph. 5:24. "Wives submit yourselves unto your own husbands." Col. 3:18. "Thy desire shall be to thy husband and he shall rule over thee." Gen. 3:18. A husband may divorce his wife, if she displeases him (DEUT. 24:1), but wives may not divorce husbands. **Jesus to his mother: "Woman, what have I to do with thee? John 2:4. See also : Num. 30; 1 Cor. 11:3-7 and14:34-5; 1 Pet. 3:1.**

**"Have they not divided the prey: to every man a damsel or two....?" Deborah. Judges 5:30.** Did you ever hear a sermon on that text?

Helen Gardner:"Women are indebted to-day for their emancipation from a position of hopeless degradation, not to their religion nor to Jehovah, but to the justice and honor of the man who have defied his commands. **That she does not crouch today where St. Paul tried to bind her, she owes to the men who are grand and brave enough to ignore St. Paul, and rise superior to his God." (Men, Women and Gods, p. 30).**

And now Mr. Charles Smith concludes: A single error refutes the dogma of infallibility. **We have proved that the Bible abounds with contradictions and falsehoods, and is immoral... The facts set forth in this folder are known to the Church leaders, but are carefully concealed from the laity. One-half the clergy are well-housed hypocrites: the other half are poor ignoramuses...It is a good question for debate - "Which is the Worse, the Old or the New Testament?" If bad books are burned, the largest bonfire should consist of Bibles.** [From "The Bible In The Balance" by Charles Smith, Published by Hindu Writers' Forum, 129/B, MIG Flats, Rajouri Garden, New Delhi-110027. Price Rs. 5].

"New Delhi, June 30,– Autonomy of J&K is very much on the cards, but the quantum would be decided by the New State Assembly, the Union Home Minister Mr. Indrajit Gupta said today, reports UNI. Autonomy is necessary if we want to keep Kashmir, Mr.Gupta said here today." (The Statesman, 1.7.1996).

## চতুর্থ অধ্যায়

# সমাধান কোন পথে?

**(১) দেশভাগের পর খণ্ডিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের একদিনও থাকার অধিকার নেই।**

(ক) যেহেতু মুসলমানরা মনে করেন তাদের উপাসনা-পদ্ধতি অনুযায়ী অমুসলমানদের সাথে সহ-অবস্থান সম্ভব নয়;

(খ) যেহেতু তাদের পূর্বোক্ত দাবী মেনে নিয়ে ভারতবর্ষ নামক দেশটা ভাগ হয়েছিল সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে;

(গ) যেহেতু মুসলমানরা ভারতবর্ষকে ভাগ করে তাদের অংশ তারা বুঝে নিয়েছেন;

(ঘ) যেহেতু দেশভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে অমুসলমানরা মুসলমানের উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করতে বা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, অথবা নিহত হয়েছে;

(ঙ) যেহেতু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরী দূরের কথা সামান্য সরকারী কাজেও অমুসলমানদের নিয়োগ করা হয় না;

(চ) যেহেতু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজও যে-কজন অমুসলমান আছে তারা জিম্মী হিসেবেই সেখানে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে;

সুতরাং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর, আইন ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কোনভাবেই একজন মুসলমানেরও স্থায়ীভাবে খণ্ডিত ভারতবর্ষে বসবাস করার অধিকার নেই। এবং যেহেতু নেই, তাই ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকারের কোন উচ্চপদ দূরের কথা সাধারণ সরকারী চাকুরীতেও তাদের নিযুক্ত করা চলবে না এবং কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষায়ও বসতে দেয়া হবে না।

এখানেই অনেক পণ্ডিতমূর্খ মুহূর্তমাত্র দেরি না করে পাঁজি (সংবিধান) খুলে দেখাবেন 'এই যে লেখা আছে....' ইত্যাদি। প্রতি-উত্তরে তাদের একটি কথাই জানাতে চাই ঃ সেদিন যারা পাঁজি তৈরী করেছিলেন তারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আজ সময় এসেছে সে-পাঁজি বা সংবিধানের পুনর্মূল্যায়নের ও নতুন করে লেখার যেখানে থাকবে না জাতপাতের ভিত্তিতে কোন প্রকার রক্ষা-কবচ কিংবা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা—দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্যে থাকবে সমান আইন ও সমান সুযোগ। দেশবিভাগের পুরস্কার স্বরূপ যারা খণ্ডিত ভারতের অধীশ্বর হয়ে

বসেছিলেন, আজও (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পরও) তাদের বংশধররাই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। তারা বিলক্ষণ জানতেন, হিন্দুদের প্রতি সেদিন তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, একদিন না একদিন হিন্দুরা তার প্রত্যুত্তর দেবেই। তাই মুসলমানদের ভারতে রাখা দরকার। সুতরাং তারা যাতে এদেশে বাস করে নির্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও পাকা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-ব্যবস্থা যে চিরদিন চলতে পারে না, সে-কথাটি তারা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই মুসলমানদের এই না-পাক (অপবিত্র) দেশ থেকে তাদের ঈপ্সিত দেশ পাকিস্তানে (পবিত্রস্থানে) আজ হোক, কাল হোক চলে যেতেই হবে, যেমন একদিন তাদেরকে ইওরোপের স্পেন থেকে চলে যেতে হয়েছিল।

এতো কথা বলার পরও বলবো ঃ ভারতের মুসলমানরা যদি ভারতবর্ষকে তাদের নিজের দেশ বলে স্বীকার করেন এবং ভারতবর্ষের সকল নাগরিকের জন্যে যে সব আইনকানুন (দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনসহ) চালু থাকবে (সংখ্যা-লঘিষ্ঠের জন্যে বিশেষ কোন রক্ষা-কবচ থাকবে না), সেই সব আইনকানুন মেনে চলতে রাজী থাকেন তবে তারা 'জিম্মীর' অমর্যাদা নিয়ে নয় ( যা মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জন্যে প্রযোজ্য), অন্যান্য নাগরিকদের মতো সমান মান-মর্যাদা নিয়ে সসম্মানে বসবাস করতে পারবেন।

**(২) ভারতের উদার-নীতির সুযোগ নিয়ে ভারতকে 'দার-উল ইসলামে' পরিণত করার কোন চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।**

হিন্দুদের উদারতার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে মুসলমান ও খৃষ্টানদের তাণ্ডব নৃত্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর ফুরিয়ে এসেছে সেই সব গৃহশত্রু বিভীষণদের দিন যারা দিনের পর দিন খৃষ্টান ও মুসলমানদের তোষণ করে চলেছেন।

বিগত প্রায় হাজার বছর ধরে মুসলমান ও খৃষ্টান-শাসন ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার যত না ক্ষতি সাধন করতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে মাত্র পঞ্চাশ বছরের ধর্মচ্যুত সংখ্যাগরিষ্ঠের অপশাসন। একদিকে তারা দিনের পর দিন দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত হেনে চলেছেন অপরদিকে মুসলমান ও খৃষ্টানদের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধির দিকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই দেশদ্রোহীতার কাজ যারা নিরলসভাবে করে যাচ্ছে তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার সময় এসেছে ঃ হয় আপনারা দেশদ্রোহীতার পথ বন্ধ করুন, নতুবা যাদের জন্যে আপনাদের মনোকষ্টের অন্ত নেই তাদের সাথে একযোগে দেশ থেকে বহিস্কৃত হবার জন্যে প্রস্তুত হউন।

এখানে একটি কথা পরিস্কার হওয়া দরকার। ভারতবাসী কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নয়। তারা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই নিজেদের মনে করে। তাই ভারতবর্ষের ধর্ম-ও কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর ধর্ম নয়। বিরাট মনুষ্য সমাজকে যা ধারণ করে আছে সেটিই ভারতবাসীর ধর্ম।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা মানুষকে পরিচালিত করছে তা-ই ভারতবাসীর ধর্ম। ভারতবাসী বিশ্বের সবাইকে নিজের আত্মীয় হিসাবে গণ্য করে (বসুধৈব কুটুম্বকম্)। তার নিকট কেউ পর নয়। তাই নির্দিধায় সে পার্সি, মুসলমান, শক, হুন, খৃষ্টান সবাইকে আপন করে নিয়ে ভারতের মাটিতে স্থান দিয়েছে। যারা হিন্দুর ন্যায় মানবধর্মে বিশ্বাসী তারা পরম নিশ্চিন্তে ভারতের পুণ্যভূমিতে বসবাস করছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টানরা ভারতবর্ষকে কোনদিন নিজেদের দেশ বলে মেনে নেয়নি। পরন্তু এর অধিবাসীদের ইসলাম ও যীশুখৃষ্টের উপাসনা-পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার কাজে ব্যস্ত আছেন। হিন্দুদের এই উদারভাবকে দুর্বলতা মনে করে তারা আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছেন। এত করেও তারা হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতাকে নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশের হিন্দু শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে এই বিধর্মী গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার শ্মশানযাত্রা নিশ্চিত করে চলেছে। আবার এই শাসকগোষ্ঠী মেকী উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে নির্লজ্জের মতো বলে বেড়াচ্ছেন ঃ ভারতে কোনদিনই এক ধর্মাবলম্বী লোকের বাসস্থান ছিল না এবং আজো নেই। কিন্তু এই স্বার্থান্বেষীদের কী করে বোঝাবো, ধর্ম এবং উপাসনাপদ্ধতি বা সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিষ নয়। ধর্মের নিকটতম ইংরেজী প্রতিশব্দ Religiosity, Religion নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা চলে, যেখানে ধর্মভাব (Religiosity) নেই তা ধর্ম নয়। ধর্ম বা ধর্মভাব সর্বব্যাপিনী; কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতি (Religion) খণ্ড খণ্ড—সর্বব্যাপিনী নয়। Religion বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ; কিন্তু Religiosity তা নয়—এর প্রভাব ও বিস্তার বিরাট। Religiosity সমগ্র মানব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; পক্ষান্তরে Religion সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সীমায়িত।

সুতরাং হিন্দুর উদার-নীতির সুযোগ নিয়ে মুসলমান, খৃষ্টান ও এদের বন্ধুরা যতদূর সম্ভব এগিয়ে গেছেন, আর তাদের এগিয়ে যেতে দেয়া হবে না। ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এসেছে—আর তারা পড়ে পড়ে মার খেতে রাজী নয়। তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষার জন্যে আজ তারা সব কিছু কবুল করতে রাজী।

(৩) **আমরা ধর্মের পক্ষে তবে সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে।** ইদানীং একটি রাজনৈতিক সংগঠনের শ্লোগান, যেমন "আমরা নিরপেক্ষ নই—মেহনতি মানুষের পক্ষে" পশ্চিমবাংলার অলিতে গলিতে, দেয়ালের গায়ে গায়ে কিংবা হোর্ডিং-এ শোভা পাচ্ছে, তেমনি আজ থেকে ভারবর্ষের প্রতিটি হিন্দুর মুখে ঘোষিত হোক, "আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ নই, ধর্মের পক্ষে; তবে সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে"। যারা মেকি সেকুলারবাদের নামে ধর্মদ্রোহীতা করছেন এবং সজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, অনতিবিলম্বেই তাদেরকে ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে যেয়ে দাঁড়াতে হবে।

তাদের একটি কথা জেনে রাখা উচিত, সব জেনে শুনে যারা সেকুলারবাদের (Secularism) বাংলা প্রতিশব্দ উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ কিংবা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ না করে ধর্মনিরপেক্ষ বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন তারা ক্ষমার অযোগ্য। ধর্ম-দ্রোহীতা বা ধর্মের প্রতি ঔদাসিন্য-প্রদর্শন চরম অপরাধ। প্রকৃত ধর্মাচরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ তাই চিরদিন ধর্মের পক্ষে ছিল, আজ-ও আছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে।

(৪) **গর্বের সাথে বলুন "আমি হিন্দু"; "হিন্দু বলতে গৌরববোধ করি।"** হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি ও অপমানের উর্দ্ধে উঠে গর্বভরে বলার সময় এসেছে, "আমি হিন্দু"। বিশ্ববাসীকে একটি কথা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা নয়—মানবধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তারই অপর নাম হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম। পৃথিবীতে যতোপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতি আছে তার মধ্যে একমাত্র হিন্দুর উপানসা-পদ্ধতিতেই "ধর্মের প্রতিফলন" দেখা যায়। অন্য সব উপাসনা-পদ্ধতিতে, বিশেষ করে খৃষ্টান ও মুসলমানদের উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রকৃত ধর্মের কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। সুতরাং উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপারে যদি কোন মানবগোষ্ঠীর গর্ব করার মতো কিছু থাকে তবে তা একমাত্র হিন্দুরই আছে—অন্য কোন মানব-গোষ্ঠীর নেই। হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতির ভিত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য উপাসনা-পদ্ধতি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(৫) **"বন্দেমাতরম"-ই ভারতের জাতীয় সংগীত।** ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম", "জনগণমন অধিনায়ক" নয়। পৃথিবীর কোন দেশেরই জাতীয় সংগীত দুটো থাকে না—থাকে একটি; কিন্তু ভারতবর্ষ নামক দেশটির জাতীয় সংগীত দু'টি। যেহেতু 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে মুসলমানদের আপত্তি, তাই জাতীয়-সংগীত নিয়েও আপোষ করে "জনগণমন অধিনায়ক"—নামক অপর একটি সংগীতকে যুক্ত করে জাতীয়-সংগীত দু'টি করা হলো। জাতীয় সংগীতের প্রতি এতাদৃশ অমর্যাদা-প্রদর্শন কোন জাতিই মেনে নিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে যারা নেতৃত্বে আছেন, তারা যে সেকুলারবাদী (Secularist)—মুখে উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ, কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক। এক অদ্ভুত প্রজাতি।

(৬) **ধর্ম এবং উপাসনা-পদ্ধতি বা সাম্প্রদায়িকতা এক নয়।** যারা, বিশেষ করে যে-সব হিন্দু বলেন, সব ধর্মের মূল কথা একই—শুধু প্রয়োগ-পদ্ধতি ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্ম ও উপাসনা-পদ্ধতি বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আসল তফাৎটা যে কোথায় তা-ই জানেন না। অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্ম বলে চালিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম এক এবং অবিভাজ্য। এই ধর্ম (Religiosity) সমস্ত মানবসমাজকে ধারণ করে আছে। ধর্ম কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ বা সম্পত্তি নয়। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী তাদের স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিকে ধর্ম বলে চালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ধর্ম নয়—সাম্প্রদায়িক নিয়মকানুন মাত্র।

**(৭) ভারতবর্ষে "সারা জাঁহাছে আচ্ছা" সংগীতটি গাওয়া চলবে না।** ডঃ ইকবাল 'সারা জাঁহাছে আচ্ছা' সংগীতটি তাঁর কোন্ মানসিকতা নিয়ে রচনা করেছিলেন তা তর্কাতীত নয়। তবে তিনি যে একজন কট্টর পাকিস্তানের প্রবক্তা এবং দাবীদার ছিলেন তা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত। তাই তার এই সঙ্গীতটি খণ্ডিত ভারতবর্ষের সর্বত্র নিষিদ্ধ করতে হবে।

**(৮) সংস্কৃতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে—সংস্কৃতভাষা সংহতির সহায়ক।** মাতৃভাষা শিক্ষার সাথে সাথে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। যতদিন ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষ সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে না পারবে ততোদিন ইংরেজী ভাষাকেই Lingua Franca হিসেবে কাজ করে যেতে দিতে হবে। বিকল্প হিসেবে কোনক্রমেই জোর করে হিন্দীকে চাপিয়ে দেয়া চলবে না।

**(৯) ভারতীয় সংবিধানের বৈষম্যমূলক ধারাগুলি তুলে দিতে হবে।** ভারতবর্ষের সংবিধানে যে-সব ধারায় নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে সে-সব ধারার বিলুপ্তি-সাধন করতে হবে, যেমন ঃ

(ক) দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও সংহতির পরিপন্থী জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি-সাধন;

(খ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতির অনুশীলন ও প্রচারের ব্যাপারে সংবিধানের ২৫নং ধারায় যেখানে 'to profess, to practise and to propagate'-এর স্বাধীনতা এবং অধিকার দেয়া হয়েছে তার সাথে যুক্ত করতে হবে 'but not the right to convert any person belonging to other community advancing material allurements and/or by inflicting intimidations.'

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমূহে সংখ্যালঘুদের জন্যে কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না। এর সফল রূপায়নের জন্যে সংবিধানের ৩০নং ধারা তুলে দিতে হবে।

**(১০) সংবিধানের ৪৪নং এবং ৪৮নং ধারা অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।**

(ক) ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকের জন্যে অভিন্ন দেওয়ানী আইন (৪৪ নং ধারা) চালু করার কথা আছে; এবং

(খ) গো-হত্যা বন্ধ করার (৪৮নং ধারা) কথা আছে। সে-সব ধারা অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।

**(১১) ভারতবর্ষের সকল নাগরিকের জন্যে পরিবার-পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করতে হবে।** দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উপাসনা-পদ্ধতির দোহাই দিয়ে নিজেদের পরিবার-পরিকল্পনায় সামিল করবেন না এবং ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে যাবেন, আর তার বোঝা বহন করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের, এ-অবস্থা চলতে পারে না। তাই অনতিবিলম্বে এ-অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে এবং সাথে সাথে সবার জন্যে বাধ্যতামূলক পরিবার-পরিকল্পনার প্রকল্প চালু করতে হবে। এক দেশে দু-নিয়ম চলবে না। এর যারা বিরুদ্ধাচরণ করবেন তারা দেশের

নাগরিকত্ব হারাবেন এবং নাগরিকত্ব হারাবার ফল ভোগ করবেন। মোট কথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যে, যে কোন মূল্যে, দেশের জনসংখ্যা সীমিত রাখতেই হবে।

(১২) **দেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান পুস্তক (National Register of Population).** দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্যে একটি জাতীয় পরিসংখ্যান পুস্তক (National Register of population) তৈরী করতে হবে। এ ব্যবস্থা নিলে অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করা সহজ হবে এবং ভিসা করে এদেশে এসে তাড়াতাড়ি জনতার ভীড়ে হারিয়ে যেতে পারবে না। এই পরিসংখ্যান পুস্তক প্রতিটি সভ্য দেশেই আছে, নেই শুধু মেকি সেকুলারবাদী (মেকি উপাসনা-পদ্ধতি-নিরপেক্ষ) দেশ ভারতবর্ষে।

(১২ক) **জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক না হলে দেশের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।**

(১৩) **দেশের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।** ভারতবর্ষে বর্তমানে যে জন-প্রতিনিধিত্ব আইন আছে (Peoples' Representation Act) তা সুস্থ গনতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। কারণ এর ভিত প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার, শিক্ষা নয়। সুতরাং এর আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এ-ব্যাপারে আমরা কিছু প্রস্তাব রাখছি।

(ক) যেহেতু শিক্ষাই গণতন্ত্রের প্রাণ (শিক্ষা ভিন্ন গণতন্ত্র অর্থহীন), তাই কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরের নির্বাচনে ভোটার হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে প্রত্যেক নাগরিককেই মাধ্যমিক পরীক্ষা-পাশের অধিকারী হতে হবে, শুধু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই চলবে না। আবার শিক্ষার যে কোন ধারায় (Stream) যাদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তারা দু'টি ভোট-পত্রের অধিকারী হবেন। এ-প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে চাই। প্রাপ্তবয়স্কের পরিবর্তে 'শিক্ষা'-ই যদি ভোটাধিকারের স্বীকৃতি পায় বা মানদণ্ড বলে স্বীকার করে নেয়া হয় তবে দেখা যাবে, দেশের সব রাজনৈতিক দলই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনযোগী হবে এবং ভোট দখলের জন্যে দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাবে। ফলে, অনতিবিলম্বেই দেখা যাবে (পরোক্ষভাবে হলেও), দেশে আর নিরক্ষর বলে কেউ নেই। এ-পন্থা অবলম্বন না করা হলে, মুখে নেতৃবৃন্দ যাই বলুন, বাস্তবক্ষেত্রে দেশের সাধারণ মানুষ কোনদিনই শিক্ষার আলো দেখতে পাবেনা। কারণ, শাসকগোষ্ঠী (তা যে দলেরই হোক না কেন) চায় না, দেশের সর্বসাধারণ লেখাপড়া শিখুক এবং স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার মতো অবস্থায় আসুক। তাই যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা ভোটাধিকারের যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি না পাচ্ছে ততোদিন এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং মনীষী লিও টলষ্টয়ের কথা মেনেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেছেন, "It seems to me that it is now specifically inportant to do which is right quietly and persistently, not only without asking permission from government, but conciously avoiding its participation. The strength of the government

lies in the people's ignorance, and the government knows this, and will therefore oppose true enlightenment".

(খ) জাত-পাত, উপাসনা-পদ্ধতি কিংবা লিংগের ভিত্তিতে কোন আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না। যা কিছু হবে, সবার জন্যেই হবে এবং সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) বহুদলীয় গনতন্ত্রে ৫০% শতাংশের বেশী ভোট না পেলে কোন প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন না। প্রথম স্তরের নির্বাচনে কেউ যদি প্রার্থিত ভোট পান তবে আর দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রথম স্তরের নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থীই ৫০% শতাংশের উপর ভোট না পান তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোটের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে, প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তাদের দুই জনের মধ্যেই নির্বাচন হবে। সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন-ও আমাদের সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন।

(ঘ) যারা নির্বাচন-প্রার্থী হবেন তাদের অবশ্যই নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে, শিক্ষার যে কোন ধারায়, মাষ্টার ডিগ্রীর অধিকারী হতে হবে। তবে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশই যথেষ্ট।

(ঙ) নির্বাচনে প্রার্থীদের বয়স সর্বনিম্ন ২৫ ও সর্বোচ্চ ৭০ বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(চ) সকল নির্বাচনই প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। তবে অবস্থা বিশেষে মধ্যবর্তী নির্বাচনও হতে পারে।

(ছ) নির্বাচিত হবার পর কেউ যদি দলত্যাগ করেন কিংবা দল থেকে বহিস্কৃত হন তবে তার নির্বাচন খারিজ বলে গণ্য হবে। তিনি যদি পুনরায় নির্বাচিত হতে চান তবে তাকে পুনরায় নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে হবে।

(জ) নির্বাচন-কমিশন দ্বারা স্বীকৃত দেশে যতো রাজনৈতিক দল থাকবে তাদের যে কোন একটির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হবে। কোন ব্যক্তি নির্দল প্রার্থী রূপে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তবে, এ-নিয়ম পঞ্চায়েত বা পৌরসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উক্ত দুই নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরূপে যে-কোন ব্যক্তি নির্বাচন-প্রার্থী হতে পারবেন। কিন্তু বির্বাচিত হবার পদ্ধতি একই, অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও ৫০% শতাংশের উপর ভোটপত্র পেয়েই নির্বাচিত হতে হবে।

(ঝ) ফৌজদারী বা দেওয়ানী আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিই কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

(১৪) **কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা সীমিত রাখতে হবে।** কোনক্রমেই পূর্বোক্ত দুই মন্ত্রীপরিষদের সদস্যসংখ্যা লোকসভা ও বিধানসভার মোট আসন সংখ্যার ১০ শতাংশের বেশী হবে না।

(১৫) **দেশে অনুপ্রবেশকারীদের কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে।** অনুপ্রবেশকারীদের কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে। ভারতে এসে যাতে

তারা পাকাপাকি ভাবে বসবাস করার সুযোগ না পায় তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে; দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা এদেশে এসে শ্রমের বিনিময়ে কিংবা শিক্ষার সুবাদে কোনপ্রকার অর্থকরী সুযোগ-সুবিধা না পায়। শুধু অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিলেই চলবে না, যারা এদের কাজে মদত দিচ্ছে এবং খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থায়ীভাবে বসবস করা ও রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, তাদেরকে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে যে-সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা পীড়িত হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং ভারতে এসে আশ্রয়প্রার্থী তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করা যাবে না। তারা বাস্তুহারা হতে বাধ্য হচ্ছে একমাত্র ভারত-বিভাগের কারণে। সুতরাং নৈতিকতা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে তাদের শুধু আশ্রয় দেয়া-ই নয়, সর্বপ্রকারে পুনর্বাসন দিতেও ভারত সরকার বাধ্য।

(১৬) **কাশ্মীরি শালওয়ালাদের এবং এম্পোরিয়াম থেকে কোন দ্রব্য কেনা চলবে না**। যতদিন না ভারতের সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দেয়া হচ্ছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে জোরপূর্বক বিতারিত হিন্দু বাসীন্দারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেয়ে পুনর্বাসন পাচ্ছে ততোদিন, কাশ্মীর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত "কাশ্মীর এম্পোরিয়াম" থেকে কোন সামগ্রী হিন্দুরা যেন না কেনেন। প্রতি বৎসর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাশ্মীরি মুসলমান শালবিক্রেতারা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিস্তীতে শাল বিক্রয় করে। তাদের নিকট থেকেও যেন কোন হিন্দু সাল বা অন্য কিছু দ্রব্য না কেনেন।

দ্বিতীয়তঃ, যতদিন কাশ্মীর ও জম্মুর বাস্তুহারারা পুনর্বাসন না পাচ্ছে ততদিন ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে কোন নাগরিক যাতে কাশ্মীর-ভ্রমণ করতে না যায় তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাশ্মীরে যাওয়ার অর্থই হলো কাশ্মীরি মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা, এ সহজ সরল কথাটি যেন ভারতের হিন্দুদের মনে থাকে। এক কথায়, কাশ্মীরের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের নিজ নিজ বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে হবে। যারা বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা স্বাভাবিক হয়েছে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমি তাদের সাথে একমত নই। যদি স্বাভাবিকই হতো তবে সেখানকার হিন্দু উদ্বাস্তুরা যে যার ঘরে ফিরে যেতে পারছে না কেন? অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে বলে যারা প্রচার করছেন এবং পর্যটকদের কাশ্মীর ভ্রমণে উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যই করছেন, যা কোন হিন্দুর পক্ষেই করা উচিত নয়।

(১৭) **ভারত থেকে তালিবান আফগানদের বহিস্কার করতে হবে।** আফগানিস্তানের তালিবানরা যেমন সে-দেশ থেকে অ-মুসলমানদের তাড়িয়ে

দিয়েছে তেমনি ভারত থেকেও আফগান মুসলীমদের তাড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে, সে-দেশ থেকে আগত মানুষদের, যারা সুদের ব্যবসা করে এবং কাবুলিওয়ালা নামে পরিচিত।

(১৮) **হিন্দুদের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘাটাতে হবে।** সম্প্রতি আমি "হিন্দুস্থানের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা" শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলাম এবং তা আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও জানাশুনা মানুষের মধ্যে বিলি করতে যেয়ে তাদের কাছ থেকে যে-সব উক্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম তার কিছু নিম্নে তুলে ধরছি। তা থেকেই পাঠক মহোদয় বুঝতে পারবেন, বর্তমানে হিন্দুর মানসিকতা কোথায় যেয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ক) কেউ বলছেন ঃ এ-সব লিখে-পড়ে কী হবে? দেশের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে (যেন তিনি দেশের কেউ নন) তাতে কারুরই কিছু করার নেই।

(খ) আবার কেউ বলছেনে ঃ এ-সব লিখে কেন সময় নষ্ট করছেন? যদি কিছু করতে হয় সক্রিয়ভাবে করুন। তার নিকট এই লেখালেখির কাজ যেন কোন সক্রিয় কাজ নয়।

(গ) কেউ বা বলেছেন ঃ এখন আমি আর অন্য কোন বই পড়ি না। শুধু ধর্মগ্রন্থ নিয়েই আছি।

(ঘ) অপর একজন যেন একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই বল্লেন ঃ এসব নিয়ে যে ঘাটাঘাটি করছেন শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবেন তো?

এরূপ অনেক প্রশ্ন এবং উপদেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। এক কথায় আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার যতপ্রকার পদ্ধতি আছে তার সব ক'টিরই আশ্রয় তারা নিয়েছেন। তাদের উদ্দেশে এ-প্রসঙ্গে আমার একটিই বক্তব্য ঃ পাশ কাটিয়ে কিংবা চোখ বুজে থাকলে কিন্তু হিন্দুরা কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাবে না। প্রতিমুহূর্তে যম তাদের তাড়া করে চলেছে! তবে এর পাশাপাশি আরও একটি কথা বলবো ঃ সবাই যে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন, এমন নয়। প্রথম শ্রেণীর হিন্দুর বাইরেও বিরাট হিন্দুসমাজ আছে। তাঁরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সুতরাং হিন্দুদের নিকট আমার আবেদন, তারা তাদের হীনমন্যতা ও দাসসুলভ মানসিকতা ত্যাগ করুন এবং প্রবঞ্চকদের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।

(১৯) **বিদেশী দালালদের চিহ্নিত করা এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া।** যারা বিদেশী রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট এবং দেশের মধ্যে নানাপ্রকার নাশকতামূলক কাজের সাথে যুক্ত, তাদের বিচারের জন্যে বিশেষ আদালত স্থাপন ও তাৎক্ষণিক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(২০) **দেশের পুলিশবাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না।** অদ্যাবধি দেশের শাসকগোষ্ঠী (কেন্দ্র এবং রাজ্যের) তাদের দলীয় স্বার্থে পুলিশ

বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এ-প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এভাবে আর কিছুদিন চললে দেশ জঙ্গলের রাজ্যে পরিণত হবে।

(২১) **মানবতার স্বার্থে ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার পুনরভ্যুদয় একান্ত প্রয়োজন।** ভারতবর্ষের গৌরবময় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। পৃথিবীর প্রাচনীতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার পুনর্জাগরণের মধ্যেই নিহীত আছে মানবজাতির জিয়ন কাঠি।

(২২) **ভারতবর্ষের মাটি থেকে পরাধীনতার প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।** ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পরাধীনতার কলংক-চিহ্ন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে-সব স্থানে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সে-সব মসজিদের ধ্বংসের পক্ষে আমি নই। তবে প্রতীক হিসেবে মুসলমানরা যদি তিনটি মসজিদ (সেখানেও মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল) অন্য স্থানে সরিয়ে নেয় ভাল, আর যদি সরিয়ে নিতে রাজি না থাকে, তবে ঐ মন্দির তিনটি অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে। **এই তিনটি মন্দির জাতির মান-মর্যাদার সাথে জড়িত।**

(২৩) **ভারতকে দার-উল ইসলামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে।** মুসলমানরা বলে, একবার যে-দেশ তাদের পদানত হয়, সাময়িকভাবে তা হস্তচ্যুত হলেও সে-দেশ তাদেরই। তাই ভারতবর্ষকে দার-উল ইসলামে পরিণত করার জন্যে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। বহু শতাব্দী ধরে ইওরোপের স্পেন নামক দেশটিও তো একদিন ইসলামের পদানত ছিল। কিন্তু কৈ, সে-দেশ থেকে বিতারিত হবার পর, তাকে তো পুনর্দখল করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সে-মাটি বড় শক্ত; তাই সেখানে দন্তস্ফুট করা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের মাটি বড়ই নরম এবং এদেশে গান্ধী-নেহেরুর মত মুসলমান-তোষকেরও অভাব নেই। আপত-দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমান ও খৃষ্টানরা দেশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের 'প্রধান শত্রু হিন্দুরা নিজেরাই'। তাই সর্বাগ্রে এদের দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রয়োজন আছে।

(২৪) **সমাজ-জীবন থেকে বর্ণবৈষম্য চিরদিনের মতো দূর করতে হবে।** বৃহৎ হিন্দুসমাজে একদিন কর্মের ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে, জন্মের ভিত্তিতে যেদিন থেকে হিন্দুদের বর্ণের পরিচয় শুরু হলো সেদিন থেকেই হিন্দুর মধ্যে জাতপাত নিয়ে চুলচেরা বিচার আরম্ভ হলো, আরম্ভ হলো উচ্চনীচের ব্যবধান। ফলে, হিন্দুসমাজ শতধা বিভক্ত হলো, নিজেদের একত্মতা হারিয়ে ফেলে আত্মঘাতী ঘৃণা ও বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চল্লো। বর্তমানে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে।

এ-প্রসঙ্গে আমি পদবী (Surname) বিলোপের একটি কার্যকরী প্রস্তাব রাখছি,

যদিও এটি আমার নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। ইতিপূর্বে অনেকেই এ-প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেছেন; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমি চাই, এই প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হোক। কীভাবে হবে, সে-কথায় যাচ্ছি ঃ এখনো যে-সব শিশুর নামকরণ হয়নি (অথচ ভূমিষ্ঠ হয়েছে) অথবা এখন থেকে যে-সব শিশু পৃথিবীতে আসবে, তাদের অভিভাবকেরা শিশুর নামকরণ করার সময় পদবীটি (Surname) যাতে লিপিবদ্ধ না করেন তার প্রতি যত্নবান হবেন। পরবর্তীকালে স্কুল, কলেজ ও কর্মস্থলে পদবীবিহীন নামেই সে-সব ছেলেমেয়েরা পরিচিত হবে। তবে পিতামাতার নাম লেখার সময় তাদের পদবীর উল্লেখ অবশ্যই থাকবে। একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, একজনের নাম শ্রী মিহির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার একটি সন্তান হলে তিনি সেই শিশুটির নাম রাখবেন শ্রী সমীরকুমার; কিন্তু পিতৃপরিচয় দেবার সময় লিখবেন মিহির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মাতৃপরিচয় দেবার সময় লিখবেন শ্রীমতি সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সমীরকুমার যখন যথাসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সন্তানের পিতা হবেন তখন তিনি তার সন্তানের নাম রাখবেন সমীরন কিংবা অন্য কিছু এবং পিতা হিসেবে নিজের নাম লিখবেন অবশ্যই শ্রী সমীরকুমার। এই পদবী বিলোপের কাজটি এই মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করতে হবে। এর সুফল পেতে অবশ্য দু'পুরুষ কেটে যাবে। তা যাক। একবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে এবং সবাই যাতে এ-প্রক্রিয়ায় সামিল হন তা নিশ্চিত করতে পারলে বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারটি ২৫/৩০ বছরের মধ্যেই হিন্দু সমাজে অতীতের কাহিনীতে পরিণত হবে।

বর্তমানে আমরা যারা ইতিমধ্যেই শিশু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পদবী (Surname) সহ নামের অধিকারী হয়েছি, এখনই তাদের পদবীলোপে অনেক সমস্যা দেখা দেবে এবং তা অতিক্রম করার জন্যে অনেকেই আগ্রহ দেখাবেন না কিংবা পদ্ধতিগত বেড়াজাল পেরুতে হলে যে-সব নিয়মকানুন মানতে হবে সে-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাইবেন না। এ-সব ছাড়াও বাস্তবতার দিক দিয়ে এমন অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে যা অতিক্রম করা কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সে-পথে না গিয়ে, একেবারে নতুন করে শুরু করার প্রস্তাব রাখলাম। আশা রাখি, হিন্দু-সমাজ সংস্কারের কাজে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তারা প্রস্তাবটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

(২৫) **দেশের কৃতি সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।** দেশের কৃতি সন্তানদের যেমন মহারানা প্রতাপ, শিবাজী মহারাজ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের জীবনী ও কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে।

(২৬) **ভারতবর্ষের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনা।** নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ড সহ ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের প্রকৃত ইতিহাস

রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদান একান্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অহিংসার পথে যে দেশ স্বাধীন হয়নি, (বরং গজবে গেছে), এই চরম সত্য কথাটি দেশবাসীকে জানাতে হবে।

(২৭) **ভারতবর্ষের প্রামান্য ইতিহাস রচনা।** ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে হবে, মানব-সভ্যতার আদি স্থান ভারতবর্ষ, অন্য কোন দেশ নয়। যে দেশ বা জাতির প্রমান্য ইতিহাস নেই, তার কিছুই নেই।

(২৮) **আন্দামান-নিকোবর দ্বীপের নাম পাল্টে 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ করতে হবে।** আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের নাম 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ রূপে নামকরণ করতে হবে। কারণ, এই দ্বীপেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দ্বীপ দুটির নাম রাখেন 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ বলে।

(২৯) **নেতাজীর দ্বিতীয় অন্তর্ধান-রহস্য অনতিবিলম্বে উদঘাটন করতে হবে।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজী কোথায় চলে গেলেন বা শেষ পর্যন্ত তাঁর কী পরিণতি ঘটলো তা আজ-ও রহস্যাবৃত। কোন্ অজ্ঞাত কারণে সেই ইতিবৃত্ত উদঘাটিত হচ্ছে না, তার জন্যে কোন কেন্দ্রীয় সরকারই উদ্যোগী হচ্ছে না। এরই-বা কারণ কী?

(৩০) **সব কাজেই হিন্দুদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না।** অদ্যাবধি নিম্নলিখিত ট্রেডগুলি (Trades) মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকারে আছে। হিন্দুদের যদি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে হয় তবে এখন থেকে ঐসব কাজে নিজেদের যুক্ত করতে হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। ট্রেগুগুলির নাম ঃ টেলারিং, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মাংস বিক্রয়, ফলবিক্রয়, হোটেল ব্যবসা, ধুনকরবৃত্তি ও ছাতা সারাইয়ের কাজ, বেকারী (Bakery) কর্মী, জাহাজের সারেং ও খালাসীর কাজ, বন্দরসমূহে শ্রমিকের (Porter) কাজ, চর্মশিল্প প্রভৃতি।

(৩১) **অবসরপ্রাপ্ত মানুষের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।** চাকুরিজীবিরা সাধারণত ৫৮/৬০ বৎসর বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর পরও অনেক মানুষ সুস্থ স্বাস্থ্য ও মানসিকতা নিয়ে আরও কমবেশী বছর দশেক বেঁচে থাকেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর অনেক মানুষই একাকিত্বের একঘেয়েমী জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন, নানা কারণে। সে-সব কারণ এখানে না-ই-বা উল্লেখ করলাম। এবং এই একাকিত্বের জীবন-যাপন তাদরে পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, যদি দেশের রাষ্ট্রশক্তি কিংবা বেসরকারী সংস্থাগুলি এই অবসর-প্রাপ্ত মানুষের পাকা অভিজ্ঞতা সমাজের নানাপ্রকার উন্নয়ন-মূলক কাজে লাগান, তবে তাদের এই একাকিত্ব-জীবনের অবসান ঘটবে এবং সমাজও নানাভাবে উপকৃত হবে। এ-কাজ করতে যেয়ে রাষ্ট্র বা বেসরকারী সংস্থাগুলিকে খুব বেশী অর্থব্যয়েরও সম্মুখীন হতে হবে না। সমান্য অর্থ ব্যয়েই তাদের কাজে লাগানো যাবে।

(৩২) **আর আত্মরক্ষা নয়, এবার প্রতি-আক্রমনের পালা।** বিগত ৫০-বছর ধরে জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুরা শুধু একতরফা মার খেয়ে আসছে। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, এখন থেকে যে-ক্ষেত্রেই তারা আক্রান্ত হবে সে-ক্ষেত্রেই তাদেরকে প্রতি-আক্রমণের জন্যে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। হিন্দুদের যদি ভারতবর্ষে মান-মর্যাদা, ধন-প্রাণ নিয়ে বাঁচতে হয় তবে এ-পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা নেই। সারা দেশ বিভীষণে ছেয়ে গেছে।

(৩৩) **দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে চাই, একটি শক্তিশালী সংগঠন।** 'করতে হবে' 'দিতে হবে'-জাতীয় কথা মুখে বলা বা কাগজে লেখা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে যে ততো সহজ নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাই এতোক্ষণ যে-সব কথা বল্লাম তা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্যে যে-পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো।

(অ) সর্বপ্রথম চাই একটি সুশৃঙ্খল লৌহকঠিন সংগঠন। শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের জন্যে স্বামী বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই তিনি সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। আর আমরা এইমাত্র যে-সব কর্মকাণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ করলাম, তাদের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্যে যে একটি পাকাপোক্ত সংগঠনের প্রয়োজন, তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

(ক) বর্তমানে হিন্দুদের যে-সব সংগঠন আছে সে-সব সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের কর্মীরা কাজের চেয়ে কথা বলেন বেশী। দ্বিতীয়তঃ এদের একটির সাথে অপরটির যোগসূত্র খুব ঢিলেঢালা, মোটেই সমন্বয় নেই। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এরা কোন কাজ করেন না বা করতে পারেন না। এ-অবস্থার অবসান ঘটানো একান্ত জরুরী।

(খ) সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে কোনরূপ মনোমালিন্য বা ঝগড়া-বিবাদ করা চলবে না। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠনের কর্তৃত্বভার একবার যাদের উপর বর্তাবে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব নিয়ে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা যাবে না। তাদের নির্দেশিত পথেই সংগঠন চলবে।

(গ) সংগঠনের মধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ সহ্য করা হবেনা। বিদ্রোহ প্রমাণিত হবার সাথে সাথে তাকে বা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে; প্রয়োজন-বোধে, সংগঠন থেকে বহিষ্কারও করা যেতে পারে, তিনি বা তারা যতো বড় মাপের নেতা বা কর্মীই হোন না কেন।

(আ) কে বা কারা এই সংগঠনের সভ্য হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ?

(ক) তাঁরা সাহসী এবং সৎচরিত্রের অধিকারী হবেন।

(খ) যাঁরা গান্ধীজীর মতো বলবেন না,"প্রত্যেক মুসলমানই সাহসী এবং প্রত্যেক হিন্দু-ই ভীরু"। (গান্ধীজীর ভাষায়, Every Muslim is a bully and

every Hindu is coward)। গান্ধীজীর এরূপ হীনমন্যতার পরিচয় আমরা এই পুস্তকের প্রারম্ভেই পেয়েছি।

(গ) যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, বরং বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে নিজেদের গৌরবান্বিত বলে মনে করেন।

(ঘ) যাঁরা জাত-পাতে বিশ্বাসী নন এবং সমস্ত হিন্দুকে একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করেন।

(ঙ) প্রয়োজনে দেশের স্বার্থে যাঁরা সব কিছু কবুল করতে রাজি থাকবেন।

(চ) প্রাসঙ্গিক-বিধায়, স্বামী বিবেকানন্দের দুটি উক্তি নিম্নে তুলে দিচ্ছি। তা থেকেই বুঝা যাবে, কোন্ ধরণের এবং কোন্ মানসিকতার মানুষ আজকের দিনে প্রয়োজন।

(a) What I want muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made. Strength, Manhood, Kshatra-Virya and Brahma-Teja, (Source– My India, the India Eternal P-153).

(b) Let people say whatever they like, strike to your own conviction, and rest assured, the world will be at your feet. They say, 'Have faith in this fellow or that fellow,' but I say, 'Have faith in yourself,' that is the way. (Ibid–P.145.)

(ছ) প্রসঙ্গত আরো একটি জরুরী কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। শুধু সংগঠন গড়লেই চলবে না। এর সাথে আরো একটি কাজ করতে হবে। সেটি হলো, কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে না পারলে কোন কিছুরই সমাধান হবে না। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে নিজেদের সংঘবদ্ধ করা এবং দ্বিতীয় কাজ হবে ক্ষমতা দখলের জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

স্বামীজীর একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাদের বক্তব্যে ইতি টানবো।

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদাপরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।"

গত ১১.৫.১৯৯৯ বারাসতে মহিলা ও শিশুসহ ৫৩ জনের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর এই দলটি জি.আর.পি-র হাতে ধরা পড়েছে।

—ছবি ঃ কুমার বসু। সৌজন্যে ঃ বর্তমান